বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০০৭

প্রকাশকাল
০১ অক্টোবর ২০০৭

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
৪ সার্কুলার রোড, ২য় তলা (ডানপাশ)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শরমিন নিশাত ও শওকত হোসেন

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ সহযোগিতায়
বিকল্প প্রিন্টিং
সুলতান আহমেদ প্লাজা
৩২ পুরানা পল্টন, নিচ তলা
ঢাকা ১০০০

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে আজ থেকে প্রায় ৩৬ বছর আগে। যে আত্মত্যাগ আর স্বপ্ন নিয়ে দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করেছিল– সে স্বপ্ন পূরণ হওয়া দূরে থাক, একটি রাষ্ট্রের ন্যূনতম যে অর্জন দরকার ছিল তাও পচনশীল মাছের মাথায় পরিণত হয়েছে। দুর্নীতিতে আমাদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে, তাতে নিজেদের মনুষ্য জাতি হিসেবে ভাবতে কষ্ট হয়। তবে বাঙালি হিসেবে আমাদের গৌরবোজ্জল অন্য দিকগুলোর কথা ভেবে, কী কারণে আমরা দুর্নীতিপরায়ণ হলাম, সেটা আবিষ্কার করা জরুরী হয়ে পড়েছে। দুর্নীতির রাজনৈতিক, সামাজিক কারণের ভেতরে মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো কী? মনের মধ্যে কাঁটার মতো প্রশ্ন বিঁধতে থাকে– আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই কি দুর্নীতির বীজ উপ্ত? প্রধানত স্বভাব নাকি অভাবের কারণে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলাম? নাকি সুসভ্য হওয়ার লক্ষ্যে দুর্নীতির মতো একটি ক্রান্তিকাল বা সংকটময় পর্ব আমরা অতিক্রম করছি মাত্র ? নাকি ঔপনিবেশিক সেই পুরনো শকুন আর মাথার ওপরের ঋণের বোঝা, দুর্নীতির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি হয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোকেই! যা অন্বেষণের প্রত্যয় নিয়ে প্রকাশ হচ্ছে 'হালখাতা'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
০১.১০.২০০৭

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ বেতার' থেকে প্রায়ই একটি কথা আমাদের শোনানো হয়, 'দেশ আপনাকে কী দিল সেটি বড় কথা নয়, আপনি দেশকে কী দিলেন সেটিই বড় কথা।' এ কথার মধ্যদিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের সুবিধাবাদী মনস্তত্ত্বটা আমরা বুঝতে পারি। সে কারণে এ যাবত রাষ্ট্রকে যারা কিছু দিয়েছেন তার হিসাব রাখার মতো রাষ্ট্রে কেউ নেই। রাষ্ট্র থেকে যারা অনেক কিছু নিয়েছেন তার হিসাব দেয়াব জন্যও রাষ্ট্রে কেউ নেই। এরকম সুবিধাবাদী একটি রাষ্ট্র-পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যেই গলদ থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি পরিবর্তন করা সমানভাবে জরুরী।

দুই.

যে দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করল, দেশকে শত্রুমুক্ত করল, স্বাধীন থাকার জন্য ভালোভাবে বাঁচার জন্য– সে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের মনস্তত্ত্ব দুর্নীতিতে ছেয়ে গেল! কেন? কীভাবে? এর জবাব রাষ্ট্রের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে না। এর জবাব প্রতিটি মানুষের কাছেই থাকার কথা।

তিন.

রাষ্ট্র সমান রাষ্ট্রের মানুষ– আমরা তা করতে পারিনি। রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রের মানুষ– এমনটিও হয়নি। রাষ্ট্র কিছুর দায় নেবে না– এটিই সহজ হিসাব, দায় আমাদেরই; বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে, এটা আমাদেরই মনস্তাত্ত্বিক চাওয়ার ফল। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে যা-ই হচ্ছে তার স্থায়ীত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। অর্থাৎ দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে বিচারের যে চলমান প্রক্রিয়া, এর অব্যাহত গতি রক্ষিত হবে কীভাবে? যাদের জেল হচ্ছে এরা একসময় জেলথেকে বেরিয়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কী?

চার.

৩৬ বছরে আর্মীর শাসনই আমরা বেশি ভোগ করেছি, যার স্বরূপ দেশের মানুষ দেখেছে। সেই বদনামের দায় আর্মী সাহেবরা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই আর নিতে চান না। এই যে হাজার হাজার মানুষ পেশা হারাচ্ছে, লাগামহীন বাড়তি দামের জন্য বাজার থেকে কিছুই কেনা যাচ্ছে না– এর সমাধান কী? তারচেয়ে বড় কথা এসব কার কাছে আমরা বলব? বাংলাদেশ কি রাজনীতিশূন্য হয়ে পড়ছে? আমরা কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লেখকরা, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার, সাংবাদিকরা সংকুচিত হতে হতে আয়-রোজগারের নিতান্ত চাকরিজীবিতায় রূপান্তরিত হয়েছি! এসব কিসের আলামত? এর ফল কী? এর পেছনে আমাদের কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করছে?

পাঁচ.

এদেশের মুসলমান তো সারাবিশ্বে সন্মানিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের কারণে, অথচ নজরুলকে বলা হয়েছিল কাফের। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের আবিষ্কার করেছেন আহমদ শরীফ, অথচ তারই ফাঁসি দাবি করা হয়েছিল। মুসলিম নারীদের প্রথম মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া, তাকেও নানা অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। একইভাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ, কাজী আব্দুল ওদুদ, বেগম শামসুন্নাহার, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, ডা.লুৎফর রহমান প্রমুখ চিন্তাবিদের কারণে বাঙালি মুসলমান আধুনিক হয়েছে, বিশ্বে গৌরব অর্জন করেছে। কোরআনের প্রথম অনুবাদ তো করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সেন, নবীজী (স:)-এর যথার্থ জীবনী লিখেছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। আহমদ ছফাকে লিখতে হয়েছে 'বাঙালি মুসলমানের মন'। বিচারপতি হাবিবুর রহমান করেছেন কোরআনের যথার্থ তরজমা। কথা হল শুধু আরবী -পড়া, বাংলা পড়াশুনা না-করা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কেউ কেউ নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে 'ইসলাম', 'কোরআন', 'মুসলমান' এসকল বিষয়কে মানুষের কাছে আতঙ্কজনক করে তুলছেন। মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে সবার আগে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অথচ তাকে বিধর্মী বলে গালি দেয়া হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, 'দি হিসটোরিকাল রোল অফ ইসলাম'। এই গ্রন্থ পাঠ করলে তো বোঝা উচিৎ ইসলাম কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, ইসলামের অবদান বিশ্বের সকল মত-পথের চিন্তাবিদ দ্বারা স্বীকৃত। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ইসলামকে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করেন। এ রকম মনে করা হল সাংস্কৃতিক দুর্নীতি, যার পেছনে ধর্ম নিয়ে বানিজ্যিক মনস্তত্ত্ব কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশে যেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'লালশালু'র সেই 'মজিদ' আজ সারা দেশে নানা লেবাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুহম্মদ (সা.) সবসময় অন্যদের মুখে তাঁর নিজের সমালোচনা শুনতে পছন্দ করতেন। কিন্তু আমাদের সমাজে এক ধরণের মানুষ আছেন, যারা মুহম্মদ (সা.)-এর বিন্দুমাত্র সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না, এরা নিসন্দেহে নবীজী (স:)-কে ভালোবাসেন কিন্তু এরা হলেন মুহম্মদ (সা.)-এর অন্ধপ্রেমিক। আর যারা মুহম্মদ (সা.) সম্পর্কে না জেনে কটুক্তি করেন তারা শুধুই অন্ধ। কিন্তু এই দুয়ের বিভেদ কে ঘোচাবে? ব্রিটিশ তাড়ালাম এই জন্য? পাকিস্তানি হটালাম এই জন্য? এদেশে তো এখন আর গান্ধি নেই, সুভাষ নেই, ভাসানী নেই, মুজিবও নেই!

ইসলামের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক এবং আপত্তিকরভাবে কিছু করা হলে, তার পাল্টা জবাব দিতে অবশ্যই ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান পড়া থাকা চাই। সেটা না থাকার কারণে কেউ কেউ কথায় কথায় ক্ষেপে যান, ইসলামের জন্য অপরিপক্ক মায়াকান্না দেখান। বাস্তব বিচারে এরা ইসলামের কেউ নন, এরা ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করছেন। এরা বুদ্ধিবৃত্তির পথে না গিয়ে, শুধু গায়ের জোরের পথে গিয়ে

ইসলামের ক্ষতি করছেন। হয়ত উন্মাদনাবশত ক্ষতি যে করছেন তাও নিজেরা বোঝেন না।

অথচ এই বাংলাদেশেই ইসলামকে হৃদয়ে ধারণ করে মানবমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন মওলানা ভাসানি, ফররুখ আহমদ, বেগম রোকেয়া, খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফসহ বহু সংস্কৃতিবান মুসলমান। এদের পথ হলো যুক্তির পথ, সাহসের পথ, সততার পথ। পক্ষান্তরে অজ্ঞতাবশত ইসলামের নামে যারা নানা কর্মকাণ্ড করে ইসলামের তথা মানবতার ক্ষতি সাধন করছেন তাদের এদেশের মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না। এইসব অন্ধ মুসলমানদের কারণে ইসলাম সম্পর্কে গণমানুষের মনস্তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে ভ্রান্তভাবে। ইসলাম থেকে এদেশের মেধাবী ছেলেমেয়েরা সরে যাচ্ছে এইসব কারণেই। বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ইতিহাসে ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের জয়জয়কার। কিন্তু ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান না-জানা এবং ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে স্বীকার না-করা উগ্র মানুষদের কারণে সেই মুসলমানদের আজ এই দশা হয়েছে! এখান থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের বেরিয়ে আসা জরুরী।

ছয়.

সকল দুর্নীতির বীজতলা হলো 'বৈষম্য'। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে মানুষের মনে দুর্নীতি করার প্রেরণা জাগে। দুর্নীতিকে কেবল আর্থিক ব্যাপার কিংবা আপাত ব্যাপর মনে করলে দুর্নীতিকে বোঝা যাবে না। আমাদের রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি করেও বুঝতে পারে না যে দুর্নীতি করা হচ্ছে, কারণ আমাদের সংস্কৃতি দুর্নীতিকে একটা মাত্রা পর্যন্ত সমর্থনও করে। দুর্নীতি আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে যাওয়ায়, একে সাংস্কৃতিকভাবেও মোকাবেলা করতে হবে। শুধু আইন ও বিচারের আওতায় এনে কিংবা ভয়ভীতি সৃষ্টি করে একে নির্মূল করা যাবে না। বরং মানুষের মধ্যে আস্থা ও প্রেম সৃষ্টির লক্ষ্যে সবার আগে বৈষম্যের বিষদাঁত ভাঙতে হবে, এভাবে মানুষের মধ্যে উঁচু মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা'টি হয়ত পাঠকদের ভাল লাগবে।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
০১.১০.২০০৭

সূচি

প্রবন্ধ
দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব
যতীন সরকার ০৮

সাক্ষাৎকার
দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব
মোজাফফর আহমদ ১৫
বিষয় দুর্নীতি
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ২৩

প্রবন্ধ
দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব: ব্যক্তি মালিকানা: আধিপত্যের ধারণা: বিচ্ছিন্নতা
জাকির তালুকদার ৩৬
দুর্নীতির সমাজ-মনস্তত্ত্ব
চঞ্চল আশরাফ ৪৫
ক্ষমতা ও নৈতিকতার মনস্তত্ত্ব
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার ৫০

আলাপ
দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব
মঈন চৌধুরী – সলিমুল্লাহ খান ৬৩

প্রবন্ধ
দুর্নীতি নিয়া কয়েকটা কথা
ফয়েজ আলম ৮৩
বিশ্বপুঁজিবাদ ও দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব
আহমেদ স্বপন মাহমুদ ৮৯
দুর্নীতির উপনিবেশ – উত্তর-উপনিবেশ
মজিদ মাহমুদ ৯৪

সাক্ষাৎকার
দুর্নীতি বনাম সুনীতি
শ ও ক ত আ লী ১০৩
দুর্নীতির মনোবীজ
মা মু ন হু সা ই ন ১১০

প্রতিক্রিয়া
দুর্নীতির প্রশ্নে
ব রু ণ সে ন গু প্ত ১২৭
দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার
জয়নাল আবেদীন ১৩১
দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন ও দ্বিতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ডাক
শে খ বা তে ন ১৩৪
ক্ষমতা+ধর্ম= আমাদের অর্থনীতি= দুর্নীতির গরল পাঠ
আ য় শা ঝ র্ণা ১৪০

অনুবাদ
দণ্ডিতের দেহ
মিশেল ফুকো
অ নু বা দ শ ও ক ত হো সে ন ১৪২

প্রতিক্রিয়া
দুর্নীতি নিয়ে
র ও শ ন ঝু নু ১৫০
গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা
ফ রি দু জ্জা মা ন ১৫১
দুর্নীতি: ডালপালা বনাম শেকড়বাকড়
অ প র্ণা হা ও লা দা র ১৫২

দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব

য তী ন স র কা র

দুর্নীতিপরায়ণ বা সুনীতিপরায়ণ রূপে মানুষের জন্ম হয় না। দুর্নীতি বা সুনীতি কেনোমতেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্গত নয়। আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি ও প্রজাতি রক্ষণ প্রবৃত্তি– মাত্র এই দুটোই সহজাত প্রবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষসহ সকল প্রাণীই নিজেকে রক্ষা করার প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এবং শুধু নিজেকে নয়, বংশ পরম্পরায় নিজের প্রজাতিটিকে রক্ষা করার প্রবৃত্তিও তার স্বভাবের অন্তর্গত হয়েই থাকে।

অবশ্যি মনোবিদ্যার এমন কিছু ঘরানা (স্কুল অব থট) আছে যে-গুলোকে বলা যায়'প্রবৃত্তিভিত্তিক মনোবিদ্যা'– মানুষের বিভন্ন প্রবৃত্তির তাড়নাই এ ধরনের মনোবিদ্যার কেন্দ্রীয় বিষয়। এগুলোকে 'আত্মমুখী মনোবিদ্যা'ও বলা যেতে পারে। মনোবিদ্যার এসব ঘরানা আবার সজ্ঞান (কনশাস) মনোবৃত্তির চেয়ে নির্জ্ঞান (আনকনশাস)-এর ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষ নাকি নিজের সজ্ঞান ইচ্ছায় প্রায় কিছুই করে না, তার নির্জ্ঞান মনই তাকে নাকি দড়ি দিয়ে ঘুরায়, তাকে যেমনি নাচায় তেমনি নাচে। প্রবৃত্তিভিত্তিক বা আত্মমুখী মনোবিদ্যার কোনো ঘরানায় জোর দেয়া হয় ব্যক্তিনির্জ্ঞানের ওপর, কোনো ঘরানায় সমষ্টি-নির্জ্ঞানের ওপর। রমণের মতো মরণের প্রবৃত্তি, কিংবা পরকে হননের মতো আত্মহননের প্রবৃত্তিও নাকি মানুষের সহজাত। এরকম প্রবৃত্তিভিত্তিক মনোবিদ্যা দুর্নীতিপরায়ণতাকেও যে মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তি রূপেই বিচার করবে, তেমনটিই তো স্বাভাবিক।

এরই বিপরীত মেরুতে আছে আচরণবাদী মনোবিদ্যা (বিহেভিয়ারিজম)। এটিকে বলা যায় মনহীন মনোবিদ্যা। এই মনোবিদ্যা মনের অস্তিত্ব নিয়েই মাথা ঘামায় না। এর কাজ আচরণ নিয়ে। বাইরের ঘটনায় মানুষের (এবং অন্য প্রাণীরও) স্নায়ুতে 'উদ্দীপনা' (স্টিমুলাস) জাগে, সেই উদ্দীপনায় সে 'সাড়া' (রেস্পন্স) দেয়। এই উদ্দীপনার ও সাড়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই প্রাণী ও মানুষের আচরণ। মানসিক ক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা হয় যাকে, তা এ-রকম 'আচরণ' ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের নীতি-দুর্নীতিও, এই মনোবিদ্যার বিবেচনায়, আসলে উদ্দীপনা ও সাড়া-মূলক আচরণই। প্রবৃত্তিভিত্তিক মনোবিদ্যা মূলত ভাববাদী, আর আচরণবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদী।

যাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারী তাঁরা ভাববাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করেন। জগৎসংসার তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বস্তুময়, এবং সব বস্তুই দ্বন্দ্বময়। এই দ্বন্দ্বময়তাই পরিবর্তনের জনয়িতা, সব কিছুর ভেতরেই পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এক সময় ঘটে গুণগত পরিবর্তন, এই গুণগত পরিবর্তনেরই অপর নাম নতুন সৃষ্টি। এই দ্বান্দ্বিক নিয়মেই নতুন সৃষ্টি রূপে ভাবের উদ্ভব। মানুষের মস্তিষ্কই এই ভাবের আধার। এই ভাবের সকল প্রক্রিয়া ও অভিব্যক্তির নামই 'মন'। এই মনও দ্বন্দ্বময়। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মতো মানুষের মনও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মের অধীন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদভিত্তিক মনোবিজ্ঞান মনের সেই দ্বান্দ্বিক নিয়মেরই অনুসন্ধান করে। সেই অনুসন্ধানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজে বাস না করে মানুষ কখনও মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, 'মানুষ সামাজিক জীব'– এ-কথাটা মোটেই কথার কথা মাত্র নয়। সমাজ থেকেই মানুষ তার মনোবৃত্তি গঠন করে। সমাজের মানুষ রূপেই ব্যক্তি হিসেবে তাকে বেঁচে থাকতে হয়, এবং তার বংশপরম্পরাকে তথা মানবপ্রজাতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষণ ও প্রজাতিরক্ষণ– মানুষের পক্ষে এই দুই সহজাত প্রবৃত্তির কোনোটারই চরিতার্থতা সমাজের বাইরে গিয়ে ঘটান যায় না। সুনীতিমূলক বা দুর্নীতিমূলক– সব রকম আচরণই মানুষ করে সমাজের ভেতর থেকেই। সমাজের প্রকৃতি অনুসারেই তার সুনীতি বা দুর্নীতির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাই, দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য সমাজতত্ত্বের তথা সমাজের বিকাশধারার বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

দুই

সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত হয়নি, সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোনো মানুষকেই অন্যের সম্পদ অপহরণ করে বাঁচতে হত না। তাই আজকে যে-সব কুকর্মকে 'অর্থনৈতিক দুর্নীতি' বলা হয়, সে-সব কুকর্ম করার চিন্তাও তখন কোনো মানুষের মনে উঠতে পারত না। তাই সে-সমাজে 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব'ও জন্ম নেয় নি।

সমাজে শ্রেণীবিভক্তি ঘটে গেল যখন, তখন থেকেই সূচনা ঘটল দুর্নীতিরও। একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষ উৎপাদনের উপকরণের ওপর নিজেদের অধিকার বিস্তার করে নিল, আর অন্য শ্রেণীর অগণন মানুষেরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে উৎপাদন করল যে-সম্পদ, সেই উৎপন্ন সম্পদ থেকেই তাদের বঞ্চিত থাকতে হল, বেবাক সম্পদ গিয়ে জমা হল অনুৎপাদক অথচ উৎপাদনের উপকরণের মালিক পরশ্রমভোগী শ্রেণীটির ভাণ্ডারে। এ-রকম সমাজেরই নাম শ্রেণীসমাজ। এই শ্রেণীসমাজই ক্রমে দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তিত হল। তবে সবধরনের শ্রেণীসমাজের কর্তৃত্বশীল শ্রেণীই সম্পদ আহরণ করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর সম্পদ আহরণের (আসলে 'অপহরণের') প্রক্রিয়াটিকে কি ন্যায়নীতিভিত্তিক বলা যাবে? ন্যায়নীতিভিত্তিক যা নয় তা-ই তো দুর্নীতি। তাহলে, বলতেই হবে যে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাটিই দাঁড়িয়ে আছে

দুর্নীতির ওপর। দুর্নীতিই যে-সমাজের ভিত্তি সে-সমাজের মানুষ যে টিকে থাকার জন্যই– আত্মরক্ষা ও প্রজাতি রক্ষা উভয়টির জন্যই– সব সময় দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে, তাতে বিস্ময়ের কী আছে?

সমাজের বিকাশ ঘটে অসমগতিতে। তাই, বর্তমানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ যে 'চূড়ান্ত পর্যায়ে' উপনীত হয়েছে, সেই পর্যায়েও পৃথিবীর এখানে-ওখানে কিছু কিছু মানুষ সমাজের আদিম পর্বটিতেই আটকে রয়েছে। ও-রকম মানুষগুলোকে আমরা বলি 'অসভ্য', ওদের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় বা করুণায় আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি। কিন্তু ওদের মনোবৃত্তির সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তির যদি তুলনা করে দেখি, তাহলে তথাকথিত 'সভ্য' হওয়ার দরুন আমরা লজ্জিত না হয়ে পারব না। ওরা মিথ্যা কথা বলতে জানে না, চুরি বা ডাকাতি বলতে কী বোঝায় তা ওরা বোঝেই না। আর আমরা যে-সব কর্মকাণ্ডকে 'দুর্নীতি' বলি, সে-সবের অবস্থান তো ওদের বোধের সীমানারও বাইরে। ওদের ভাষাতেও চুরি ডাকাতি বা দুর্নীতিবোধক কোনো শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনটি হওয়ার কারণ: ওদের সমাজে এখনও আদিম সাম্যসমাজের অনেক উপাদান বিদ্যমান রয়ে গেছে, ওরা আমাদের মতো 'সভ্য' হতে পারেনি। সভ্য হয়েছি বলেই আমাদের চেতনায় ও আচরণে 'দুর্নীতি' এসে ভর করেছে। আমাদের ভাষাতেও দুর্নীতির নানাদিক প্রকাশের জন্য অজস্র শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। স্বীকার না-করে পারা যায় না যে দুর্নীতি হল তথাকথিত সভ্যতারই অপরিহার্য উপাদান।

তিন

আমাদের এই উপমহাদেশের– প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ-সংগঠন তথা সমাজবিকাশের গতি-প্রকৃতির মধ্যেই আমাদের দুর্নীতির মনস্তত্ত্বের বীজটির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সকল তথ্য ও তত্ত্বের আকরগ্রন্থটির নাম 'মহাভারত'। 'যা নাই (মহা) ভারতে, তা নাই ভারতে'। – অর্থাৎ মহাভারতে যা উল্লিখিত হয় নি, এমন কোনো বিষয়ই সেকালের ভারতে ছিল না। সেই মহাভারতকে (এবং এ-রকম অন্য অন্য গ্রন্থকে) আমরা যদি দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদীর দৃষ্টিতে পাঠ করি, তাহলে এ থেকে অনেক বস্তুসত্য ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যই আহরণ করে নিতে পারব।

এখানে ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মহাভারতের একস্থানে বলা হয়েছে– "পরের মর্ম ছিন্ন না করে, দুষ্কৃত কর্ম না করে, মাছ ধরার মতো, বিশ্বাসঘাতকতা না করে কেউই বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না"।

শ্রেণীসমাজে সম্পত্তি আর দুর্নীতি যে একই সুতোয় গাঁথা, সেই সত্যটিই তো এখানে স্বীকৃত। মহাভারতের বহু আখ্যানে ও পাত্রপাত্রীদের বিভিন্ন বক্তব্যেই সেই সত্যের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।

সমাজের অসম বিকাশের নিয়ম অনুসারেই উপমহাদেশের সব অংশে একই সঙ্গে শ্রেণীসমাজের উদ্ভব ঘটে নি। সেই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষে যে-সময়ে শ্রেণীশাসন ও নিপীড়নমূলক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিল, সে-সময়েও দেশের কোনো কোনো

অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল গণরাজ্য। সেই গণরাজ্যগুলোতে আদিম শ্রেণীহীন সাম্যসমাজের কিছু রেশ থেকে গিয়েছিল। সে-রকম একটি গণরাজ্যেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম। সেই গণরাজ্যের আশপাশে অবস্থিত রাজতন্ত্রগুলোতে তিনি চৌর্য ও দস্যুবৃত্তির প্রসার দেখেছিলেন। কীভাবে এ-সব বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছিল, সে-বিষয়ে বৌদ্ধগ্রন্থ 'দীর্ঘনিকায়'-এর একটি আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে, –

"... রাজা ধর্মপথে চলিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু দরিদ্রের জন্য ধনের সংস্থান করিলেন না... ইহাতে রাজ্যে দরিদ্রতা আরও বাড়িয়া গেল ... লোক পরের ধন অপহরণ করিতে লাগিল ... তস্করকে ধরিয়া লোকে শেষে রাজার নিকট লইয়া গেল ... রাজা তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অন্যের ধন অপহরণ করিয়াছ– হে পুরুষ, এই অপবাদ কি সত্য?'

'হাঁ দেব, সত্য... ।'

'কিন্তু কী কারণে?'

'জীবিকা চলিতেছিল না দেব...'

...রাজা সেই পুরুষকে ধন দেওয়াইলেন... তাহার পর বলিলেন...'হে পুরুষ এই ধনে তুমি জীবিকা নির্বাহ কর, পিতামাতার অন্নসংস্থান কর, দারাপুত্রের প্রতিপালন কর'... রাজ্যের লোক শুনিল রাজা চোরকে ধন দেওয়াইছেন, তখন সকলে ভাবিল, 'আমরাও চুরি করিব'... কিন্তু রাজা আর কত ধন দিবেন? তিনি মনস্থ করিলেন, এইভাবে তস্করকে ধন দিলে রাজ্যে চুরি বাড়িয়া যাইবে, এখন হইতে চোরের কঠিন শাস্তি বিধান করিতে হইবে... তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া লইলে রাজ্যে চুরি একেবারে বন্ধ হইতে পারে।'

রাজার আজ্ঞায় চোরের মুণ্ডুচ্ছেদ করা হইলো ... তখন চোরেরা ভাবিলো, চুরি করিলে রাজা তাহার শির কাটাইয়া লয়, তাহা হইলে চল আমরাও এখন অস্ত্র শানাই, যাহার চুরি করিবো তাহার শিরও কাটিয়া লইবো, ... এইভাবে লোকে ধীরে ধীরে অস্ত্র শানাইলো, পরে শাণিত অস্ত্র লইয়া গ্রাম লুট করিলো– পথচারি পথিকের মাথা কাটিয়া লইয়া যথাসম্পত্তি অপহরণ করিলো... ।"

চৌর্য ও দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে একান্ত স্থূল ও প্রত্যক্ষভাবে না করে অন্যভাবেও অন্যের ধন অপহরণ করা যায়। সে রকম সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যক্ষভাবে ছলচাতুরি করে সম্পত্তি অপহরণের পন্থাকেই বলা হয় 'দুর্নীতি'। শ্রেণীসমাজে দুর্নীতিবাজদের জন্যই যে জীবনযাত্রা সহজ হয়ে থাকে আর সুনীতিপরায়ণদের জীবনযাপন হয়ে থাকে খুবই দুরূহ, সে বিষয়টি লক্ষ্য করেই গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন –

"যে খাদ্য সংগ্রহে নির্লজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টে রত, দাম্ভিক প্রগলভ, এবং পাপচরিত্র, তার পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ। কিন্তু যিনি বিনয়ী, শূচিসম্পন্ন, অনাসক্ত, অপ্রগলভ এবং শুদ্ধ জীবনকে যিনি আদর্শ জ্ঞান করেন, এরূপ ব্যক্তির জীবন কষ্টে কাটে।"– [ধম্মপদ, অষ্টাদশ অধ্যায়: মলবর্গ১০/১১.]

অর্থাৎ আড়াই হাজার বছর আগেও সমাজে দুর্নীতিবাজরাই দাপটের সঙ্গে চলাফেরা করত, আর সুনীতিপরায়ণদের থাকতে হত জবুথবু হয়ে।

চার

দুর্নীতি করলেই যেখানে সহজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, সেখানে মানুষ সুযোগ পেলেই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়। সুযোগ ও সাহসের অভাবে অনেকেই সেই প্রলুব্ধতাকে দমন করে রাখতে বাধ্য হলেও মনের গভীরে প্রলোভনের তাড়না থেকেই যায়। প্রলোভনের এই তাড়নাই দুর্নীতির মনোবীজ। এই মনোবীজটি কোন্ পরিবেশে কীভাবে বেড়ে ওঠে, তাতে কেমন ফল ধরে, এবং কোন্ অবস্থায় কোন্ পদ্ধতিতে এর মূলোৎপাটন করা যায়– এ-সবই হল দুর্নীতির মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

অবশ্যি কঠোরতার সঙ্গে সুর্নীতির অনুশীলন করে উন্নততর নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী হন যাঁরা, তাঁরা সুযোগ পেলেও কখনও দুর্নীতিতে লিপ্ত হন না, দুর্নীতির প্রলোভন থেকেও মুক্ত থাকেন। এ-রকম মানুষ আদর্শ রূপে সমাজে নন্দিত হন বটে, কিন্তু শ্রেণীসমাজের বিরূপ বাস্তবতার দরুনই এ-রকম আদর্শ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না, সমাজের নিয়ন্তাও হতে পারেন না তাঁরা, এবং সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হয় না। যে যত বেশি বৈষয়িক সম্পদের অধিকারী, এ-সমাজে তার তত বেশি ব্যক্তিক ও পারিবারিক প্রতিপত্তি। সেই বৈষয়িক সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি লাভের প্রতিযোগিতায় সুনীতির অনুসারীরা প্রতিনিয়তই পেছনে পড়ে যেতে থাকেন, আর দুর্নীতিবাজদের ঘটতে থাকে বাড়বাড়ন্ত। এতেই বৈষয়িক সম্পদকামী মানুষের মধ্যে মানসিক টানাপোড়েন দেখা দেয়। সেই টানাপোড়েনের এক পর্যায়ে দুর্নীতির কোলেই আত্মসমর্পণ করে বসেন অনেক সুনীতিমান মানুষও।

'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা কথা আছে। এই কথাটিকে অবশ্যই দুর্নীতির মনস্তত্ত্বের একটি সূত্র বলে ধরে নেয়া যায়। অভাব দূরীকরণের সুনীতিসংগত উপায়ের অভাবেই মানুষ তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করে– অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। কিন্তু মোটেই যাদের অভাব নেই, বরং সীমাহীন যাদের প্রাচুর্য, তারা যখন দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় তখন অভাবের বদলে তাদের স্বভাবই হয়ে ওঠে দুর্নীতির কারখানা। তাদের স্বভাবের ভেতরেই জন্ম নেয় অপরিমেয় বৈষয়িক সম্পদ জমিয়ে তোলার লোভ। সে-লোভই তাদের দুর্নীতির পথে টেনে নিয়ে যায়। অভাবভিত্তিক দুর্নীতি (নিড্-বেইজ্ড্ করাপশন) ও লোভভিত্তিক দুর্নীতি (গ্রিড্-বেইজ্ড্ করাপশন)– এই দু'রকম দুর্নীতিরই সুতিকাগার শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজ। জন্মগতভাবেই মানুষের স্বভাবের ভেতর দুর্নীতিপরায়ণতা বিদ্যমান থাকে– এমন কথা মোটেই ঠিক নয়। আবারও মহাভারতের শরণাপন্ন হই। মহাভারতেরই অন্তর্গত 'গীতা'। দুর্নীতির মনস্তত্ত্বের কিছু মূল্যবান সূত্রও এই গীতা থেকেই উদ্ধার করা যায়। গীতার কয়েকটি শ্লোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিষয়সম্পত্তি-অভিলাসী মানুষের মানস বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে– "বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে মানুষের মনে সে-বিষয়ে 'আসক্তি' জন্মে। সেই আসক্তি

থেকেই বিষয়-সম্পত্তি লাভের জন্য মনে জন্ম নেয় 'কামনা'। সেই কামনা যখন সহজে পূরণ হয় না, তখন মনের ভেতর সঞ্চারিত হয় 'ক্রোধ'। ক্রোধ মানুষকে 'মোহগ্রস্ত' করে ফেলে। মোহগ্রস্ত মানুষই 'স্মৃতিভ্রংশ' হয়ে যায়– অর্থাৎ শিক্ষাসূত্রে লব্ধ তাদের সকল ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দের বোধের বিলুপ্তি ঘটে। সেই স্মৃতিভ্রংশতা থেকেই হয় 'বুদ্ধিনাশ'। আর বুদ্ধিনাশ হলেই ঘটে 'বিনাশ'।" [দ্রষ্টব্য 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায় শোক ৬২/৬৩]

আসক্তি, কামনা, ক্রোধ, সম্মোহ (মোহগ্রস্ততা), স্মৃতিভ্রংশতা, বুদ্ধিনাশ ও বিনাশ– মানুষের মানসিকতার এই ক্রমবিপর্যয়ের ঘটনা যে ঘটে বিষয়-সম্পত্তিকে উপলক্ষ করেই, এ-কথার সত্যতা নিশ্চিত হবে এ-কালের বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যার পর্যবেক্ষণেও। আজকের বাংলাদেশেও দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে যারা, তারা তো গীতায় উল্লিখিত বিষয়-আসক্তদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যতদিন পৃথিবীতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন এই বিষয়-আসক্তির মানসিকতা থেকে সমাজের মুক্তি ঘটবে না, সমাজ কোনোমতেই দুর্নীতিমুক্ত হবে না।

পাঁচ

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যারা ধারক-বাহক, তারা নিশ্চয়ই সহজে এ-সমাজটিকে ভেঙ্গে যেতে দেবে না। এখানে-ওখানে জোড়াতালি দিয়ে যতদিন সম্ভব ততদিন এটিকে চালু রাখার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যাবেই। এর 'ক্লিনিকাল ডেথ' হলেও হাসপাতালের বিছানায় শুইয়ে রেখে 'ফিজিকাল ডেথ'-কে বিলম্বিত করে চলবে। এ-সমাজে দুর্নীতি যখন সকল সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে যায়, দুর্নীতিই যখন দুর্নীতির ভিত্তিতে গড়া সমাজটির অস্তিত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এ-সমাজের কর্তাব্যক্তিরা নড়েচড়ে বসেন, তাদের শুভানুধ্যায়ী বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধির পসরা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান, ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু সমাজটিকে খাড়া করে রাখার জন্য নানা জড়িবুটির নোসখা বাতলান।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, এবং হবেও না। দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানের হাঁকডাকের ধূম্রজাল কিছুদিনের জন্য মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে কেবল, সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে না।

এমন কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই তারা প্রতিনিয়ত মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানান। এরকম আবেদন তো সেই স্মরণাতীতকাল থেকেই জানানো হয়ে আসছে। যুগে যুগে যাঁরা 'ভগবানের দূত' বলে পরিচিত, তাঁরা তো সকলকে ভালোবাসতে , ক্ষমা করতে ও 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ' নাশ করতেই মানুষকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তবু , কবিগুরুর মতো আমরাও জানি যে, এতাবৎকাল ধরে তাদের সকলকেই 'ব্যর্থ নমস্কারে' ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখনও

হৃদয়-পরিবর্তনের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সকল আবেদনই এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ-নির্মাণের সদিচ্ছা 'ধরার ধুলায় হারা' হবে।

তবে একুশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বেই দুর্নীতি সম্পর্কে যে-সচেতনতা দেখা দিয়েছে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর মতো সংস্থা-যে দুর্নীতির অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে মাঝে মাঝে যে দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান চলে,– সে-সবের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা কোনোমতেই উচিত হবে না। আবার এগুলো সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যদি মোহগ্রস্ততার সঞ্চার হয়, জনগণ যদি বিশ্বাস করতে থাকে যে এ-সবের ফলেই সর্বত্র দুর্নীতিমুক্তি ঘটে যাবে, তাহলে সমাজ আরো বহুকালের জন্য সংস্কারবাদের চোরাবালিতে আটকে পড়বে, কাঙ্খিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন অনেক বিলম্বিত হবে। কাজেই প্রকৃত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ যাদের কাম্য, সংস্কারবাদের মোহমুক্ত সেই সমাজবিপ্লবীদের দায়িত্ব হবে দুর্নীতি-উদ্‌ঘাটক সকল উদ্যোগকে সাহায্য করা, দুর্নীতি-বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সেগুলোর সকল ইতি-নেতি পর্যবেক্ষণ করা, জনগণকে দুর্নীতির আসল হোতাদের চিনিয়ে দেয়া, দুর্নীতির মূল উৎস ও দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে জনগণকে বিপবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সেই জনগণই শ্রেণীসমাজের অবসান ঘটিয়ে যে-নতুন সমাজের পত্তন ঘটাবে, সেই সমাজের মানুষের মনমানস হবে এখনকার মানুষদের থেকে অন্যরকম। সেই অন্যরকম মানুষদের সমাজই হবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ।

দীর্ঘকালের সাধনায় মানুষ যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়েছে, এবং সেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপাদন-শক্তির যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে, তাতে এখন অনায়াসে সকল মানুষেরই জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটান সম্ভব। এখন এমন এক প্রাচুর্যের সমাজ গড়ে তোলা যায়, যে-সমাজে প্রকৃত সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা হবে।

সম্পদের প্রাচুর্য-সমন্বিত সাম্যনীতিভিত্তিক সমাজে একজনকে বঞ্চিত করে আরেকজনের সম্পদশালী হওয়ার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। সে-রকম প্রয়োজন থাকবে না বলে মানুষের মন থেকে দুর্নীতি-ভাবনারই মূলোচ্ছেদ ঘটে যাবে। এখন তো এই সমাজে 'সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি' এবং 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এটিই হল বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথ, সে-পথে চলার মনোবৃত্তি এই সমাজব্যবস্থা থেকেই জন্ম নিয়েছে। এই সমাজব্যবস্থাটি বদলে গেলে, স্বাভাবিক নিয়মেই, মানুষের মনোবৃত্তিও বদলে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যাবে।

আমি জানি: দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে-কথাগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই সর্বজনগ্রাহ্য হবে না, অনেকেই এর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে পারেন। বিশেষ করে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর থেকে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামক তত্ত্বটিকেই একান্ত অসার ও ভূয়া বলে বিবেচনা করেন। কাজেই তাঁদের

বিবেচনায় আমার এতক্ষণের সকল বাকবিস্তারই নিতান্ত বালখিল্য প্রলাপ বলে সাব্যস্ত হবে। তা হোক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ-বিরোধী কোনো তত্ত্ববিদ-দার্শনিক যদি অন্য কোনো অকাট্য তত্ত্ব হাজির করতে পারেন, এবং সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে দুর্নীতির সঠিক মনস্তত্ত্ব বিশেষিত ও ব্যাখ্যাত হয় যদি, তাহলে সেটি অবশ্যই সর্বজনগ্রাহ্য হবে। সে-রকম সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বকে গ্রহণ করে আমিও ধন্য হয়ে যাব।

তবে এর আগে, অর্থাৎ একটি নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর বিকল্প না পাওয়া পর্যন্ত, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে কিছুতেই আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

সা ক্ষা ৎ কা র

দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব

মো জা ফ ফ র আ হ ম দ

[জন্ম ১৯৩৭, কলকাতার পার্কসার্কাস। প্রকাশিত গ্রন্থ অনার্জিত শিক্ষাপুরাণ। অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা। ১৯৫৬-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। সেখানে ছিলেন ১৯৫৯ পর্যন্ত। এরপর ১৯৬৫ পর্যন্ত বিদেশে। দেশে ফিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। ১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগদান। এখান থেকে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অর্থনীতি বিভাগ থেকে ২০০৩ সালে অবসর গ্রহণ। অর্থনীতি বিষয় হলেও সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রেও তাঁর সমান বিচরণ। বিভিন্ন সময়ে সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। বর্তমানে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ-এর ট্রাস্টিবোর্ডের সভাপতি।]

হালখাতা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বিকেল ৫টা। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, লেখক ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর মুখোমুখি হয়েছি দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার জন্য। আমরা প্রধানত

পত্রিকায় ও টিভিতে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা শুনি বা দেখে থাকি। বিষয়টির অন্তরালে আরেকটি দিক থেকে যায়, দুর্নীতির অন্তরালের মনস্তাত্ত্বিক এ দিকটি নিয়ে তাঁর কাছে আজ আমরা কিছু প্রশ্ন রাখব।

বাংলাদেশ যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল, তার ৩৫/৩৬ বছর পর দেখা যাচ্ছে, সেই দেশেরই প্রায় প্রতিটি মানুষের মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়ে আছে দুর্নীতি করার জন্য। এই ধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি হওয়ার পেছনে যৌক্তিক কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

মোজাফফর আহমদ

বাংলাদেশ স্বাধীন করতে গিয়ে আমাদের বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সে যুদ্ধের পেছনে যে ধারণাটা ছিল সে ধারণা বেশিদিন থাকেনি। তার কারণ 'একটি গণতান্ত্রিক সমদৃষ্টিসম্পন্ন সবার জন্য সমান সুযোগ'– এমন সমাজ গড়তে গেলে সমাজের বিভাজনকে কমিয়ে আনতে হয় এবং এজন্য দরকার হয় নানা কৃচ্ছতা ও নানা ত্যাগের। কিন্তু আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পরপরই মানুষ অতি দ্রুত পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে লুটপাট করেছে। নিজেদের ভোগে লাগান যায় এই প্রক্রিয়ায় কেবল পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুটে নিতে দেখেছি তা নয়, আমরা যাদের বাঙালি মনে করিনি তাদের বিপক্ষেও এই প্রক্রিয়াটি কাজে লাগিয়ে এবং আমরা যাদের মনে করেছি তখনকার দিনে বলা যায় যে পাকিস্তানপন্থি এমন লেবেল লাগিয়ে বহু লোকের হেনস্তা আমরা করেছি। যেমনি যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়নি, তেমনি বিচার হয়নি যারা সাধারণ মানুষের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল এবং স্বাধীনতার যে স্বপ্ন ছিল– এসব সেই স্বপ্নকে নস্যাৎ করেছিল। একে নস্যাৎ করে তারা ক্রমান্বয়ে একটি ভোগবাদী এবং গুটিকয় ব্যক্তির সুবিধা সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রতন্ত্রের সৃষ্টি করে। এটাই আমাদের স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্র অর্থাৎ স্বর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও মানুষের মুক্তি ঘটাতে হবে– সেই মূলমন্ত্রটির বীজ নষ্ট করে দেয়। সেই পথ ধরে ক্রমান্বয়ে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায়, ব্যবসায়ে, আমলাতন্ত্রে, এমনকি সেবা পরিসেবা প্রতিষ্ঠানে ইত্যাদি সব জায়গায়ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে উদ্দীপ্ততা, যে তারুণ্য, যে স্বপ্ন দেখেছিল সে স্বপ্নটি হল নিজের স্বর্বস্ব ত্যাগ করে একটা স্বপ্নের ভূমি সৃষ্টি করা। যেখানে সকল মানুষের অধিকার সমান হবে, সকল মানুষের সুযোগ সমান হবে এবং সকল মানুষের গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সেটাও সমান হবে। কিন্তু পরবর্তী কালে সবকিছু বদলে যায় কারণ আমরা দেখতে পাই যে মানুষ ব্যক্তিগত ভোগের দিকে অতি মাত্রায় মেতে উঠে লুটপাট করছে। মানুষ যে যে সুবিধায় কেন্দ্রিভূত হচ্ছে, মানুষ ক্রমাগত অন্যের অধিকার হরণ করছে, সেটা কখনও তাকে বিভিন্ন রকম তক্‌মা পরিয়ে দিয়ে; অন্যের যে মানসিক অধিকার আছে তখন সেটা অস্বীকার করে। এর ফলে যেটা দাঁড়াল বাঙালির যে ঐক্য একত্ব গড়ে উঠেছিল, সেই ঐক্যটি বিনষ্ট হল এবং এর ভিতরে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মূল্যবোধটি নষ্ট হয়ে গেল। তারফলে আমরা যে, ত্যাগী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া সেটাকে বর্জন করে আমরা ভোগী একটা প্রক্রিয়ার

দিকে ধাবিত হলাম এবং সেই ধাবমান প্রক্রিয়া এখনও চলছে। কারণ এখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, পরের যে ভালো, পরের প্রতি যে দায়িত্ব, সেটা থেকে আমরা অনেক দূর বিচ্যুত হয়ে গেছি।

হালখাতা

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাইমারী স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সিলেবাসের কোথাও 'নীতি শিক্ষা' এবং 'নীতি রক্ষা' করে জীবন যাপনের প্রতি জোর দেয়া হয়নি। আপনি কি মনে করেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নীতিকে উৎসাহিত এবং দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার ওপর আবশ্যিক সিলেবাস থাকা প্রয়োজন?

মোজাফফর আহমদ

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কিন্তু এই 'নীতি শিক্ষা' বলে কোনো বিষয় ছিল না। নীতি শিক্ষাটা জড়িয়েছিল আমাদের সচল শিক্ষার ভেতরে, সেখানে আমরা দেখেছি যে স্যার আশুতোষ তার ঘড়ি পাঁচ মিনিট যখন বিলম্বে যাচ্ছে, তখন তিনি সময় রক্ষা করতে পারছেন না, তিনি ঘড়ি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। আমরা দেখেছি হাজী মুহম্মদ মুহসীন ক্ষুধার্ত মানুষের বাড়িতে নিজে বয়ে নিয়ে খাদ্য পৌঁছে দিচ্ছেন, আমরা খলিফা হারুন-অর-রশীদকে দেখেছি ক্ষুধার্তের কাছে অন্ন পৌঁছে দিতে। এমনি নানা গল্প আমাদের পাঠের ভেতরে ছিল এবং আমাদের সহশিক্ষার ভেতরে ছিল এবং আমাদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতরে মূল্যবোধ যে গড়ে উঠতো সেটার ভিত্তি ছিল পরিবার, সেটার ভিত্তি ছিল পরিবেশ, সেটার ভিত্তি ছিল শিক্ষালয়ের গুরুজন শিক্ষকেরা। এবং আমাদের উপরে যারা পড়তেন তারা। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সংগ্রাম করছি স্বাধীনতার জন্যে। সেই চল্লিশের দশকের কথাই বলি আর সেই ষাটের দশকের কথাই বলি– আদর্শ ও পরকে আপন করে নেয়ার যে তাগিদ অর্থাৎ একটা নীতিবোধ আপনা আপনি আমার কর্মের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। সেটার প্রেরণা কখনও ধর্ম হয়েছে, কখনও ইতিহাস হয়েছে, কখনও কারও জীবনীগ্রন্থ হয়েছে। এজন্য নীতিশাস্ত্র একটা আছে, নীতিশাস্ত্র পাঠ করলেই যে সে নীতিবান হবে সেকথা বলা যাবে না, তবে দুর্নীতির আজকে যে প্রকৃতি, এটাকে বোঝার জন্য, এটার ব্যাপ্তি দেশের যে ক্ষতি করছে এটা সম্পর্কে সবাইকে সজাগ করান দরকার। সে হিসেবে একটা বিষয় হয়ত-বা পাঠ্যক্রমে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবারে যদি নীতি না থাকে, পরিবেশে যদি নীতি না থাকে এবং আমাদের শিক্ষক ও বড়দের যদি নীতি না থাকে, আইনের শাসন যদি না থাকে, নিরপেক্ষতা যদি না থাকে, এই নীতিশাস্ত্র পড়িয়ে আমরা দুর্নীতি রোধ করতে পারব না।

হালখাতা

অমাদের সমাজে নীতিবান মানুষের পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই বরং দুর্নীতিপরায়ণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা অনেক। আপনি কি মনে করেন দুর্নীতিবাজের শাস্তির পাশাপাশি সমাজে নীতিবান মানুষের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন?

মোজাফফর আহমদ

আমাদের দেশে খবরের কাগজে আজকাল যে সব খবর বের হয়, আমরা তাতে দেখতে পাই, কত মানুষ মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে। আমিও সামাজিক কিছু-কিছু কাজ করতে গিয়ে এমন বহু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সমাজ এদের মূল্যায়ন করে না। আমাদের দেশে এখন অনেকেই চাঁদা নিয়ে অনেক পুরস্কার প্রবর্তন করছে। সুতরাং আমাদের দেশে মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা সে মূল্যায়নের ব্যবস্থাটা আমি মনে করি, সামাজিকভাবে বিকেন্দ্রিভূত স্থানিক হওয়া প্রয়োজন। যেমন একটা গ্রামে একজন মানুষ যদি সৎকর্ম করে তখন তাকে সামনে তুলে ধরা উচিত। একজন শিক্ষক ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য নিজের যা আছে সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে তাদের ভালো করার জন্য চেষ্টা করেন, এই সমাজ তার সম্মানের ব্যবস্থা করে না। ঐ যে ছোট ছেলেটি রেল পথে লাল পতাকা তুলে মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিল, উচিৎ তাকে জাতীয় সম্মাননা দেয়া। তো আমাদের ভেতরে যাদের সমাজকেন্দ্রিক চেতনা আছে সে চেতনা মানুষকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, এই মানুষগুলোকে আমরা সত্যিকার অর্থে তুলে ধরতে পারিনি। সে জন্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে এই সমস্ত মানুষ এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরা এবং তাদের পুরস্কৃত করা। আমরা এটা ক্ষুদ্রভাবে শুরু করেছি, আমার মনে হয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সৎকর্ম করেন এমন কাউকে যদি চিহ্নিত করে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে পারে তাহলে ঐ যে আগে নীতির কথা বললাম সে নীতিবোধটি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের তরুণদের মধ্যে আপনা আপনি ছড়িয়ে যাবে।

হালখাতা

টি.আই.বি'র রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে– আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের প্রতিবেদন পেশ করা হল এবং বর্তমানে সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে; এর ফলে মানুষের মধ্যে যে ধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছে সে ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

মোজাফফর আহমদ

প্রথমে একটা জিনিস বলে নেয়া দরকার 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' হলো বার্লিন বেইজড একটা অরগানাইজেশন এবং 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' ঢাকার একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। দুটো কিন্তু একই কাজ করে। যদিও দুর্নীতির বিরুদ্ধের

অভিযানে তারা সহযোগী মাত্র। সুতরাং বাংলাদেশ দুর্নীতিতে যে পাঁচবার সর্বনিম্ন স্কোর করেছিল, এটা বার্লিনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ কাজ, যার সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কোনো যোগাযোগ নাই। এক্ষেত্রে টি.আই.বি মূলত সাধারণ মানুষ সরাসরি যে দুর্নীতির শিকার হয় সেটা নিয়ে কাজ করে, একে পেটি করাপশন বলে আর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ড করাপশন অর্থাৎ বড় বড় রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের যেসব কারণে দুর্নীতি হয় সেটা নিয়ে কাজ করে। এখন যে দুর্নীতি কমিশনকে আমরা কাজ করতে দেখছি তারা কিন্তু গ্রান্ড করাপশনকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং গ্রান্ড করাপশনের ফলে রাতারাতি আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ কেড়ে নিয়েছে এই জাতীয় মানুষের বিরুদ্ধে তারা তদন্ত করছেন এবং একটা আইনী প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এটার ফলে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সেটার একটা নেতিবাচক দিক হল ব্যবসায়ীরা যারা এই রকম টাকা নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তবে অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য যতটুকু সচল থাকা উচিত সেটা কিন্তু তারা করছেন। অনেক মধ্যবিত্ত আছে যাদের বিদেশে অবস্থানকারী পুত্রের কাছ থেকে ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ পেত সে কারণে তাদের ট্যাক্স রিটার্ন দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। এখন তারা যে সব সম্পদ ডিক্লেয়ার করেননি এ সমস্ত লোককে তাদের সম্পদ ডিক্লেয়ার করার জন্য সরকার যে আহ্বান জানিয়েছেন এতে মানুষ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে আছে। যার ফলে আমরা দেখতে পাই সঞ্চয়পত্র কিন্তু আগের মতো কেনাবেচা হচ্ছে না। সুতরাং অর্থনীতিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা একটা ভয়ভীতির সঞ্চার করেছি। কিন্তু আমাদের যেটা দরকার মানুষকে মোটিভেইট করা। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, প্রতিরোধী, এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা সৎ এবং সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে এটাকে দূর করার লক্ষ্যেই এই মোটিভেশনটা দরকার। এই নীতি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন বা টাস্ক ফোর্স তারা যেটা করেছেন তারা কিন্তু তাদের কর্মের ভেতর দিয়ে দুষ্টকে শাস্তি দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর ফলে একটা দিকে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করব তারা দ্রুত অন্যদিকে মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে দুর্নীতির অস্তিত্ব খোঁজ করবেন। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সততাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে– এরকম মানব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তারা গ্রহণ করবে।

হালখাতা

টি.আই.বি'র এধরনের রিপোর্টের পজেটিভ দিক তো আছেই; কিন্তু এতে বাংলাদেশ কি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে?

মোজাফফর আহমদ

আমার মনে হয় না। তার কারণ টি.আই.বি যে গবেষণা করে, তার ওপর কিন্তু আবার গবেষণা করে ১৩টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। তাদের গবেষণা থেকে তো বাংলাদেশ বাদ যাবে না। সুতরাং টি.আই.বি'র গবেষণায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একথা বললে তো ঠিক হবে না। তবে বাংলাদেশে যদি দুর্নীতির ব্যাপ্তি সবসময়ই এরকম থাকে তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুর্নীতির কারণে আমাদের প্রবৃদ্ধি হার ২% থেকে ৩% কম হয়, আমাদের আয়বৈষম্য বাড়ে। আমাদের দারিদ্র্য কমার বদলে বহুলোক দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয় যাদের দরিদ্র থাকার কথা ছিল না। সৎভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল তাদের। সুতরাং বলা হয় যে আমাদের ইমেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা যদি আমাদের ঠিক করতে হয় তাহলে আমাদের স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দুর্নীতিকে কার্পেটের নিচে রেখে লাভ হবে না।

হালখাতা

আমার সাথে আপনিও একমত হবেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ যেমন বেড়েছে, একইভাবে মানুষের মধ্যথেকে মূল্যবোধ নীতিবোধ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নীতিহীনতা বা দুর্নীতি এবং বাংলাদেশের দুর্নীতি– এ দুয়ের মধ্যে কি কোনো আন্ত:সম্পর্ক আছে? অথবা কথাটি কি এভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের দুর্নীতি কি আন্তর্জাতিক দুর্নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নাকি তার ধারাবাহিকতা?

মোজাফফর আহমদ

বাংলাদেশের দুর্নীতির কতগুলো দিক আছে। একটা দিক অবশ্যই আন্তর্জাতিক দুর্নীতির সাথে এর যুক্ততা। তার কারণ হল আমরা দেখতে পাই বিদেশী বিনিয়োগ যারা করতে আসে তারা কিন্তু এই দুর্নীতিকে সাহায্য করে। আমাদের
দেশে এরা বাড়িবাড়ি সাহায্য করেছে। সুতরাং বিদেশী স্বার্থে আমাদের দেশে একটা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। যারা দেশের স্বার্থকে, সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন কিছু কর্ম করে যাতে আমাদের প্রকল্প ব্যয় বাড়ে, যাতে আমাদের জিনিস-পত্রের দাম বাড়ে, যাতে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়। আমাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নস্থ হয়। এতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি আছে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দিকের চাইতেও আমরা বলব যে, আমাদের স্বভাবের মধ্যে দুর্নীতির দিকটা এসে গেছে। আমরা যারাই একটু আকাশ সংস্কৃতি দেখি, তারা লক্ষ্য করলে দেখব, ঢাকায় যারা বড় বড় দালান তুলছে– এই দুর্নীতিবাজেরাও কিন্তু এরকম দালান তুলতে চায় যা নিজেদের সামর্থের মধ্যে, নিজেদের যে আয় তার মধ্যথেকে। এরা কিন্তু নিজের সন্তানকেও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। সুতরাং এই যে ডেমোনেস্ট্রেশন ইফেক্ট সেটা কনজুমার-এর মধ্যদিয়ে এসছে। সেটাকে সীমিত করার চেষ্টা কিন্তু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পর্যায়ে সম্ভব। এ কাজটা আমরা করি না। সুতরাং এই দ্রুত

বিলাসী হয়ে ওঠার যে প্রচেষ্টা, সেটা আমাদের ছেলেবেলায়, এমনকি আমাদের ছাত্রাবস্থায়, এমনকি প্রথম শিক্ষক হয়েছিলাম তখন যে মূল্যবোধগুলো আমাদের ছিল, কৃচ্ছতার মাধ্যমে নিজেরা এর ভিতরে থেকে নিজের পরিবারকে সহায়তা করেছি এবং নিজে এমন এক জীবন যাপন করেছি যাতে মানুষ আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারে যে মানুষটি অন্যায়ের সাথে গাঁটছাড়া বাঁধেনি। এজিনিসটা হারিয়ে যাওয়ায় আজকের ঐ আন্তর্জাতিক
খনিবিদ্যার সাথে স্বদেশেও এক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজি, পরস্বহরণ এই জাতীয় জিনিস আমাদের সংস্কৃতির ভেতরে ঢুকে সর্বনাশ করে দিচ্ছে।

হালখাতা

একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনার কি মনে হয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতর দিয়েও মানুষের মনস্তত্ত্বকে লোভ-লালসা তথা দুর্নীতি থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্ত করা সম্ভব? নাকি বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এর মূলনীতিতে তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা অনিবার্য?

মোজাফফর আহমদ

অর্থনীতির কিন্তু নানা বিভাজন আছে। সুতরাং আমরা যদি ক্যাপিটালিজমের কথা ভাবি তাহলে এই পদ্ধতিতে দুর্নীতি থাকবেই। কোনো উপায় নেই। আবার আমরা যদি কো-অপারেটিভ ক্যাপিটালিজম-এর কথা ভাবি, কমন গুডস-এর কথা চিন্তা করি, কো-কালেকটিভ ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করি তাহলে এই ধারার অর্থনীতিতে কিন্তু দুনীতির কোনো অবস্থান নেই। কাজেই পুঁজিবাদের সঠিক চর্চার ভেতর দিয়ে দুর্নীতি দূর হবে কি-না, সেটা নির্ভর করবে আপনি সেই চর্চাকে কতটুকু মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করতে পারলেন তার ওপর।

হালখাতা

বাজারে জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার প্রায় বাইরে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

মোজাফফর আহমদ

প্রথমেই একটি কথা বলে নিতে হয় যে, আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারত এমন কোনো রাজনীতি গত ত্রিশ বছরে আসেনি। জিনিসপত্রের দাম তো সেই রাজনীতিরই ফল। তাছাড়া এই জরুরী ব্যবস্থায় কিছু কিছু মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে না। সব মিলিয়ে জিনিসপত্রের দাম অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এটা বেশিদিন চলতে দিলে মানুষ চরম

দুর্ভোগের শিকার হবে। আমি মনে করি যে কোনো মূল্যে এটাকে প্রতিহত করা দরকার। তা না হলে এজন্য সবাইকে চরম মূল্য দিতে হবে ।

হালখাতা

আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন, রাষ্ট্র ও সরকার তো আলাদা বিষয়, সেখানে সরকারে থেকে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতি করলেন, তাদের দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সরকারের দুর্নীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মনস্তত্ত্ব কীভাবে কাজ করে?

মোজাফফর আহমদ

বিদেশনির্ভর রাষ্ট্রকে দুর্নীতি না করে উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ নিজের দেশকে অতটা আপন ভাবতে পারেন না। কাজেই দুর্নীতি কমানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মনস্তত্ত্ব তখনই পরিবর্তিত হবে, যখন সকল দিক থেকে আমাদের বিদেশ নির্ভরতা কমানো যাবে। সেটা করতে গেলে সবার আগে দরকার দেশপ্রেম। দেশপ্রেমই দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে পারে।

হালখাতা

হালখাতাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোজাফফর আহমদ

তোমাকেও ধন্যবাদ।

[হালখাতা'র পক্ষে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গ্রন্থনা: শরমিন নিশাত।]

বিষয় দুর্নীতি

আ ব দু ল্লা হ আ বু সা য়ী দ

[আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন ত্রিশ বছর। ষাটের দশকে সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনাকাল থেকে বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় সফল ব্যক্তিত্ব। এইসব ব্যস্ততার মধ্যেও কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, জার্নাল, জীবনীমূলক বই ইত্যাদি লিখছেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ত্রিশ। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। এছাড়া সায়ীদের নেতৃত্বে প্রাণ পেয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন।]

হালখাতা

আজ ৩০ আগস্ট ২০০৭ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষথেকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মুখোমুখি হয়েছি একটি বিষয়কে বুঝবার জন্য। বিষয়টি হল 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব'। আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে দুর্নীতির ওপর যেসব লেখা পড়ি, শুনি এবং দেখি তার গভীরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে যায়। যেমন দুর্নীতি কী? সুনীতিটাই বা কী? আমরা যেসব বিষয়কে দুর্নীতি বলি– তা কতখানি দুর্নীতি ইত্যাদি। জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন, বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে, তাতে দুর্নীতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু আপনার মতে দুর্নীতি বিষয়টা কী? চুরি ও ডাকাতির সঙ্গে দুর্নীতির পার্থক্যটাই বা কী?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

চুরি, ডাকাতি এগুলো মানুষ করে রাষ্ট্রক্ষমতার পুরোপুরি বাইরে থেকে; সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে এবং সম্পূর্ণভাবে ন্যায়-নীতি বা আইনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু দুর্নীতি হয় রাষ্ট্রের আইন নিয়মকে নিয়মের মধ্যে-রেখে। ঐ নিয়মকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার

করে। কিংবা ঐ নিয়মগুলোর মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে এই দুর্নীতিগুলো করা হয়। সুতরাং যে দুর্নীতির কথা সম্ভবত এখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি এবং রাষ্ট্র যেহেতু আমাদের জীবনের সবখানে জড়িয়ে আছে সুতরাং দুর্নীতির বাইরে আমরা কেউ থাকতে পারছি না। যে দুর্নীতি করছে সেও না। যে দুর্নীতিপরায়ণকে অর্থ প্রদান করছে সেও না। এবং দুর্নীতি শুধুমাত্র যে রাষ্ট্র-যন্ত্রের লোকেরা করছে তা নয়, যারা সুযোগ নিতে চাচ্ছে অবৈধভাবে তাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। যেমন ধরা যাক, একজন একটা দালান করছে কাগজের পাশকরা আইনের মাধ্যমে এবং সে দালানের যিনি মালিক সে পাশকরা প্ল্যানকে লঙ্ঘন করতে পারে। এখন রাজউকের যিনি ইনস্প্যাক্টর তিনি ঐ লঙ্ঘনকে দেখিয়ে দিয়ে সে ব্যক্তিকে শাস্তি স্বরূপ বড় ধরনের জরিমানার ভয় দেখালেন। তখন তাকে সেই জরিমানার একটা ছোট্ট অংশ ঘুষ হিসেবে দিয়ে সেই বাড়ির কর্তা বেঁচে গেলেন। এখানে দুটো অপরাধ হল– একটা অপরাধ হচ্ছে, যিনি রাষ্ট্র-যন্ত্রের পক্ষথেকে কাজ করছেন তিনি তার ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেন না। অর্থের বিনিময়ে তিনি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেন। আর যিনি ঘুষ দিলেন তিনিও সুবিধা নিলেন। সুতরাং ঘুষদাতা তিনিও একইভাবে অপরাধী অর্থাৎ তিনিও দুর্নীতিপরায়ণ। কাজেই দুর্নীতির সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থার যে আইন সেটা এবং জনস্বার্থের একটা যোগসূত্র রয়েছে। ধরা যাক র‍্যাংগস ভবনের কথা। র‍্যাংগস ভবন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগের কারণে ভবনটা ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। কারণ মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সেজন্য তিনি অবশ্যই শাস্তি পাবেন। কারণ তিনি সুবিধা নিয়েছেন। এবং রাষ্ট্রের আইনকে উপেক্ষা করে বা ব্যবহার করে তিনি এই অবৈধ কাজটি করেছেন, একইসঙ্গে তাদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত যারা এটা দেখেও উপেক্ষা করছে। এবং আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে তারা কোনো না কোনোভাবে সুবিধা নিয়েছে র‍্যাংগসের মালিকের কাছ থেকে। সুতরাং জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র যে আইন করে সেটাকে লঙ্ঘন করে দুর্নীতি হয়। এবং সেটা দু'দিক থেকেই হয়– রাষ্ট্রের রক্ষকের পক্ষথেকে এবং জনসাধারণের পক্ষথেকে। তো এটাও চুরি,– এটাও ডাকাতি। এটা রাষ্ট্রের আইনের ফাঁক দিয়ে অথবা রাষ্ট্রের আইনকে লঙ্ঘন করে হয়।

হালখাতা

তাহলে রাষ্ট্রের যে নীতি আছে– তাকে কি আমরা আর নীতি বলতে পারি?

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

না রাষ্ট্রের নীতি প্রতিফলিত হয় তো তার আইনের দ্বারা। সুতরাং আইনকে আইন বলতে পারি কিনা? আমি মনে করি আইন তো আইনই। রাষ্ট্র ঠিক আছে আইনও ঠিক আছে। এখানে যে জায়গাটাতে শূন্যতা সে জায়গাটা হলো, রাষ্ট্রের আইনের এই যে লঙ্ঘন অর্থাৎ আইনকে প্রয়োগের যে একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় রাষ্ট্রের সেই

ব্যবস্থাটা আমরা এখনো গড়ে তুলতে পারিনি। আইন তো এমন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিংবা সাময়িক উদ্দীপনার কারণে যে কোনো একটা আইন করে নিতে পারে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ এতো সোজা নয়। বাংলাদেশের মতো ১৪ কোটি লোকের দেশে, ছোট্ট একটা আইন হলেও, সেই আইনকে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন বিপুল সম্পদ। তো সেই মানুষের মধ্যে আইনের প্রয়োগ রাখার মতো সম্পদ আমাদের রাষ্ট্রের নেই। আর দু'নম্বর হচ্ছে যে, যতটুকু আমাদের সম্পদ আছে তার পূর্ণ ব্যবহার করার মতো ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রের নেই। কারণ আমাদের যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে কোনো দিন আমরা নিজেদের রাষ্ট্র নিজেরা শাসন করিনি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, আমাদের সবসময় শাসন করেছে অন্যেরা। তার ফলে রাষ্ট্র কী এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নেই। আমরা রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাহীন একটা জাতি। রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য একটা নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা প্রয়োজন এটা আমাদের জানা নেই। আমরা আইন করে দেওয়া পর্যন্ত আছি কিন্তু আইনটা যে পালন করতে রাষ্ট্রের অপরাধীকে বাধ্য করতে হবে, বাধ্য করার জন্য যে ম্যাকানিজম গড়ে তুলতে হবে সেটা আমাদের জানা নেই। যদি জানা থাকত তাহলে আমার মনে হয় এই সীমিত সম্পদের মাধ্যমেও সেটাকে মোকাবেলা করা সম্ভব হত। কিন্তু সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আমাদের গড়ে ওঠেনি। সে জালটা গড়ে ওঠেনি। যার ফলে যে কেউ দুর্নীতি করে বুক ফুলিয়ে সবার সামনে থেকে বেড়িয়ে যেতে পারছে। আমাদের আইনগুলো যদি কর্মের হত তাহলে মানুষ কিন্তু দুর্নীতি করতে পারত না। যেমন আজ কিন্তু পারছে না, একই মানুষ, একই আইনব্যবস্থা কিন্তু পারছে না। এটা সদিচ্ছার কারণে পারছে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দুর্নীতি কমিয়ে ফেলতে বা দুর্নীতি বিরোধী হতে সদিচ্ছাপ্রবণ হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র-ক্ষমতার শীর্ষে যদি এমন সব ব্যক্তিরা থাকেন যারা জনস্বার্থের প্রকৃত রক্ষক এবং কঠোর নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ এবং সেই সঙ্গে তারা যদি রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে, আইনগুলোকে সঠিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে দুর্নীতিকে রোধ করা সম্ভব।

হালখাতা

চলমান দুর্নীতি নিয়ে অনেক সময় আমরা যখন বাইরে কথা বলি তখন অনেক বিজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও বলতে শুনেছি যে, আমরা দুর্নীতির সন্তান। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

এ কথা ঠিক নয়।

হালখাতা

মানুষ যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে প্রকৃতি অনুসারে মানুষ কি স্বভাবগতভাবে দুর্নীতিপ্রবণ?

আবদুলহ্লি আবু সায়ীদ

মানুষ স্বভাবগতভাবে দুর্নীতিপ্রবণ কিনা সেটা না বলে বলা যায় মানুষের মধ্যে দুর্নীতির একটা জন্মগত প্রবণতা আছে।

হালখাতা

আছে?

আবদুলহ্লি আবু সায়ীদ

আছে। মানুষের মধ্যে শয়তান আছে। শেষপর্যন্ত আমিও এক জায়গায় লিখেছি, আল্ল-াহও নিশ্চয়ই কিছুটা পাপ ভালোবাসেন, না হলে শয়তান তৈরি করলেন কেন? অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অপরাধের একটা বিরাট অংশ আছে। সে অংশ এমনই শক্তিশালী, মাঝে মাঝে মানুষের ভেতরকার সকল শুভত্বকেও সেটা ধ্বংস করে ফেলতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকতে পারে না। কারণ দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত ভালোটাই জয়ী হয়। অপরাধের সঙ্গে ব্যক্তি জড়িত কিন্তু ভালোর সঙ্গে জড়িত সমস্ত সমাজ। সুতরাং অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সামনে শেষ পর্যন্ত সে ভেঙ্গে পড়ে। তা যদি না হত তাহলে অপরাধী জিতে যেত। অপরাধী মানুষ কখনো প্রচণ্ডরকম শক্তিশালী হয়, লোভ মানুষের মধ্যে এই শক্তি জাগিয়ে দেয়। এবং তাদের উন্মাদনা কখনো এমন ভয়াবহ হতে পারে যে, তার সামানে দাঁড়ানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে জনস্বার্থ তার চাইতেও অনেক বড় বিষয়। সমষ্টিগত মানুষের চাওয়া এবং তাদের বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ আরও ভয়াবহ। অপরাধীরা তাই জনস্বার্থকে ভয় পায়। এরা শেষ পর্যন্ত কাগুজে বাঘ। সেজন্য নৈতিকভাবে এরা শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে না। প্লেটোর রিপাবলিকের এক জায়গায় থেলোমেকাস, যিনি একজন সোফিষ্ট তিনি সক্রেটিসের সঙ্গে বিতর্কে নেমে বলেছেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে শক্তিমানের শান্তি। এবং আমরা সত্যিকারে তো তাই দেখি। রাষ্ট্রের আইন করছে শক্তিমানেরা, তাদের স্বার্থে আইনগুলো তারা গড়ে তুলেছে। এখনও পৃথিবীতে শক্তিমানেরা একটা বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে।

হালখাতা

এ জন্যই কি দেখা যায় যে দুর্নীতির প্রতি একটা সাপোর্ট থেকেই যাচ্ছে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

হ্যাঁ দুর্নীতির প্রতি সাপোর্ট থাকবেই। ইংল্যান্ডে একসময় একটা আইন ছিল যে চুরি করলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। কিন্তু খুন করলে তিন মাসের জেল হবে। কেন এই আইন হতে পারল! এটা হতে পারল এজন্য যে চুরি করে কারা? গরীবেরা। সুতরাং তার শাস্তি তো হতেই হবে, নাহলে বড়লোকেরা শান্তিতে থাকবে কিভাবে? আর খুন করছে কারা? যারা বড়লোক। সুতরাং তাদের তিন মাসের বেশি জেল দিলে হবে কী করে! সুতরাং এটা বোঝাই যাচ্ছে, এই যে আইনটা হয়েছিল সে আইনটা সম্পূর্ণভাবে শক্তিমানের স্বার্থের জন্যই হয়েছিল এবং থেলোমেকাস যখন একথা বলেন তখন ওনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ এটা দেখা যায় যে যুগে যুগে রাষ্ট্রের শক্তিমানেরাই তাদের স্বার্থে আইনগুলো প্রণয়ন করে নিজেদের আরও শক্তিশালী করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সক্রেটিস। দাঁড়িয়ে বললেন, না রাষ্ট্র শক্তিমানের স্বার্থে নয় কারণ শক্তিমানের স্বার্থে হলে রাষ্ট্রের কোনো দরকার ছিলনা। শক্তিমান নিজেই শক্তিশালী। সে নিজেকে রক্ষা করছে, নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করছে, সবকিছুই সে করছে। রাষ্ট্র আসলে দুর্বলের স্বার্থে। বিশাল দুর্বল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। আমরা ঘরে ঘরে ঘুমাতে পারব না সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র তৈরি হয়নি। তাহলে তো একটা চোরই আমাদের ওপর জয়ী হয়ে যায়। একটা চোরকে দমন করার জন্য আমাদের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সুখের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন হয়। তো এই 'শক্তিমান' শব্দটার মানেই হচ্ছে শক্তিমান এবং লোভ; যে বা যারা রাষ্ট্রের সমস্ত কিছুকে নিজের মনে করে নিয়ে যেতে চায়। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই প্রবণতাটা আছে। আজকে যদি কোনো আইন না থাকত, রাস্তা-ঘাটে পুলিশ, চৌকিদার, দফাদার কেউ নাই; কোনো পাহারাদার নাই, আর্মি নাই– ধরা যাক সব মুছে গেছে, তখন কী হবে? কোনো দোকান থাকবে, কোনো বাড়ি কি থাকবে? সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে না? তো এটার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা রাষ্ট্র তৈরি করেছি; এবং অধিকাংশ মানুষের সুখকে নিশ্চিত করার জন্য একটা চেষ্টা করেছি। এখানে অধিকাংশ মানুষ মানেই দুর্বল মানুষের জন্য। দেখা যায় এই দুর্বলের দলেরও নেতা থাকে। যেমন অপরাধীদের নেতা থাকে তেমনি দুর্বলেরও নেতা থাকে। এবং দেখা যায় দুর্বলদের নেতার সাথে অপরাধীদের নেতা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। এই কারণে যে দুর্বলদের নেতার পেছনে সমস্ত জনগণ থাকে। সেই জন্য কথিত শক্তিমানেরা পারে না। ধরা যাক একটা কোম্পানিতে চুরি হচ্ছে। চুরিটা হচ্ছে রাত্রিবেলায় আর এতে অংশ নিচ্ছে চৌকিদার এবং বাইরের একটা লোক। দু'জনে মিলে যুক্তি করে চুরি করছে। তখন যদি শুধু একটা 'হৈ' করা যায়, দেখা যাবে যে দু'জন দু'দিক দিয়ে দৌড় দিচ্ছে। কারণ কী? কারণ তার নৈতিকতা দুর্বল। নৈতিকতা দুর্বল মানে সে জানে এই মুহূর্তে যদি সে দৌড় না দেয়, জনসমাজ যদি চলে আসে তাহলে তাদের পিটিয়ে শেষ করে দেবে। মেরে ফেলবে। যেটা আমাদের রাস্তা-ঘাটে সবসময় হচ্ছে। এই জনসমাজই হচ্ছে

রাষ্ট্র। এই জনসমাজের যে সংগঠন তার নাম হচ্ছে রাষ্ট্র। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুকে পাওয়ার প্রবণতা জন্মগতভাবে আছে। যযাতির একটা গল্প আছে। যযাতির শ্বশুর যযাতিকে কোন কারণে অভিশাপ দিলেন যে তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যযাতির যৌবন চলে গেল এবং যযাতি বৃদ্ধ হয়ে গেল। তখন যযাতির স্ত্রী, স্বামীর এ অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণ পিতাকে বলল বাবা তুমি আমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়েছ, সেজন্য আমার স্বামী জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। যেহেতু তুমিই আমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়েছ তুমিই সে অভিশাপ ফিরিয়ে নাও। যাতে আমার স্বামী তার পূর্ণ যৌবনে ফিরে আসতে পারে। তুমি অন্তত আমার দিকে তাকিয়ে এ অভিশাপ ফিরিয়ে নাও!

তখন বাৎসল্য পিতা বললেন, ঠিক আছে আমি আমার অভিশাপ ফিরিয়ে নিচ্ছি তবে পূর্ণাঙ্গভাবে ফিরিয়ে নেব না। কেউ যদি তার যৌবন দিয়ে তার বার্ধক্যকে নিতে চায় তাহলে সে তা পাবে। তাহলে সে তার যৌবন পেয়ে যাবে আর জরা যে নিল তার কাছে বার্ধক্য চলে যাবে। এখন দুনিয়াতে এই জরা কে নেবে? তার চার ছেলেকে বলা হল। বড় ছেলে বলল যে আমার নিজের জীবন তো নিজেরই। আমার জীবনের জন্যই তো আমি জন্মেছি। আমি তো এটা করতে পারি না। মেজ ছেলেও তাই বলল। তার পরের জনও একই জবাব দিল। শেষে ছোট ছেলে রাজি হল। পিতা সত্য, পিতা ধর্ম, পিতা হে পরমতম পিতা ...। ছোট ছেলে মনে করল পিতার জরা যদি নিতে পারি তাহলে সমস্ত দেবতার আশির্বাদ পাব। তখন ছোট ছেলে পিতার জরা নিয়ে নিল এবং পিতা ছোট ছেলের যৌবন পেল। দীর্ঘদিন বাবা সুখে দিন যাপন করলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে এসে একটা কথা বললেন, 'এই পৃথিবীর সমস্ত নারী, সমস্ত জরা, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত হিরন্ময় একজন পুরুষের বাসনা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটা মানুষের মধ্য থেকে আমরা সেই মানুষটার শুধু সাড়ে তিন হাত অবয়বই দেখতে পাই, কিন্তু সেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীকে ভোগ করার, অধিকার করার এবং দখল করে নেয়ার একটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানসিকতা আছে। রাষ্ট্র গঠন করে আমরা প্রত্যেকটা মানুষের সেই লোভকে দমন করতে পারিনি। সেটা ধর্ম করেছে কিছু, শিক্ষা করেছে কিছু, সমাজ করেছে কিছু, ন্যায়নীতি করেছে কিছু। আরেক দিকে চৌকিদার, দফাদার, পুলিশ, আর্মি, জেল, বিচারালয়, শাস্তি, আদালত, ফাঁসি– কতকিছু দুইদিক থেকে চেপে ধরে সে মানুষের মধ্যকার ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী মানুষকে দলিত করে আমরা তো রাখতে পেরেছি। কিন্তু সুযোগ পেলেই সে বেরিয়ে আসে। যেমন– আমাদের রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা পর্যন্ত স্বাধীন নয়; আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে ক্ষমতাশীল; তিনি একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান, নির্বাহী প্রধান, বিচার প্রধান। তো এত শক্তি যদি তার হাতে থাকে তাহলে তার ভেতরকার সেই যে আদিম, যখন একটা রাষ্ট্রের দুর্নীতিকে ধরার ব্যবস্থা তৈরি হয়নি এরকম একটা অবস্থা– সেই সরীসৃপরূপের জন্তুটা তো বেরিয়ে

আসবেই। এবং সমস্তকে সে খেয়ে ফেলতে চাইবে। সুতরাং যেটা করতে হবে সেটা হল একটা রাষ্ট্রকাঠামোতে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগ গড়তে হবে, ইলেকশনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। যেমন আমার কাছে আজকে যদি কেউ ঘুষ চায় বা আমি সরকারের কাছে কোনো কাজের জন্য গেলে আমাকে হয়রানি করে, আমাকে যদি কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে তাহলে আমি কার কাছে যেয়ে নালিশ করব? এই জায়গাটা তৈরি করতে হবে। সেই জন্য প্রতিটা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটা করে 'অম্বুড্স্ম্যান' থাকতে হবে। যা প্রতিটা উন্নত দেশে আছে। আমি ইংল্যান্ডে ক'দিন আগে গিয়েছিলাম, সেখানেও দেখলাম প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন করে 'অম্বুড্স্ম্যান' আছেন। তিনি একজন সার্বভৌম ব্যাক্তি, কারো কাছে তার দায়বদ্ধতা নেই এবং ঐ মন্ত্রণালয়ে যারা আসবে তাদের ওপর কোনো রকম অন্যায় হলে তার অম্বুড্স্ম্যানের কাছে গিয়ে সাথে সাথে নালিশ করতে পারবে। ঐ 'অম্বুড্স্ম্যান' সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাবেন তা তিনি খতিয়ে দেখবেন। এবং দোষী ব্যক্তিকে তিনি শাস্তি দিতে পারবেন। তো এগুলো করতে হবে। এগুলো আস্তে আস্তে করলে আমরা আশা করতে পারি, একটা সার্স লাইট পড়বে; তুমি দুর্নীতি করছ, তুমি দুর্নীতি করছ আর এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না এটা তো হতে পারে না। আগে তো অন্তত সমাজ তাদের পরিত্যাগ করত, ঘৃণা করত। পাঁচ জন দুর্নীতিবাজ থাকলে, পঁচানব্বই জন ভালো লোক থাকত। সমাজের ঘৃণার কাছে তারা চুপ করে যেত। কিন্তু আজকে তাকে চিহ্নিত করার মানুষ নাই। শাস্তি দেয়ার মানুষ নাই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে জাল গড়ে তুলতে হয় সে জালটা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। তার ফলে আজকে আমরা এই ভয়ঙ্কর দিনের সামনে পড়েছি। তো এখন আস্তে আস্তে জাল তৈরি হচ্ছে। এই যে ধরা পড়ছে। যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন একটা জাল, তাতে বহু কিছু ধরা পড়বে। এন.বি.আর তেমনি একটা জাল। টাকা আছে তোমার তো ঠিক আছে। কিন্তু এ টাকা কোথায় পেয়েছ? সোর্স বল। না দেখাতে পারলেই তো জালে ধরা পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে সে শাস্তি পাবে। তোমার টাকা যে আছে তুমি কি ট্যাক্স দিয়েছ। দাওনি। তাহলে শাস্তি র এই যে আইনগুলো– এগুলোকে যদি সব ধরনের স্বাধীনতা দেয়া হয়, আইনগুলোকে যদি কার্যকর করা হয়, আমাদের দেশে দুর্নীতি কমে যাবে। আমরা দুর্নীতির সন্তান নই। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। এবং অসংখ্য সম্ভাবনা পেয়েছি। অনেক দুঃখ, দুর্দশা, সমস্যা আকীর্ণ বহু মানুষের একটা ছোট্ট রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি। আমরা বিহ্বল, আমরা দিশাহারা, আমরা এখন পর্যন্ত এই নিয়মগুলো তৈরি করতে পারিনি। এখন আশা করছি যে নিয়মগুলো তৈরি হচ্ছে। এবং আমার ধারণা যে নিজেদের অভিশাপ দিয়ে তো লাভ নেই। কী করে আমি এর হাত থেকে বেরুতে পারব সে পথগুলো খুঁজে বের করাই হচ্ছে একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কাজ। কপাল কুঁচকানো, বুক চাপড়ানো, জন্মই আমার আজন্ম পাপ– এসব কথা বলতে চাই না।

হালখাতা

যে সব দেশে দুর্নীতি তুলনামূলকভাবে কম; সে সব দেশের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যটা আসলে কোথায়?

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

একটা বড় পার্থক্য আছে, সে হল স্বাস্থ্য অর্থাৎ বাংলাদেশের ৯০% মানুষের ফিজিক্যাল ফিটনেস নাই। সুতরাং কোনো কিছুর ফল পেতে হলে যে শ্রম দিতে হয় সে শ্রম জন্মগতভাবেই সে দিতে পারে না। মানে স্বাভাবিকভাবেই সে করতে পারে না। একটা ফল পেতে হলে, তো আমাদের শ্রম দিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই একটা ফল চাচ্ছে। কিন্তু ফলের জন্য যে শ্রম দেয়া প্রয়োজন, যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, স্বাস্থ্য, শক্তি দরকার সেটা আমাদের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই নাই। এসব কারণে আমরা দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য সহজ পথ খুঁজি। তো আমি একটা ফল চাচ্ছি; তো ফলটা পেতে হলে আমাকে চেষ্টা, কষ্ট, শ্রম, সংগ্রাম করতে হবে তারপরে ফল। আমরা ফলটা চাচ্ছি কিন্তু মাঝখানের পথটা পাড়ি দিতে চাচ্ছি না। আমরা সহজেই ঐ ফলটা নিয়ে নিতে চাচ্ছি। হয় আমরা চুরি করতে চাচ্ছি, নয় আমরা ডাকাতি করতে চাচ্ছি। না হলে ঐ ফল পাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। তো অন্য জাতির মানুষের মধ্যে যাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য শক্তি, স্বাস্থ্যের আনন্দ-উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে তাদের মধ্যে এই দরকারটা অনেক কম; তবু সেখানেও আছে, সেখানেও এ ধরনের মানুষ রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এখানে এই মানুষের সংখ্যা ৯০ ভাগ। আমি তো প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে, একটা দুর্নীতি পরায়ণ মানুষ দেখতে পাই । সুযোগ পেলেই তারা তো দুর্নীতি করবে। তো এটা একটা সামাজিক ব্যাধি, স্বাস্থ্যের কারণে এটা একটা মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। স্বাস্থ্যের কারণে উদ্ভূত একটা মানসিক রোগের এতবড় একটা দানবকে ঠেকানো খুব কঠিন। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই দুর্নীতির সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা জড়িত। আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ১২ লক্ষ মানুষ জড়িত। ১৪ কোটি মানুষকে ঠিক করা কঠিন। কিন্তু এই ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে যদি ১২ কোটিও খারাপ হয় তাদের ঠিক করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি ১২ লক্ষ মানুষকে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি এবং তাদের কাঁধ থেকে দুর্নীতির উৎসাহ বা চেষ্টা বা দুর্নীতি প্রসারিত করার যে আগ্রহ সেটা যদি কমিয়ে আনতে পারি অর্থাৎ তখন দুর্নীতি যদি লাভজনক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি করার ভেতরের যে ইচ্ছাটা সেটা কমিয়ে আনা যাবে।

হালখাতা

তাহলে মানুষ মনস্তাত্ত্বিকভাবে আর ইনস্‌পায়ারড হবে না।

আবদুলাহ্ আবু সায়ীদ
হ্যাঁ ঠিক তাই। দুর্নীতি এত বেড়েছে তার কারণ দুর্নীতি লাভজনক। দাসপ্রথা পৃথিবীতে একরকম বেড়েছিল বিপুলভাবে। কারণ দাসপ্রথা তখন ছিল লাভজনক। কিন্তু পরে দাসেরা যখন বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করল, পরে যখন যন্ত্র এসে দাসদের প্রয়োজন কমিয়ে দিতে শুরু করল তখন দেখা গেল যে দাসকে রাখা অলাভজনক। একটা দাসকে রেখে যে লাভ হচ্ছে তারচেয়ে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বেশি। তখন দাসপ্রথাটা উঠে গিয়েছিল। তো আজকে যদি আমরা আমাদের আইনকানুন আইনের প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে গঠন করে তুলতে পারি, যদি এমন একটা অবস্থার তৈরি করতে পারি যে দুর্নীতি লাভজনক না হয়ে অলাভজনক, একটা ক্ষতিকর ব্যাপার হয়ে দেখা দিল, তখন দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে। অর্থাৎ এই ১২ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে সমগ্র জাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের খুব একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে।

হালখাতা
মানুষ কেবল অভাব থেকেই দুর্নীতি করে না; দেখা গেছে যার অভাব নেই সে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিন্তু যার অভাব আছে সে হয়ত দুর্নীতি করছে না। আপনার কাছে জিজ্ঞাসা হল এমনটি হওয়ার পিছনে কারণ কী?

আবদুলাহ্ আবু সায়ীদ
কারণ হচ্ছে গরীব আর ভিক্ষুক তো এক না, একটা মানুষ গরীব হতে পারে কিন্তু তার ভিক্ষার জন্য হাত পাততে লজ্জা হতে পারে। অর্থাৎ যদি গরীবও মর্যাদাবান হয় তাহলে তাকে আমরা ভিক্ষুক বলব না, ভিক্ষুক সেই ব্যক্তি যার কিছু চেয়ে নিতে লজ্জা নেই। যার আত্মমর্যাদার অভাব আছে। সে গরীবও হতে পারে, ধনীও হতে পারে। আমার ধারণা আজকে আমাদের দেশে গরীবদের চাইতে ধনীরা অনেক বেশি ভিক্ষুক। এই ধনীরা শুধু ভিক্ষা করছে না, ভিক্ষার পাশাপাশি লুণ্ঠনও করছে। তাদের মধ্যে যে ভিক্ষুক রয়েছে তার পরিমাণও অনেক। কোনো মানুষের মধ্যে অভাব থাকতে পারে, দুঃখ থাকতে পারে, অনেক কিছুই থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে যদি মর্যাদাবোধ থাকে তাহলে সে দুর্নীতি কম করবে। হয়ত করবেই না। অনেক গরীব মানুষ আছে যাকে দিয়ে কিছুতেই দুর্নীতি করানো যায় না।

হালখাতা
ঐ সব ধনীলোকেরা কি স্বভাবগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ?

আবদুলাহ্ আবু সায়ীদ

হ্যাঁ তারা স্বভাবগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ, আত্মমর্যাদাহীন। এরা দুর্নীতিপরায়ণ এরা আত্মমর্যাদাহীন ভিক্ষুক বলে।

হালখাতা

আপনি তো দীর্ঘকাল শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষকশ্রেণী একসময় সমাজের আদর্শের এবং সম্মানের জায়গায় ছিলেন। সে ক্ষেত্রে আপনিও একমত হবেন যে, আর্থিক দুর্নীতি ছাড়াও শিক্ষকের মধ্যে যে আদর্শের চ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, এর পেছনে তাদের মনস্তাত্ত্বিক কারণটা কী?

আবদুলাহ্ আবু সায়ীদ

মনস্তাত্ত্বিক কারণ মানে আমি সামাজিক কারণ বলতে পারব, মনস্তাত্ত্বিক কারণ ততটা বলতে পারব না। তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের ছোট বেলায় যে শিক্ষকদের দেখেছি– সে শিক্ষকদের মধ্যে দুঃখ দারিদ্র্য ছিল। কিন্তু আমাদের সময়কার শিক্ষদের মধ্যে এক বড় ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন যে তারা পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ কাজে নিয়োজিত। তবে কী পেলাম আর কী পেলাম না এই নিয়ে দুঃখ করে তারা জীবনকে নষ্ট করেননি। তারা জানতেন ভারত স্বাধীন হবে। ছোটবেলায় দেখেছি তারা ভাবতেন এই জাতিকে বড় করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অনেক মানুষ চাই, শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাশীল উন্নত মানুষ চাই। এদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই মানুষ দিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে জ্ঞানীশক্তির যুদ্ধ করতে হবে। এটা শিক্ষকরা ভাবতেন। শুধু শারীরিক শক্তি দিয়ে ওদের পরাজিত করলে হবে না। সুতরাং আমাদের একটা জ্ঞানী জাতি চাই। একটা উচ্চশিক্ষিত জাতি চাই। সেই জন্য তারা জীবনকে উৎসর্গ করতেন। কেউ যদি আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় সে একটা আনন্দলোকে বাস করে, তখন তার টাকা পয়সা এমনকি জীবনই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। কিন্তু এখন সেই আদর্শের পতন ঘটেছে। আমাদের সমাজে সেই আদর্শ এখন নেই। ইতোমধ্যে এসেছে সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদ যেখানে সবকিছু প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়েছে। কে কার উপরে, কে কার সামনে এই সব। যেমন আমি একজন শিক্ষক, সুখে শান্তিতেই ছিলাম কিন্তু আমার পাশের বাড়িতে একজন কন্ট্রাকটার থাকেন, তার অনেক টাকা-পয়সা। আমার স্ত্রীর তো কোনো গহনা নেই কিন্তু তার স্ত্রীর হাতের আঙ্গুল থেকে বাহু পর্যন্ত গহনায় ভরা। তো সে একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে এল, আপা কেমন আছেন? 'আফা'। সে আবার আপা বলতে পারে না বলে 'আফা'। তো আপা বলে,ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন? তো আপা যখন বলল; আপনি কেমন আছেন? তো সে যখন এসেছিল তখন তার গহনা পরা হাতটা একটু আড়াল করে এসেছিল। এখন সে হাতটা সমানে নিয়ে বলছে, 'এই আছি আর কি'। তো এরপর কি আমার স্ত্রী আর স্ত্রী থাকে? আর আমিই কি আমি থাকি।

শিক্ষক কি আর শিক্ষক থাকে? এই যে আমাদের পাশে আমাদের চাইতে ভিন্ন মানুষেরা এসে এটা আমাদের বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছে। এটা যে শুধু শিক্ষকদের দলের ভেতর তা না, সব দলের ভেতর। তবে শিক্ষকদের দলের ভেতর এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ জন্যে যে শিক্ষকদের ওপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এই যে শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, শিক্ষক এদের যত বড় করবেন এরা তত বড় হবে। আর যদি গড়তে না পারেন তাহলে তারা তত ছোট হবে। কাজেই এই শিক্ষকদের ওপর একটা বিশাল দায়িত্ব। সেই শিক্ষক যদি হীনমন্যতায় ভোগেন, যদি ভাবেন ঐ কন্ট্রাকটরের টাকা আছে, তাহলে আমার থাকবে না কেন! আদর্শ না থাকলে তার ভেতর এই চিন্তা কাজ করবে। এর ফলে তার আদর্শচ্যুতি খুব সহজেই হতে পারে এবং হচ্ছেও। সবাই বাড়তি আয়ের সুবিধা পাচ্ছে, শিক্ষক কেন পাবে না। শিক্ষক তাই কোচিং সেন্টার দিচ্ছে, শিক্ষক প্রাইভেট পড়াচ্ছে, শিক্ষকদের বাড়ির সামনে গাড়ির বিরাট লাইন। প্রত্যেকটা শিক্ষকের বাড়ি গাড়ি এবং একটা করে দোকান আছে। বড় বড় শিক্ষকের বাড়ি যেন একটা সুপার মার্কেট। তাদের বাড়ির সামনে এত গাড়ি দাঁড়ায় যে একটা সুপার মার্কেটের সামনেও এত গাড়ি দাঁড়ায় না। সুতরাং দেখতে হবে যে শিক্ষক কী করে পরিণত হয়েছে। এই সামাজিক দুর্নীতির বল্গাহীন বিকাশ, অবৈধতার কাছে ভেঙ্গে গেছে আজকের শিক্ষক ও তার আত্মমর্যাদাবোধ।

হালখাতা

আপনি বলে থাকেন, একটি রাষ্ট্র যখন তৈরি হতে থাকে তখন রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের লুটপাট তথা দুর্নীতি চলতে থাকে। এবং এটাই স্বাভাবিক। আপনার অন্য আরেকটি লেখায় লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র হয়ে উঠছে'। আমার প্রশ্ন হল আপনার কথা অনুসারে বাংলাদেশ যে রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠছে এবং এই গড়ে ওঠার প্রাক্কালে বাংলাদেশের যে দুর্নীতি, এই দুর্নীতিকে কি আপনি স্বাভাবিক বলে মনে করেন?

আবদুলহক আবু সায়ীদ

হ্যাঁ। আমার তো দুটো কথাই ফলেছে। আমি একটা কথা বলেছি, রাষ্ট্র যখন শুরু হয় তখন একটা দুর্নীতির যুগ থাকতে পারে। থাকতে পারে এজন্য যে, রাষ্ট্র এখনও গড়ে ওঠে নাই। আর এই যে আমরা একটা নতুন পদক্ষেপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখলাম এটা আমরা কেউ ভাবিনি। সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ এই চলমান রাজনীতি তার একটা পরিসমাপ্তি চাচ্ছে। এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটা নতুন রাজনীতি চাচ্ছে। না হয় তো এই রাজনীতির ওপর কার সাপোর্ট আছে? এই সরকার তো থাকতে পারত না। তো সেটা শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের এ প্রক্রিয়া তো শুরু হল দেশে। তার আগের সময়টা ছিল লুণ্ঠনের সময়। সে অবস্থায় কেউ থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। প্রত্যেকেই দুঃখ করেছে, প্রত্যেকে টিভিতে কথা বলেছে, বিরাট বিরাট জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু কেউ তা রোধ করতে পারেনি। কারণ সেটাই ছিল বাস্তবতা। একটা প্রথম যুগ, একটা

প্রথম সুযোগের মধ্যে আমরা এসেছি। আমাদের সামনে অফুরন্ত সম্পদ। আমাদের বাধা দেয়ার কেউ নেই। কোনো আইন নেই, কোনো নিয়ম নেই। তো সেই সময় লুণ্ঠন হবে না তো কখন হবে? লুণ্ঠনের মধ্যদিয়ে ক্যাপিটাল হয়েছে। আমাদের জাতির প্রথম ক্যাপিটাল। আমরা পছন্দ করি বা না করি। যদি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়ে যায় তাহলে এই ক্যাপিটাল সঠিক পথে প্রবাহিত হয়ে সেই ক্যাপিটাল আরো অনেক বড় হবে।

হালখাতা

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় অমিত লাবণ্যকে বিবেচনা করেছে দীঘি হিসেবে যেখানে অবাধে সাঁতার কাটা যায় পক্ষান্তরে একইসঙ্গে কেতকীকে অমিত বিবেচনা করেছে ঘড়ায় তোলা জল হিসেবে। এখানে একাধিক নারীর প্রতি একক পুরুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে, বিষয়টিকে নারীর প্রতি পুরুষের শোষণমূলক বা অনৈতিক আচরণ হিসেবে দেখার সুযোগ থেকে যায়, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার নিরিখে সেটা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আবদুলহ্লি আবু সায়ীদ

এখানে অমিতের যে দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে লাবণ্যের তো একই দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। লাবণ্যও তো অমিতকে দীঘি আর শোভনলালকে ঘড়ায় তোলা জল হিসেবে দেখেছে। তা না হলে বিয়েও করল আবার প্রেমিকও থেকে গেল, এটা কী করে সম্ভব? এটা অমিতের জন্যও হয়েছে লাবণ্যের জন্যও হয়েছে। কারণ আমার যেটা মনে হয় রবীন্দ্রনাথ একটা জিনিসই দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের এই যে বিবাহিত জীবন– যাকে আমাদের চাওয়া, পাওয়া, প্রেম, প্রাপ্তি সবকিছুর সর্বোচ্চ জায়গা বলে মনে করি; যাকে ভালোবাসতে হবে তাকে বিয়ে করতে হবে, সে-ই শেষ সে-ই মুখ্য– এটা ঠিক না। উনি দেখিয়েছেন মানুষের মধ্যে একটা বহুচারিতা আছে, বহুরকম আকুতি আছে। সেটাকেই তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উজ্জ্বল ভাষায় বলেছেন। কিন্তু পাঠক বুঝতে পারেনি যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমকেই সমর্থন করে গেছেন।

হালখাতা

তাহলে তো দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ পরকীয়াকে সমর্থন করে গেছেন ।

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

হ্যাঁ তিনি সমর্থন করেছেন এবং এটা সমাজে হবে । সেই যুগে এই পরকীয়া হওয়ার জন্য একটা উজ্জল সমাজ দরকার ছিল । এজন্য অমিত লাবণ্য এরা উচ্চ সমাজের মানুষ, কারণ অতিউচ্চ সমাজে এবং একদম গরীব সমাজে পরকীয়া হয় । দেখা যায় বস্তির মধ্যে কোনো বিয়ে নাই । আমরা মধ্যবিত্তে বিয়ে বলতেই শুধু পবিত্রতার কথা বুঝি, আনুগত্যের কথা বুঝি (যদিও আসলে ৯০ ভাগ বা ৯৫ ভাগ জায়গাতেই আমরা সেটা দেখি না) । সেটা বস্তিতেও নাই গুলশানেও নাই । কারণ বস্তির নির্মম দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষের এই উচ্চতর মূল্যবোধ রক্ষা করা সম্ভব না । আর গুলশান বা ইউরোপ আমেরিকাতে এত বিত্ত-বৈভবের মধ্যে মানুষ তার এই মূল্যবোধকে রাখা প্রয়োজনই বোধ করে না । যার টাকা আছে সে কেন অন্যকে কেয়ার করতে চাইবে? তো যেখানে অর্থ বেশি থাকবে সেখানে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে, বহুচারিতার মধ্যে চলে যাবে । যে যুগে অর্থ ছিল না সে যুগেও বিয়ে ছিল না, সেটাও ছিল বহুচারিতার একটা যুগ ।

হালখাতা

এখন তো মধ্যবিত্তের মধ্যেও এটা দেখা যায় । উদাহরণ স্বরূপ অপর্ণা সেনের ছবি ‘পরমা’র কথা আমরা বলতে পারি ।

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

হ্যাঁ মধ্যবিত্ত মানে একটু উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে এটা দেখা যায় । অপর্ণা সেনের ছবি ‘পরমা’তে স্বামী বোম্বে যায়, বড় চাকরি করে । দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরেও ভাববার সময় আছে, একটা জীবন আছে, সেটা অনেক সময় দেখবার জন্য অনেকের সময় হয় না, কিন্তু মানুষ যা পায় তার বাইরের আরও অনেক কিছুর জন্য বাড়তি একটা আকুতি থেকে যায় । সে কারণে মধ্যবিত্তের মধ্যেও পরকীয়া মাঝেমধ্যে দেখা যায় ।

হালখাতা

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে যে চলমান প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়ার ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

এখন তো অন্তত দুর্নীতি দমন শুরু হল । আগে যা ছিল না । দুর্নীতি দমন বিভাগ ছিল আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা অফিস । কাজেই প্রধানমন্ত্রী যা চাইতেন তাই হত । এখন তো তা হচ্ছে না । এখন তো সেটা একটা সাংবিধানিক পদ । ওটা স্বাধীন বলে সে তার

ইচ্ছামত কাজ করতে পারছে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া চালু করতে চাই সেখানে নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন হয়, সব ধরনের স্বাধীনতা তারা পেলে রাষ্ট্রে তখন আরও উপযুক্ত আইন তৈরি হতে থাকবে। তখন সব ব্যবস্থারই কম-বেশি উন্নতি হবে। তবে তার মানে এই না বাংলাদেশ স্বর্গ হয়ে যাবে। এখন যেমন একেবারে বাসযোগ্যতার বাইরে, তখন বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

হালখাতা
আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবদুলল্লাহ আবু সায়ীদ
তোমাকেও ধন্যবাদ।

[হালখাতা'র পক্ষে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গ্রন্থনা: শরমিন নিশাত ।]

প্র ব ন্ধ

দুর্নীতি: ব্যক্তিমালিকানা: আধিপত্যের ধারণা: বিচ্ছিন্নতা

জা কি র তা লু ক দা র

[কোনো কোনো দার্শনিক প্রস্তাবে মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে স্বভাবজ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, পশুবৃত্তির আধিক্যসম্পন্ন প্রাণী এবং নীচ মানসিকতার অধিকারী বলে। সেই সব দর্শনের প্রস্তাব অনুযায়ী স্বভাবত খারাপ মানুষের মধ্যে গুটিকয়েকমাত্র স্রোতের বিপরীতে চলে উঁচু মানসিকতার অধিকারী হতে পারে। বাকিদের কোনো না কোনো পীড়নের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য করতে হয়। নতুবা সভ্যতা টেকে না। এই দর্শনকে বিবেচনার কেন্দ্রে গ্রহণ করলে তখন আর নীতি-সুনীতি-দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনই পড়ে না। অন্যদিকে দর্শনের প্রস্তাবে যদি মানুষকে স্বাভাবিক

বিশুদ্ধির দিকে স্বতঃঅগ্রসরমান প্রাণী হিসাবে দেখা ও দেখানো হয়, কেবলমাত্র তখনই প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে এই জাতীয় বিষয়। সেই সঙ্গে আবার দেখা দেয় নানাবিধ সংজ্ঞা-বিভক্তি। কোনো কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ যেভাবে নীতি-দুর্নীতিকে চিহ্নিত করে, আরেক রাষ্ট্র ও সমাজে তার রকমফের রয়েছে। এই নিয়ে তর্কাতর্কিও কম নেই। কিন্তু আমরা এই লেখায় দুর্নীতিকে বেশ স্থূলভাবে হলেও ধরে নিয়েছি অন্যকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যমে অন্যকে শোষণ করা, সমাজপ্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকে বঞ্চিত করে নিজের ও নিজের কোটাভুক্ত সাথীদের জন্য অবৈধ বিত্ত-বৈভব-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধানের অপচেষ্টা করা ইত্যাদিকে। এইভাবে আলোচনা করতে গেলে দুর্নীতির আরো নানারকম সূক্ষ্ম দিক হয়তো অনালোচিত থেকে যাবে। তাতে অন্তত এই মুহূর্তে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ স্থূল দুর্নীতির আঘাতে প্রায় দিশেহারা জাতিকে সূক্ষ্ম চিন্তার মধ্যে ঠেলে আরও বেহাল করার চাইতে বর্তমানের দৃশ্যমান 'কুত্তা সামলানো'র পথ খোঁজাটাই বেশি জরুরি বলে মনে হচ্ছে।]

'বসালিপ্ত তৃণকে যে আমার বলে আমি তাকে হত্যা করি, তাই আমাকে উগ্র বলে। জ্ঞানকে কর্ম থেকে পৃথক করে নিয়ে যে পাণ্ডিত্য দেখায় আমি তাকে ধ্বংস করি, তাই আমাকে ভব বলে।' [শ্লোক ৩২, ৩৩, ত্রিংশ অধ্যায়, সনৎকুমার সংহিতা, শিবপুরাণ।] শব্দবিজ্ঞানী কলিম খানের প্রদত্ত অর্থানুসারে তৃণ শব্দের অর্থ ধান্য ও নীবার। ধান্য থেকে ধন ও নীবার থেকে নীবি হয়। এস্থলে নীবি হচ্ছে বণিকের আদি মূলধন। আর 'বসা' বা চর্বি হচ্ছে সামাজিক অবশেষ। তা থেকে ইংরেজি অ্যাবসেস বা পুঁজ। পুঁজ থেকে পুঁজি। আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'আমি' এখানে আদিম বা শিশু সাম্যবাদী সমাজ। যেখানে ব্যক্তিপুঁজির কোনো ধারণা বরদাস্ত করা হতো না। কারণ আমাদের সেই আদি পূর্বপুরুষগণ এটি বুঝে গিয়েছিলেন যে মানুষের সকল দুর্নীতির আদি কারণ বা আদি পাপ হয়ে দাঁড়াবে ব্যক্তিপুঁজির আবির্ভাব। সেখান থেকেই শুরু হবে মানুষের সমাজের সকল রোগগ্রস্ততা। এমনকি শারীরিক রোগগ্রস্ততার সঙ্গেও তাঁরা মিলিয়ে দেখতেন ব্যক্তিপুঁজি ও ব্যক্তিমালিকানার উত্থানকে। স্মরণযোগ্য চরক-সংহিতার 'রোগোৎপত্তি' অধ্যায়। সেখানে বলা হচ্ছে– ' সত্যযুগ গত হইবার সময় কোনো কোনো ব্যক্তি ধনাদির অতিগ্রহণ জন্য সাম্পন্নিক হওয়ায় তাহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশতঃ শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য ধন সঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা হইতে কামক্রোধ অভিমান দ্বেষ পরুষতা অভিঘাত ভয় তাপ শোক চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল... এবং জ্বরাদি ব্যাধি কর্তৃক শরীর আক্রান্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল... রোগ সমূহের প্রথমোৎপত্তির বিবরণ কথিত হইল।'

অতি সরলীকরণ মনে হলেও তাই সম্ভবত সততার সাথে শারীরিক রোগগ্রস্ততাকে একই সমতলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন গান্ধীজী। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল– 'আমি যদি কোনো দুরারোগ্য অসুখে ভুগতে থাকি, এমনকি আমার যদি একটি ফোঁড়া কিংবা ফুসকুড়িও হয়, তাহলে আপনাদের কর্তব্য হবে পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া যে আমি যেমন দাবি করি যে আমি ভগবানের লোক, তা সত্য নয়।'

এ থেকেও কাউকে কাউকে এমনটিও বলতে শোনা যায় যে সমাজদেহে ব্যক্তি মালিকানা ও মানবদেহে কুষ্ঠ একই রোগ। সমাজশরীরে যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি ও মানবদেহে গ্যাংগ্রিন ও পচনরোগ একই বিকৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সমাজদেহে তাপ-উত্তাপ ও মানবদেহে জ্বরজ্বালার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

আবারও বলা যায়, অতি সরলীকৃত মনে হলেও এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে অন্তত পৌঁছানো সম্ভব যে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতির কারণেই সমাজদেহে ব্যক্তি মালিকানা, শোষণ, ফাঁকি, শোষণকে টিকিয়ে রাখার মতো রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণ এবং সীমাহীন দুর্নীতির বিস্তার এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে দেশের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধ, মানুষর ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ববোধ, জাতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, পরম বিশ্বের ক্ষেত্রে পরমাত্মাবোধ। আর আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব মানুষ বিস্মৃত হতে শুরু করেছে ব্যক্তিপুঁজির জন্মলগ্ন থেকে। সেই বিস্মৃতি এখন কোনো কোনো অবস্থাতে অস্বীকৃতির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আর পুঁজির কালিমালিপ্ত সমাজ এইসব বিকৃতি মেনেও নিচ্ছে।

অনিবার্য ভবিতব্য মনে করে। তাই মাইকেল ফুজিয়ামা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে করপোরেট পুঁজির পক্ষ থেকে সদম্ভ ঘোষণা দিতে পারে– পুঁজিবাদই হচ্ছে মানবেতিহাসের সর্বশেষ এবং অনিঃশেষ অধ্যায়। মানুষ আজ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না যে ব্যক্তিপুঁজি ছাড়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে। অথচ ইতিহাস বলছে, মানুষের বয়স বা উদ্ভব থেকে অদ্যাবধি যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তার অধিকাংশ সময়ই মানবজাতি ব্যক্তিপুঁজির অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল। মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময়ের তুলনায় ব্যক্তিপুঁজির আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। সেই হিসাবে দুর্নীতিও মানবসমাজের খুব পুরাতন ব্যাধি নয়। সেই হিসাবে আশা করা যায়, দুর্নীতি মানুষের জেনেটিক কোডে অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী আসন এখনো গেড়ে বসতে পারেনি। অর্থাৎ দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি দানবীয় হলেও তা এখন পর্যন্ত সর্বাংশে অনিরাময়যোগ্য, এমন কথা বলার সময় আসেনি। এখানেই এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও বৈধতা ঠিক কবে থেকে তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে কোনো সন-তারিখ না দিয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনায় নিতে বলেছেন। তাঁর মতে পশুপালন, কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্পের শাখায় উৎপাদনের বৃদ্ধিতে মানুষের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি উৎপন্ন করা

যখন সম্ভব হল, তখন একই সময়ে গোত্র, গৃহস্থালি গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনন্দিন কাজের পরিমাণও বেড়ে গেল। তখন প্রয়োজন আরও শ্রমশক্তির যোগান। এই বাড়তি শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণের প্রথম উপায় হিসাবে বিবেচিত হল যুদ্ধ। যুদ্ধবন্দিদের দাস বানিয়ে নিয়োজিত করা হল বাড়তি উৎপাদনের কর্মক্ষেত্রে। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ শ্রমের উৎপাদিকা বাড়িয়ে অর্থাৎ সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে একই সঙ্গে সমাজে দাসপ্রথাকেও অপরিহার্যভাবে সামাজিক কাঠামোতে গ্রহণ করে নিল। প্রথম সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে এল দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত প্রথম বৃহৎ সামাজিক বিভাগ– মালিক ও দাস, বা মালিক ও ক্রীতদাস। তবে একই সঙ্গে আর একটি অভূতপূর্ব জিনিস ঘটেছিল। তা হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক আধিপত্যের নিরংকুশ প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি। ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেলস লিখছেন– ‘কী করে এবং কবে যে পশুযূথগুলি উপজাতি বা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন পরিবারের প্রধান ও তুলনামূলক ক্ষমতাশালীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল তা আজও আমরা জানি না। কিন্তু প্রধানত এই ঘটনা এই স্তরেই ঘটে থাকবে। পশুযূথ ও অন্যান্য নতুন নতুন ধনসামগ্রী পরিবারের ভিতর একটি বিপ্লব আনল। জীবিকা অর্জন সবসময়ই ছিল পুরুষের কাজ; সেইজন্য সে জীবিকার উপকরণগুলি তৈরি করত ও দখলে রাখত। পশুযূথগুলি এখন হয়ে উঠল জীবিকার নতুন উপায় এবং গোড়ায় তাদের পোষ মানানো ও পরে প্রতিপালন হল তার কাজ। এইজন্য গবাদিপশু এবং তাদের বিনিময়ে যেসব পণ্য ও ক্রীতদাস পাওয়া যেত সেইসবের মালিক হল পুরুষ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্বৃত্তই গেল পুরুষের ভাগে; স্ত্রীলোকেরা ছিল কেবলমাত্র তাদের ভোগের অংশীদার। (এর আগে) ‘বন্য’ যোদ্ধা ও শিকারী ঘরের মধ্যে গৌণ ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকের প্রাধান্য মানত। কিন্তু ‘অপেক্ষাকৃত নম্র’ পশুপালক তার সম্পত্তির জোরে প্রথম স্থান দখল করল এবং স্ত্রীলোককে গৌণ ভূমিকা নিতে বাধ্য করল। এতে স্ত্রীলোকের অভিযোগ করার কিছু ছিল না। পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তিত হল না বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন এতে আগেকার পারিবারিক সম্পর্কের ওলোটপালোট হল শুধুমাত্র এইজন্য যে পরিবারের বাইরে শ্রমবিভাগের ধরন পাল্টে গিয়েছিল। ঠিক যে কারণে আগেকার দিনে স্ত্রীলোক সংসারের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়েছিল, অর্থাৎ তাকে ঘরের কাজ করতে হত বলে, এখন ঠিক সেই কারণেই সংসারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত হল; স্ত্রীলোকের ঘরের কাজ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের কাজের তুলনায় তাৎপর্য হারাল; এই দ্বিতীয় কাজটাই ছিল সব, প্রথমটার অবদান ছিল তুচ্ছ। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে, স্ত্রীলোকের মুক্তি এবং পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার হচ্ছে অসম্ভব এবং ততদিন অসম্ভব থাকবে যতদিন স্ত্রীলোক সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজে। নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে বৃহদাকারে, সামাজিক আকারে উৎপাদনে

অংশ নিতে পারছে এবং যখন গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজন হচ্ছে গৌণ মাত্রায়। ... (তার পরে) দ্বিতীয় বিরাট শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কুটিরশিল্প বিচ্ছিন্ন হল কৃষি থেকে। উৎপাদনের অবিরাম প্রসার এবং তার সঙ্গে শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার ফলে মানুষের শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ল। পূর্ববর্তী স্তরে যা ছিল একটি সদ্যোজাত ও আপতিক ব্যাপার, সেই দাসপ্রথা এখন সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল অঙ্গ হয়ে উঠল। দাসরা এখন আর শুধু সাহায্যকারী থাকল না, পরন্তু তাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে ক্ষেতে ও কারখানায় কাজ করানো হতে থাকল। উৎপাদনকে দুইটি প্রধান শাখায়, কৃষি ও হস্ত শিল্পে ভাগ করার ফলে বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন বা পণ্যের উৎপাদন শুরু হল; এর সঙ্গে এল বাণিজ্য, শুধু উপজাতির অভ্যন্তরে এবং তার সীমানা বরাবর নয়– পরন্তু সমুদ্রপারেও। ... এখন স্বাধীন মানুষ ও দাসের সঙ্গে যোগ হল ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যও।'

অর্থাৎ ব্যক্তিপুঁজি বা ব্যক্তি মালিকানার উৎপত্তির সন-তারিখ নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে সামাজিক বা যৌথ সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশকে ছলে-বলে-কৌশলে আত্মসাতের মাধ্যমেই প্রথম ব্যক্তিপুঁজির উদ্ভব। এবং সেটাই মানবজাতির মধ্যে প্রথম দুর্নীতির সূত্রপাত। এই সত্য জানতেন বলেই অনেক দার্শনিককে বলতে শোনা গেছে– সম্পত্তি মানেই চৌর্যবৃত্তির অর্জন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রশ্ন ওঠা সমীচীনও যে, দুর্নীতি কি মনস্তাত্ত্বিক নাকি সামাজিক ব্যাধি? যদি দুটোই হয়, তাহলে কতখানি সামাজিক, আর কতখানি মনস্তাত্ত্বিক?

সিংহভাগ সামাজিক। যার আলোচনা এখন চলছে। দুর্নীতির মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরমতম উপজাত হিসাবে অধুনা আবির্ভূত ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে।

০২.

"জগতে যত কলহ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, সেই সব লিখিত থাকে ইতিবৃত্তে। যে স্নেহ, প্রীতি, সহযোগিতা নিঃশব্দে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে চলেছে তার ইতিহাস নেই, হতে পারে না।"

কথাগুলো রয়েছে গান্ধী রচিত 'হিন্দ স্বরাজ' বইতে। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এই বাক্যে আস্থা স্থাপন করা হয়েছে মানুষের ইতিবাচক মূর্তির প্রতি। সত্যিই বটে, দুর্নীতিবাজ আর কয়জন! সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, যারা সমাজের ভিত্তি ও মূল চালিকাশক্তি, তারা তো দুর্নীতি করার সুযোগ পায় না, দুর্নীতিকে চেনে না। চিনলেও ততটুকুই চেনে, যতটুকুর ভোগান্তির শিকার হয় তারা। তারা সয়ে চলে, নিজেদের কাজ করে চলে, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার শিকার হয়ে ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সেই ব্যথাকে ভুলে থাকতে চায়, আর কখনো কখনো অসহ্য হয়ে উঠলে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে বিশ্ব নিঃক্ষত্রিয় করার মতো বিশ্ব দুর্নীতিবাজমুক্ত করার শপথ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিরাট বিশাল রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরে

বিজয়ী জনগণ যাদের হাতে আবার নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ভার অর্পণ করে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নিজেদের কাজে নিজেদের বৃত্তে ফিরে যায়, তারা ভোল পাল্টাতে বেশি সময় নেয় না। কারণ তারা যে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দুর্নীতিবাজ তা নয়। বরং দুর্নীতি হচ্ছে তাদের শ্রেণীর টিকে থাকা ও আধিপত্য বজায় রাখার একমাত্র হাতিয়ার। তাই অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তারা দুর্নীতিতে নিয়োজিত হয়।

এই আধিপত্য ও দুর্নীতি জনগণ মেনে নেয় কেন?

মেনে নেয়, কারণ তাদের সামনে দুর্নীতির সপক্ষে বিভিন্ন ছদ্মবেশী দর্শন ও সংস্কৃতি উপস্থাপন করা হয়। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন ক্ষমতা দুর্বল হলে অধিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে কিছু লোকদেখানো সংস্কারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে আপন মতাদর্শগত বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়। তখন মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিপতিদের পক্ষেই শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন লাভ করা নিশ্চিত হয়। সেই রকম বিভিন্ন অপতত্ত্বের আড়ালে ও ধর্মীয় শরা-শরিয়ত-রীতিপদ্ধতির নামে ব্যক্তিপুঁজি ও ব্যক্তিমালিকানা জায়েজ করার অব্যাহত প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। তখন, এমনকি বর্তমান সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে কট্টর সমালোচকও দ্বিধায় পড়ে যায় ব্যক্তি মালিকানার বিরোধিতা করার প্রশ্নে। সেই রকম একটি কূটতর্ক হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকৃত উপস্থাপনা। ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে গণ্য করতে শেখানো হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাটিকে। এই বিষয়ে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই বলয়ের অধিবাসী। রবীন্দ্রনাথকে বলতে শোনা যায়– 'মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।' সেই একই কথা। ভোগের উপকরণ, ব্যক্তিগত ভোগেচ্ছা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে ওকালতি। অনুচ্চারে সেই কথাটি বলে দেওয়া যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা একই ধ্বনি তোলেন– ভোগেচ্ছা না থাকলে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। ব্যক্তিগত লাভ না থাকলে মানুষ কোনো কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় না। উদাহরণ হিসাবে তারা সদ্য বিলুপ্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন কমে যাওয়ার কথা বলেন।

কিন্তু কথাটি কি আদপেই সেভাবে বলা যায়? মানুষ যখন জানে যে তার শ্রম যথার্থ দেশসেবার কাজে ও মানবসেবার কাজে ব্যয়িত হবে, তখন তো সে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত লাভালাভ বিচার না করে সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে তো এই প্রবণতাই দেখা গিয়েছিল। আদর্শিকভাবে মিলিত সমষ্টির শ্রম যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে তার উদাহরণ হয়ে আছে বিপ্লব-পরবর্তী দেশগুলি। তখন মানুষ শুধু নিজের ভোগের জন্যই পরিশ্রম করেনি, বরং পরিশ্রম করেছে বিশ্বের তৎকালীন মহত্তম অর্জনকে রক্ষা করার জন্য। তাকে বিশ্বের নানা প্রান্তে পৌঁছে

দেওয়ার জন্য। সেই অর্জনের নাম কী? পুঁজির দাসত্ব থেকে মানবতার মুক্তির সূত্রপাত। ব্যক্তিপুঁজির আদিপাপ শত শত বছর ধরে মানুষকে যে ক্রমাগত অমানবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনছিল, মানুষ্যত্বের সেই অবনমন ঠেকানোর পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন সেখানকার জনগণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের ঘোষণা সেখানে যে সম্বর্ধনা লাভ করেছিল, তেমন ঐতিহাসিক ঐকমত্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। যতদিন সেখানকার নেতৃত্ব এই আদর্শকে ধরে রেখেছিল, ততদিন মানুষ কাজ করতে দ্বিধা করেনি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, এমন অভিযোগ একটিবারও উচ্চারিত হয়নি। বরং তারা তাদের নিজেদের মনের মতো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ, নিজের পছন্দমতো পেশায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পেয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আরও বেশি করে ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্ব যেদিন আদর্শচ্যুত হয়েছে, সেদিন জনগণও হতাশ হয়ে আক্রান্ত হয়েছে ব্যক্তিসর্বস্বতার চোরাফাঁদে। কাজেই কোনো মতেই বলা চলে না যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অভিন্ন। বরং উল্টোটাই বেশি সত্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানে কয়েকজনের হাতে সম্পদের পাহাড়, আর অন্যেরা তাদের অধীনস্ত, শর্তাধীন শ্রমশক্তিবিক্রেতা। যাদের হাতে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা, সেই গুটিকয়েক ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা খোয়াতে বাধ্য হয় কোটি কোটি মানুষ। সেই ব্যক্তিপুঁজি যখন সামন্তপুঁজি, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, ফিন্যান্স পুঁজি হয়ে আজকের করপোরেট পুঁজির যুগে প্রবেশ করেছে, তখন বাংলাদেশের মতো অধিকাংশ দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে করপোরেট পুঁজির কাছে। আর ব্যক্তি? তাকে তো কিনে নিয়েছে পণ্যমোহ, বিজ্ঞাপন ও অশালীন ভোগের মোহ। সে নিজের অজ্ঞাতেই আত্মসমর্পণ করছে ভোগবাদের কাছে, দুর্নীতির কাছে। কিন্তু জানতে পারছে না যে তার কৃত দুর্নীতির শিকড় উপ্ত রয়েছে করপোরেট পুঁজির গর্ভে। যতদিন ব্যক্তিপুঁজি আবির্ভূত না হয়েছে, ততদিন দ্রব্য বিনময় ছিল নেহায়েতই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার চিহ্নস্বরূপ একটি উন্নত মানবিক ব্যবস্থা। ব্যক্তিপুঁজি এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে পরিণত করল 'পণ্যে'। কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' প্রথম খণ্ডে দেখা যায় তা বহু অধিবিদ্যক নিগূঢ়তা ও ধর্মশাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতার প্রাচুর্যে ভরা একটি অতি অদ্ভুত পদার্থ। যতদূর পর্যন্ত সেটি একটি ব্যবহার মূল্য, ততদূর পর্যন্ত তার মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে মানুষ তার শ্রমদ্বারা প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর আকৃতি এমনভাবে পরিবর্তিত করে, যাতে তাকে তার পক্ষে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। যেমন কাঠের রূপ পরিবর্তিত হয়ে টেবিল তৈরি হয়। তথাপি ঐ পরিবর্তন সত্ত্বেও টেবিল সেই সাধারণ প্রতিদিনের জিনিস, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাঠই থেকে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তা পণ্যরূপে এক পা এগোয়, অমনি তা পরিবর্তিত হয়ে যায় অতীন্দ্রিয় একটা কিছুতে। তা কেবল জমির ওপর পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায় না, বরং অন্যান্য সকল পণ্যের সামনে মাথায় ভর দিয়েও দাঁড়ায়। তখন তার কাষ্ঠ-মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়

এমন সব কিম্ভুত-কিমাকার ধারণা, যা "টেবিলের নিজে নিজে নৃত্য করার" চেয়েও অনেক বেশি অদ্ভুত।

সুতরাং পণ্যের রহস্যময় চরিত্রের উৎস তার ব্যবহারমূল্য নয়। মূল্য দিয়ে যা নির্ধারিত হয় তার প্রকৃতিও এই রহস্যের উৎস নয়।'

পণ্যের এই অতীন্দ্রিয় রহস্যময় চরিত্র ও ক্ষমতার কথা সবচেয়ে ভালো জানে বণিকশ্রেণী। তাদের জ্ঞান বিকশিত হতে হতে আজ সপ্তম আশ্চর্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে করপোরেট পুঁজির হাতে। তাই ব্যক্তিপুঁজি যদি হয় দুর্নীতির অন্য নাম, তাহলে করপোরেট পুঁজি হচ্ছে দুর্নীতির সর্বপ্লাবী বিশ্বময়তা।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিপুল-বিশাল বিশ্বদৃষ্টি সত্ত্বেও পুঁজি ও পণ্যের এই চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেননি বলেই ব্যক্তিমালিকানার সপক্ষে অবস্থান নিয়ে ছিলেন সারাজীবন। তাঁরা ভাবতেন ব্যক্তিমালিকানার প্রচলন অব্যাহত রেখে শুধুমাত্র মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার মাধ্যমে সব ধরনের দুর্নীতি নির্মূল করা যাবে। দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের ভ্রান্ত এই ধারণা তার যথাযোগ্য ফলাফলই এনে দিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে।

০৩.

বাংলাদেশের দুর্নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আরেকটি প্রসঙ্গ– বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা শ্রমিক বা মেহনতী শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা নয়। উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ শ্রমিকশ্রেণী যে মানসিক বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, মার্কস-কথিত সেই বিচ্ছিন্নতার চাইতে এই বিচ্ছিন্নতা অনেক স্থূল ও নোংরা। আমাদের শাসক ও অধিপতি শ্রেণী এই বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। এই বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত নাম দেশপ্রেমহীনতা। এই দেশপ্রেমের ছিঁটেফোটাও নেই আমাদের দেশের অধিপতিশ্রেণীর হৃদয়ে ও মননে। প্রকৃতপক্ষে এদের কোনো দেশ নেই। বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটিকে এরা মনে করে শোষণের অবাধ ক্ষেত্র। নিজের দেশকে দেশ মনে করলে দুর্নীতি কেউ করতে পারে না। কারণ সে জানে যে দুর্নীতি করা মানে নিজের দেশের আত্মা থেকে খাবলা দিয়ে একমুঠো মাংস কেটে নেওয়া। যে দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁচার অবলম্বন তথা সম্পদ নেই, সেই দেশে দুর্নীতির মাধ্যমে নিজে লাভবান হওয়ার সোজা অর্থ হচ্ছে আরেকজনের জীবনকে অসহনীয় করে তোলা, আরেকজনের ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাসবায়ু ছিনিয়ে নেওয়া। বাংলাদেশের অধিপতি শ্রেণীর দক্ষতা একমাত্র দুর্নীতিতে। এই দক্ষতা অর্জন করে তারা সারা জীবন ধরে, প্রয়োগও করে সারা জীবন ধরে। তারা বাংলাদেশে অবস্থান করে, কিন্তু বাংলাদেশ নামক দেশ ও দেশপ্রেমের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন।

দেশ কেউ জন্মসূত্রে পায় বটে, কিন্তু তার যোগ্য হয়ে উঠতে সবাই পারে না। রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলে এই বিষয়ের খুব ভালো একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে বলছেন– "আমার দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা

আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি– এই জন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে আমাদের এই দেশ কিছুতেই আমাদের শাসক ও অধিপতিশ্রেণীর কাছে স্বদেশের মর্যাদা পায় না। এই দেশ তাদের দেশ নয়। অথচ এই দেশের ক্ষমতায় তারা আসীন যুগ যুগ ধরে। মাটি থেকে বিচ্ছিন্নতা যে দুর্নীতির সর্বব্যাপী বিস্তারে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, বিচ্ছিন্নতার মনস্তত্ত্ব তা আমাদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা তখনই বৈধতা লাভ করতে পারে, যখন তা দুর্নীতি নির্মূলের উদ্দেশ্যটিকে ধারণ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের মধ্য দিয়ে মনুষ্য সম্প্রদায় দুর্নীতি-রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই দুর্নীতির মতো ব্যক্তিপুঁজির ইতিহাস-উদ্ধার সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিহাসে রোগোৎপত্তি থাকলে সেই ইতিহাসেই রয়েছে রোগের নিদান। জীবনানন্দের ভাষায়–

'ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মত শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।'

দুর্নীতির সমাজ-মনস্তত্ত্ব

চ ঞ্চ ল আ শ রা ফ

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক: গনি আর মনি দুই ভাই। অসচ্ছল পরিবারে জন্ম নিলেও নিজের চেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমজন বন বিভাগ ও দ্বিতীয়জন শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। বেশ কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হয়েছে বলে ছেলেবেলা থেকেই বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশের দিকে গনির একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বন বিভাগের চাকরিতে কেবল আরাম-আয়েশ নয়, বনের রোমাঞ্চও তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আর এখানে যে প্রচুর বাড়তি অর্থলাভের সুযোগও আছে সেটা তিনি জানতেন। অন্যদিকে, কলেজশিক্ষক ভাইটি নিতান্তই সাদাসিধা। তিনিও কষ্ট করে শিক্ষিত হয়েছেন। এখনও তাকে পরিশ্রম করতে হয়। বেতনের টাকায় সংসার চলে না বলে চাকরির বাইরে তাকে শ্রম দিতে হয়। যদিও এমনটি যে তাকে করতে হবে সে-কথা তিনি চিন্তাই করেন নি। কারণ, তিনি মনে করতেন এবং এখনও করেন, বিশ্ববিদ্যালয় চলে জনগণের অর্থে, চাকরি করলে তাতেও জনগণের অর্থেই বেতন হয়। সুতরাং জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত কোনওমতেই উচিত নয় বাড়তি উপার্জনের নামে অবৈধ অর্থের সন্ধান করা। কেননা, সে-অর্থ আসে জনগণের পকেট থেকেই। আর, লুটপাট করলে তার ধকল কোনও-না-কোনওভাবে জনগণের ওপর দিয়েই যায়। অন্যদিকে, এটা একটা সংক্রামক ব্যাধির মতোই; একজনের দেখাদেখি অন্যরাও শুরু করে দেয়, ফলে এটি রূপ নেয় প্রতিযোগিতায়। অসৎ উপার্জন যে-দেশে প্রতিযোগিতার বিষয়, সে-দেশে সৎ নাগরিক পাওয়া কল্পনা মাত্র। সেই বিরলদেরই একজন হতে চান মনি। এ-ই হল মনির চিন্তা। অন্যদিকে, গনির মনের বাসনা এই যে, জীবনটা বিত্ত-বৈভবে ভরিয়ে তুলতে হবে। তার ধারণা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মা-বাবাকে প্রাচুর্যের মধ্যে সুখে-শান্তিতে রাখতে পারাটাই জীবনের সার্থকতা। তিনি দেখে ও বিশ্বাস করে এসেছেন, অগাধ অর্থই পারিবারিক সুখ ও সামাজিক মর্যাদার পূর্বশর্ত। অগাধ অর্থ মানেই অবৈধ অর্থ, যা উপার্জনে সফল গনি নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সমস্ত সাধ মেটাতে পারেন সহজেই; মা-বাবাকেও রাখতে পারেন পরিপূর্ণ আদরে। ফলে পরিবারে গনির একটা সুবিধাজনক

অবস্থান তৈরি হয়ে যায়। যে-কোনও সিদ্ধান্তে তাকে পরিবারের দরকার হয়। আর তার কথাও সবাই বেশ মনোযোগের সঙ্গে শোনে, পালন করে তার আদেশ। অন্যদিকে, মনি যেহেতু তার বেতন দিয়ে নিজেই ঠিকমত চলতে পারেন না, পরিবারে তার কোনও আর্থিক অংশগ্রহণও থাকে না। পরিবারে গনির একচ্ছত্র অবদান থাকায় মনিকে অবশ্য তাদের দরকারও হয় না। ব্যাপারটা এই, যেহেতু মনির টাকা তাদের দরকার হয় না, মনিকেও তাদের প্রয়োজন নেই। ফলে পরিবার থেকে তিনি অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী ও সন্তানরা দেখে, কেবল দেবর ও চাচা নন, বা, পরিচিতদের প্রায় সবাই যে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে– কামাচ্ছে টাকা, বাড়ি-গাড়ি সবই করে ফেলছে রাতারাতি। সমাজে তাদের খুব সম্মান, যে-কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রিত হয়। কারণ, তারা গাড়ি নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে যায়। সমাজের অবস্থা এমন– যে দাওয়াত দেয় তার বাড়ির সামনে গাড়ির বহর না-থাকলে কারও কাছে মান-ইজ্জত বলে কিছু থাকে না; সবাই ভাবে এই লোকটার আত্মীয়-স্বজন গরিব। বড়লোক আত্মীয় না-থাকলে সমাজে দাম থাকে না। এই সব সামাজিক উপেক্ষার রেশ ধরে স্ত্রী-সন্তানের কাছে মনিরও কোনও সম্মান থাকে না। মা-বাবা অবশ্য বলেন, 'দুইটা ছেলেরে মানুষ করলাম, কিন্তু একটার অবস্থা ভালা না। মারফতি দুনিয়ায় আছে। পরিবারের দিকে খেয়াল নাই।' এসব শুনে তার মধ্যে একটা হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। মানসিকভাবে সে হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত ও নিঃসঙ্গ। এখন সে কী করবে?

গল্পটি নানাভাবে বিস্তৃত করা যেতে পারে। শেষ করা যেতে পারে নানাভাবে। সেটা পাঠকের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। সত্য যে, বেশ আগে থেকেই গল্পটি বাংলাদেশের সর্বত্র বাস্তব হয়ে আছে। এতে যে-গনির কথা বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে ধরা-পড়া 'বনের রাজা' তিনি নন। যদিও সেই বনের রাজা এ-দেশে যেমন কম নয়, তেমনি এই গল্পের গনিও রয়েছে অনেক। পাঠক, লক্ষ করুন, এই গল্পে অবৈধ অর্থ উপার্জনে কোনও বাধা নেই– না পরিবার থেকে, না সমাজ থেকে, না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে। সর্বব্যাপী লোভের সমাজে এমনটিই স্বাভাবিক। পরিবার থেকে বাধা না-পাওয়ার কারণ কী? কারণ লোভ আর সামাজিক পরিবেশ; সমাজ থেকে বাধা না-থাকার কারণ মূল্যবোধের পতন; পরিবার ও সমাজ থেকে বাধা না-থাকলে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় বাধাটিও যায় হাওয়ায় মিলিয়ে। রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যর্থ হয়, বা, সংগঠন হিসেবে সরকার যখন হয় ব্যর্থ– তখনই এমনটি ঘটে। আসল কথাটি হল, গনির অবৈধ অর্থের কারণ তার লোভ। পাশাপাশি, এই লোভ চরিতার্থ করার মতো সামাজিক-পারিবারিক-প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশও তাকে উৎসাহিত করেছে। যে-সমাজে টাকাই সর্বশক্তিমান, (এখানে টাকায় আইনও চুপ হয়ে যায়) অবৈধ রোজগার সেখানে অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে না। এই অবস্থাই মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্নীতির দিকে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজকে চালিত করে। করলে, দুর্নীতি তথা আর্থিক অপরাধের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে যায় দেশজুড়ে। সেখানে সৎ ব্যক্তি টিকে থাকতে পারে

না। সেখানে সব অবৈধই বৈধ, সব দুর্নীতিই নীতি আর সব অপরাধই বাহাদুরির ব্যাপার হয়ে যায়।

আমাদের সমাজ বেশ 'বস্তুবাদী'। শৈশব থেকে তাই এদেশের সন্তানদের শিক্ষিত হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করা হয় এভাবে– 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'। শিক্ষিত হওয়া যে বিবেকবান-জ্ঞানী-গুণী-সৎ হওয়া– সেই ধারণাটি হটিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজ থেকে, বহু আগেই। লেখাপড়া করে যখন দেখে যে, কেবল বেতনের টাকায় গাড়ি কেন, তার একটা চাকাও কেনা সম্ভব নয়, 'শিক্ষিত' লোকটির মাথাই তখন ঠিক থাকে না! নীতি দিয়ে সে করবে কী, পরিবার-প্রতিবেশি কারও কাছেই মান-ইজ্জৎ যে থাকছে না। আর, টাকা সাদা চোখে দেখা যায়, নীতি তো দেখা যায় না; গাড়ি, বিলাসবহুল বাড়ি, দামি শাড়ি-পোশাক, চায়নিজ-খাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়, আর যে বেশি দেখাতে পারে সমাজে তার সম্মানের সীমা নেই; কিন্তু নৈতিকতা আর সততা তো দেখা যায় না, গেলেও তা কোনও কাজে লাগে না। এমন একটা ব্যাপার সমাজের অনেক গভীরে শেকড় মেলে দিয়েছে। ফলে সমাজটা হয়ে উঠেছে প্রদর্শনসর্বস্ব। জ্ঞানী-গুণী-সৎ-বিবেকবান-দায়িত্বশীল হওয়া নয়, অর্থ-বিত্ত দেখাতে পারাটাই এখানে বাহাদুরি।

বেশ আগে থেকেই আমাদের সমাজে 'উন্নতি' শব্দটি বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সোজা কথায় সেটি হল– জমির মালিক হওয়া, বাড়ি বানানো, দামি আসবাব, গাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি কেনা; আর এসবের জন্য লাগে টাকা। অর্থাৎ 'উন্নতি' মানেই টাকা। এই টাকা জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা নয়, কারণ, শুধু বেঁচে-থাকাটাই উন্নতি নয়। আমাদের সামাজিক আড্ডাগুলোর বিষয় তাই কে কত উন্নতি করল, কোথায় কে বাড়ি বানাচ্ছে, কে ঘন-ঘন গাড়ির মডেল পাল্টাচ্ছে; 'আলিমুদ্দিনের ছেলে তালিমুদ্দিন তো উন্নতি করছে, সেদিনই দেখলাম বেশ দামি একটা গাড়ি কিনেছে!'

'মানুষ' শব্দটিও আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হয় বিশেষ এক অর্থে। সেটি হল, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হয়ে টাকা কামিয়ে পরিবারকে সুখে-আদরে-শান্তিতে যে রাখে, সে-ই মানুষ। 'আমার ছেলে আজ মানুষের মতো মানুষ হইছে', 'ছেলে আজ মানুষ হইছে'– অভিভাবকের মুখে এমন কথা শোনা গেলে বুঝতে হবে সন্তানটি তাদের পরম সুখে রেখেছে বা রাখতে শুরু করেছে; আগে সে ছিল 'ছেলে', তখন তার পেছনে ঢালতে হত টাকা, আর এখন সে 'মানুষ'– কেননা, তার অর্থই পরিবারের সুখ করেছে নিশ্চিত। নইলে সে হত 'জানোয়ারের মতো মানুষ'। কিন্তু সুখের নিশ্চয়তা দেয়ার এই টাকা আসে কোত্থেকে, এ-নিয়ে কোনও প্রশ্ন পরিবারের নেই। মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র দেখতে গেলেও খোঁজ করা হয় পাত্রের বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালান্স আছে কি-না। কারণ, প্রতিবেশি বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে গল্প করে বলতে হবে, জামাই বাবাজিটি বেশ ধনাঢ্য ব্যক্তি, মেয়েটা সুখে-শান্তিতেই থাকবে। কতটা অন্তঃসারশূন্য হলে সুখ-শান্তির সঙ্গে ধন-সম্পদকে এক করে দেখে সমাজ! কিন্তু জামাইবাবা কোথায় এত টাকা

পেল, তা নিয়ে কারও কোনও জিজ্ঞাসা থাকে না। প্রতারক কি-না, ট্যাক্স ফাঁকি দেয় কি-না, ঘুষখোর কি-না, বাটপার বা মুনাফালোভী মজুতদার-ব্যবসায়ী কি-না– এইসব ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন থাকে না। এমন-কি এটাও দেখা গেছে, বিত্তশালী জামাতার প্রতি কন্যাপক্ষের খাতির-আদরের সীমা নেই। আর যদি ঘটনাচক্রে বা নিরুপায় অবস্থায় সৎ-অসচ্ছল ব্যক্তিকে জামাতা হিসেবে মেনে নিতে হয়, সে-পরিবারে ওই ভদ্রলোকের কী-যে হাল– তা সবারই কম-বেশি জানা। যে-সমাজে টাকাই মান-মর্যাদার নির্ধারক আর রয়েছে অর্থ-বিত্ত প্রদর্শনের লাগামহীন প্রতিযোগিতা, সেই সমাজ নীতিহীনতার, অসততার, দুর্নীতির বদ্ধ একটা ডোবা ছাড়া কিছু হতে পারে না।

এদেশের সন্তানদের শিক্ষাদান শুরু হয় গাড়ি-ঘোড়ার লোভ দেখিয়ে, অর্থাৎ লোভের পাঠটাই দেয়া হয় সবচেয়ে আগে, সে-কথা একবার বলা হয়েছে। এখন ঘোড়া নগরজীবনে তেমন কোনও কাজে লাগে না, তবু এর প্রয়োগ উঠে যায় নি। কারণ, এটি শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক। সেই লোভ নিয়ে সে যখন বড় হয়, তার মধ্যে এই ভাবনা দেয়া হয় ঢুকিয়ে– টাকা কামানো ছাড়া জীবনে আর কোনও বড় কাজ থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়; সুতরাং বেশি করে টাকা কামাতেই হবে। কীভাবে তা সম্ভব? সেটা এখনকার ছেলেমেয়েরা বেশ ভালো করেই জানে। যারা ব্যতিক্রম, যাদের পড়াশোনা পাঠ্যসূচির মধ্যে আবদ্ধ নয়, জীবন সম্পর্কে যাদের আগ্রহ গড়পড়তা নয়– তাদের বোঝানো হয়, উচ্চতর শিক্ষায় এমন কোনও বিষয় নেয়া ঠিক হবে না, যাতে চাকরির সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার বেশ আগেই তার মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয় চাকরি। এক্ষেত্রে ওই মেধাবী সচেতন সন্তানটির যে একটা সিলেকশন থাকতে পারে সেই ব্যাপারটির কোনও মূল্য থাকে না। এখান থেকেই তার হতাশার শুরু। সে অন্য প্রসঙ্গ। কথা হল, কোনও অভিভাবককে বলতে শোনা যায় না– 'আমার সন্তান বিদ্বান হোক, নীতিবান হোক।' তারা এটা কেন বলবেন? সে-রকম সন্তানের পরিবর্তে তাদের দরকার ডাক্তার, রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না-করে তার পকেট শূন্য করে যারা কামাবে কাড়ি-কাড়ি টাকা; কিন্তু ট্যাক্স দেবে না। তাদের চাই ইঞ্জিনিয়ার সন্তান, যে দুর্নীতির প্রকৌশল খাটিয়ে আত্মসাৎ করবে অঢেল অর্থ, যেখানে ট্যাক্স দেয়ার প্রশ্নই আসে না। এরা হচ্ছে আমাদের সমাজে 'উন্নতি'র মডেল– তাই অভিভাবকরা চান সন্তান হোক ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার, তা না-হলে তাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু তারা হাল ছাড়েন না। সন্তানের জন্য বিকল্প চিন্তাও তাদের থাকে। সেই বিকল্পও (অবৈধ) টাকাকেন্দ্রিক: যেমন– কাস্টমস, পুলিশ ইত্যাদি। এখন অবশ্য সব বিভাগই দুর্নীতিতে ভরে গেছে। সুতরাং সন্তানের 'উন্নতি'র জন্যে বিকল্পের অভাব নেই। অভিভাবকরা যে-কোনও একটা সরকারি চাকরির জন্য টাকা ঢালতে পারেন, টাকায় কি-না হয়! আর, এ-দেশে তো হয় সবই।

'শিক্ষিত', 'মানুষ', 'উন্নতি'– শব্দ তিনটির অর্থে ধরেছে পচন। যে-সমাজ যত বেশি পচনশীল, সে-সমাজে শব্দের অর্থও ততো বেশি পচনশীল। এর অনেক কারণের আসলটি হল, সমাজে বেশ আগে থেকেই অর্থ-বিত্তের প্রভাব-দাপট-শক্তি মান্য হয়ে

আসছে। সামন্ত অবস্থা থেকে এ-সমাজের উত্তরণ যে-টুকু ঘটেছে, তা সামান্যই এবং আপাত– অন্য-সবকিছুর কথা অন্যত্র রেখেও বলা যায়, মানসিক অবস্থার ঘটেছে পতন; যা ঘটেছে, সামন্ত-মানসিকতার চেয়েও খারাপ। সবকিছুতেই লাভের চিন্তা গেছে ঢুকে; আর বিনিয়োগ ছাড়া তো লাভ অকল্পনীয়। ফলে, 'শিক্ষিত', 'মানুষ', 'উন্নতি'– এ-সবই হয়ে গেছে বিনিয়োগকেন্দ্রিক। যে অভিভাবক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল কলেজে বা বিদেশে সন্তানদের পড়াচ্ছে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করে, তাদের মতলবটা কী, তা পাগলেরও অজানা নয়। উদ্দেশ্য যতই হোক সন্তানের মঙ্গল, (এই 'মঙ্গল'ও কিন্তু টাকাকেন্দ্রিক, প্রদর্শনসর্বস্ব) তা আসলে টাকার একটা মেশিন বানানো– যাতে বিনিয়োগ-করা অর্থই কেবল উঠে আসবে না, জীবনভর এত বেশি রোজগার হবে যে, সন্তানের সুখ নিয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকবে না।

উল্লেখ বাহুল্য নয়, যে-সরকারই এ-দেশে আসে, জনগণের যন্ত্রণা লাঘবের পরিবর্তে কীভাবে তা আগের চেয়ে বাড়িয়ে তোলা যায়, সে-বিষয়ে তার আন্তরিকতার সীমা থাকে না। মানুষের সব ধরনের নিরাপত্তা হরণ করা সরকারি কর্তব্যের একটা অংশে রূপ নিয়েছে বেশ আগেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তাহীন মানুষ কী করে? সে একটা বিকল্প শক্তির আশ্রয় চায়। এ-দেশে সেই শক্তিটি হলো টাকা। সর্বশক্তিমান টাকা যার আছে প্রচুর, নিরাপত্তা তারই বেশি, আর সমাজে যথেষ্ট বলশালীও সে। টাকার বলে বলীয়ান হলে যে-কোনও অপরাধ-অপকর্ম তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। একটা অপরাধ আরেকটা অপরাধের জন্ম দেয়, যেমন একটা দুর্নীতি জন্ম দেয় আরেকটা, তার চেয়েও জঘন্য দুর্নীতির।

এই যে অবস্থা, এটা একদিনে হয় নি। এর একটা ইতিহাস আছে– সেটি আমরা না-হয় অন্য কোনও সময়, অন্য কারও কাছ থেকে জানব। আর কিছু-না-কিছু তো আমরা জানিই।

ক্ষমতা ও নৈতিকতার মনস্তত্ত্ব

সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দা র

কনফুসিয়াস একদিন থাই উপত্যকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখেন একজন বেদনাহত নারী বিলাপ করছে। তিনি তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর সংগী জু-লু কে তার সাথে কথা বলতে বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে মহিলাটি বলল, এখানে আমার শ্বশুরকে একসময় একটা হিংস্র বাঘে হত্যা করেছিল, আমার স্বামীকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল এই বাঘের হাতে। এখন আমার ছেলেকেও একইভাবে হত্যা করেছে বাঘটি। কনফুসিয়াস তখন বললেন, আপনি তাহলে এ জায়গা ছাড়ছেন না কেন? মহিলা উত্তর দিল, 'এখানে অন্তত কোনো অত্যাচারী সরকার নেই তো তাই।' কনফুসিয়াস তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'জেনে রেখো, অত্যাচারী সরকার হিংস্র বাঘ থেকেও ভয়ংকর।'[১]

গল্পটা বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৯৮-১৯৭০) এর। তিনি 'পাওয়ার' (১৯৩৮) গ্রন্থের 'দ্যা টেমিং অব পাওয়ার' অধ্যায় শুরু করেছেন এমন একটা গল্প দিয়ে। সম্পূর্ণ অসহনশীল, সংকীর্ণ, ক্ষমতান্ধ ও বিবেচনাহীন প্রতিক্রিয়াশীল একটা সরকার ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে কিভাবে অন্ধ হয়ে উঠতে পারে তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। সাথে সাথে এই শ্বাসরুদ্ধকর, বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ কল্যাণকামী সুখী-সুন্দর, প্রগতিশীল, স্বাধীন ও উন্নততর নতুন সমাজ কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব তার চমৎকার একটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। আমরা রাসেলের এই প্রস্তাব নিয়ে কথা বলব আলোচনার শেষাংশে। তার আগে দেখব সামাজিক চালিকাশক্তির মূল চাবিকাঠিসমূহ কী-উপায়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করে।

ক. আমাদের দেশে বিগত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (বতিল হয়ে যাওয়া) মোট তিনশটি আসনের জন্য সর্বাধিক সাড়ে চার হাজার প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন, যাদের মধ্যে শতবর্ষী একজন বিপ্লবীও ছিলেন। অবশ্য নির্বাচনপূর্ব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। আর ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি, মনে মনে সুপ্তাকাঙ্ক্ষা ধরে রেখেছেন

এমন ব্যক্তির সংখ্যা নিশ্চিত আরো কয়েকগুণ বেশি হবে। দেশের বিপুল মানুষের এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সদিচ্ছা নজিরবিহীন।

খ. কিছুদিন আগে রাজধানীর একটা অভিজাত হোটেলে এক মোবাইল ফোন কোম্পানির যুতসই নাম্বারের সিমকার্ডের নিলাম হচ্ছিল। নামমাত্র মূল্যের সেই সিমকার্ডের জন্য প্রতিযোগিতার চূড়ান্তপর্বে এক ভদ্রমহিলা চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত এর দর উঠালেন। নিজের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের দৌড়ে অন্য এক ভদ্রলোক পাঁচলক্ষ টাকা দিয়ে সেটা ছিনিয়ে নিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ এর চেয়ে আর কী হতে পারে?

গ. আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারে নোবেল বিজয়ী গণতান্ত্রিক নেত্রী ওং-সান-সুকী গত দেড় দশক ধরে সামরিক শাসকের রোষানলে পড়ে গৃহবন্দী অবস্থায় দুঃসহ জীবন যাপন করছেন। সরাসরি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদর্শনের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এটা জলজ্যান্ত উদাহরণ।

উপরের উদাহরণগুলো মানুষের ক্ষমতা প্রকাশের নানা দিক। কোনোটা রাজনৈতিক, কোনোটা অর্থনৈতিক আবার কোনোটা বল প্রয়োগের। অবশ্য আধুনিক মানুষ সবচেয়ে বেশী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছে জড়বস্তুর ওপর। বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণিকার ওপর মানুষের সফল শক্তিপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রকাশ। পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম উন্নয়ন এর দৃষ্টান্ত। আসলে ক্ষমতা মানবজীবনের অত্যন্ত মৌলিক ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর অন্যতম। সামাজিক চালিকাশক্তির মূল চাবিকাঠি, ফ্রয়েড যেখানে খুঁজে পেয়েছিলেন যৌনতার মধ্যে; মার্কস সেখানে খুঁজে পেয়েছেন সম্পদের মধ্যে; রাসেল সেখানে যথার্থই খুঁজে পেয়েছেন ক্ষমতার মধ্যে।

আদিম সমাজ থেকে অদ্যাবধি সব মানুষের জন্যই ক্ষমতা অতি লোভনীয়, প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বরং সমাজ যত জটিল হয়েছে, চিন্তার নানা ক্ষেত্র যতটা প্রসারিত হয়েছে ক্ষমতার উপাংগ ততটাই মানুষকে আচ্ছাদন করেছে। ক্ষমতার প্রতি উদগ্রবাসনা মানুষকে এতটাই মোহাবিষ্ট করছে যে, অনেক সময় মানুষকে ইতর শ্রেণীর প্রাণী থেকে পৃথক করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। কেননা পৃথিবীতে আজ অবধি যতটা রক্তপাত হয়েছে তার সিংহভাগ ঘটেছে ক্ষমতা প্রদর্শনের ভয়ংকর অশুভ প্রতিযোগিতার জন্য।

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে এই মৌলিক প্রবৃত্তির একটা মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা দেব এবং দেখাব একটা উন্নততর, সুখী-সুন্দর, কল্যাণকামী ও মানবিক সমাজ গড়তে এই প্রবৃত্তির ওপর নৈতিকতা স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন মানবপ্রবৃত্তির একটা নির্মোহ ব্যাখ্যা হাজির করা।

দুই

বিবর্তনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে মানুষ আপাতত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জান্তব স্তর অতিক্রম করে সে যতই সামনে এগিয়েছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তার আত্মমর্যাদা বোধ, বেড়েছে স্বতন্ত্রতা। মানুষ বিস্তৃত হতে চেয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। উপলব্ধি করেছে তার নিজের স্বার্থেই জোটবদ্ধ হয়ে থাকা জরুরী। জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা। কেননা এই জটিল জীবন যাপনের জন্য দরকার অন্যের সহযোগিতা, প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য। তবে মজার ব্যাপার হল, মানুষের মধ্যে আছে অদ্ভুত রকমের দুটি ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য। একদিকে রয়েছে সামাজিক চরিত্র অন্যদিকে নিঃসংগতা। মানুষ সম্পূর্ণরূপে সামাজিকও নয় আবার নিঃসংগও নয়। যদি পুরোপুরি সামাজিক হতো তাহলে সম্ভবত নৈতিকতার দরকার পড়ত না। কারণ মৌমাছি কিংবা পিপড়া এতটাই সামাজিক বোধে উদ্বুদ্ধ যে, সামাজিক প্রণোদনার বাইরে তারা কোনোকিছু করার প্রয়োজন অনুভব করে না। অন্যদিকে মানুষ যদি পুরোপুরি নিঃসংগ হতো তাহলেও নৈতিকতা তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ত। রাসেল এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন–

> Man is more complex in his impulses and desires than any other animal, and from this complexity his difficulties spring. He is neither completely gregarious, like ants and bees, nor completely solitary, like lions and tigers. He is a semi-gregarious animal.'[2]
>
> যেহেতু মানুষ আধা-সামাজিক প্রাণী তাই তার দরকার পড়েছে ভীষণভাবে নীতিবোধ।

মানব প্রকৃতি অতি বিচিত্র ও জটিল। অতিকায় অজগর সাপ যেমন আহারান্তে ঘুমিয়ে পড়ে এবং পরবর্তী ক্ষুধাবোধের আগ পর্যন্ত যেমন অন্যকোনো দিকে মন দেয়না, মানুষ কিন্তু মোটেও সে রকম প্রাণী নয়। মানুষের অতি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মিটে গেলে সে ধাবিত হয় অন্য কোথাও। আসলে মানুষের সকল কাজের মূলে থাকে তার প্রবৃত্তির তাড়না। তবে মানুষ শুধুমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি থাকত তাহলে মনুষ্যসমাজের সাথে গিনিপিগ বা কুমিরের আস্তানার পার্থক্য থাকত না। মানুষের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি তার জীবন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না এবং বুদ্ধির তাগিদ– এই দুয়ের নিরন্তর মিথষ্ক্রিয়ার জন্যই প্রয়োজন হয়েছে নৈতিকতার।

মানুষের সমগ্র প্রবৃত্তি যেহেতু অতি জটিল, সে কারণে তার গোটা প্রবৃত্তিকে জানতে হলে তার নানা খণ্ডাংশকে জানা দরকার। মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– (ক) শরীর বৃত্তীয় বা মৌলিক প্রবৃত্তি ও (খ) সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি।

মৌলিক প্রবৃত্তিগুলো প্রায় সব জায়গায়, সব মানুষের ক্ষেত্রেই সমান। খাদ্য, বস্ত্র, উষ্ণতা কিংবা যৌনাকাঙ্খা নিবৃত্তির জন্য পৃথিবীর নানা জায়গার মানুষের মধ্যে বেশি

একটা তারতম্য লক্ষ করা যায় না। মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য হল এগুলোকে মানুষ কোনোক্রমে প্রশমন করতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য সে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র জীববৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকতে নারাজ। এই সংকীর্ণ গণ্ডির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মধ্যেই তার স্বার্থকতা। কবি যখন বলেন, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' তখন বোধকরি মানুষের সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যকেই ইংগিত করা হয়। মানুষ যখন অতি ব্যয়বহুল বাসস্থান নির্মাণ করে তখন তার উদ্দেশ্য, যতটা আরামপ্রাপ্তির তা থেকে অনেক বেশী সম্ভবত অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের। তাজমহল নির্মিত হয়েছে শুধু একটা চমৎকার স্থাপনা নির্মাণের জন্যই নয় বরং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নির্মাতার অপূর্ব শৈল্পিক মানসিকতা আর অদ্ভুত শিল্পনিদর্শনের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকার ইচ্ছা।

মানুষের জটিলতর মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনোবৃত্তির মধ্যে। তার আগ্রহ ব্যক্তিমানুষ থেকেও সামাজিক মানুষের মধ্যে বেশি। মানুষ চেয়েছে নিজেকে সম্প্রসারণ করতে, চেয়েছে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকতে। নিজের কর্তৃত্ব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আপন সৃষ্টিকে রেখে যাওয়ার মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে নিজের স্বার্থকতা। নিজের দৈহিক বিনাশের পর অন্যের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাওয়ার মধ্যেই মানুষ কামনা করেছে সন্তানকে। যাজ্ঞবল্ক্য তাই গার্গিকে বলেছেন–

> 'ন বৈ অরে পুত্রানাম কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনংঃ তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বৈ অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি।' [৩]

> 'পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশত পুত্রগণ প্রিয় হয় না। আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি প্রীতিবশত বিত্ত প্রিয় হয় না। আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। মানুষ নিজেকে তার পুত্রের মাঝে অনুভব করে এ কারণে পুত্রগণ তার আত্মীয়।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। কোনোক্রমেই তা স্থায়ীভাবে তৃপ্তিযোগ্য নয়। কোনো তৃপ্তিই বেশীক্ষণ স্থায়ী নয়। গণ্ডিহীন অসীমের প্রতি তার আগ্রহ। ক্রমবর্ধমান অতৃপ্তিই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সামনে, গন্তব্যহীন অজানাপথে। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবণতাকে মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করা চলে। এগুলো হল– অধিকারলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যশলিপ্সা ও ক্ষমতানুরাগ।[৪]

সম্পদের প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রায় সবটাই সহজাত। তবে সম্পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এই আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। অল্পকিছু বৈরাগ্য মানুষ বাদ দিলে সমস্ত মানুষের মধ্যেই এই আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। ছোট্ট শিশু থেকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটা মানুষের মাঝেই বস্তুগত অথবা অবস্তুগত সম্পদের নেশা মারাত্মক। মানুষকে কত সম্পদ দিলে সে সন্তুষ্ট হতে পারে এর সদুত্তর নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনীকেও যখন আরো সম্পদের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্রানুসন্ধান করতে বিশ্বভ্রমণে বেরোতে দেখা যায় তখন

বিস্ময়ের আর জায়গা থাকে কোথায়? দুর্ভিক্ষকবলিত এ স্তেনিয়া থেকে চরম অনাহারে থাকা ছোট্ট দুটো শিশুকে রাসেল একবার তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারা পর্যাপ্ত খাবার আর চমৎকার পরিবেশ পাওয়ার পরও সুযোগ পেলেই পাশের ক্ষেতে যেত আলু চুরি করতে। নিউটন যখন ট্রিনটিতে ফেলো ছিলেন তখন তার বস্তুগত সুখের কমতি ছিল না। তারপরও তিনি 'প্রিন্সিপিয়া' লিখেছিলেন। মোটকথা সম্পদ, তা সে বস্তুগতই হোক কিংবা অবস্তুগতই হোক তার জন্য মানুষের মরণপণ কামনা থাকবেই।

মানুষ শ্রেষ্ঠত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, চিন্তায়, সম্পদে, মননে, মগজে, শরীরে, পার্থিব, অপার্থিব সবখানে, সব এলাকায়। নিজের শ্রেষ্ঠ হওয়ার বাসনা তার জন্মগত। অন্য দশজন থেকে সে যে পৃথক সেটা প্রমাণ করার বাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মূল ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে।

যশের প্রতি ইচ্ছা কার নেই? ছোট্ট শিশুরাও ভয়ংকরভাবে নিজের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। মানুষকে অনেক সময় বলতে শুনেছি, জীবদ্দশায় তো স্বীকৃতি পেলাম না মৃত্যুর পরে যদি সবাই সেটা উপলব্ধি করে। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ইউনুস বলেছিলেন, এই স্বীকৃতি আমাদের বুককে আরও স্ফীত করল, আমরা এখন থেকে যেন অনেক বড় মানুষ হয়ে গেছি। রেনেসাঁকালে মৃত্যুপথযাত্রী ইতালির এক যুবরাজকে একজন যাজক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার কোনো কিছুর জন্য অনুতাপ করার আছে কিনা। উত্তরে যুবরাজ বলেছিল, একটা বিষয় তাকে আজও পীড়া দেয়, একদিন সুউচ্চ অট্টালিকার ওপর রাজা ও পোপকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজও অনুতাপ করি তাদের দুজনকে একত্রে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দেওয়ার জন্য। যদি তা করতাম তাহলে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতাম। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যতবেশী আলোচনা হয় সে তত বেশি আলোচিত হতে চায়। রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিল্পীরা প্রত্যেকেই চান তাদের নিয়ে আলোচনা হোক, ছড়িয়ে পড়ুক খ্যাতি আর কীর্তির কথা। এমনকি জঘন্য খুনিও চায় তাকে নিয়ে মিডিয়াতে যেন বেশি-বেশি আলোচনা হয়। তাকে নিয়ে কম আলোচনা হলে সেও ক্ষুব্ধ হয়।

মানুষের মাঝে এ আকাঙ্ক্ষাগুলো সমানভাবে ক্রিয়াশীল হলেও সম্ভবত সবচেয়ে তীব্র এবং জটিল হল মানুষের ক্ষমতানুরাগ। অন্যান্য ইচ্ছাকে যদিও স্বতন্ত্র মনে হয় কিন্তু তা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতানুরাগের সাথে সম্পৃক্ত। যশের প্রতি মানুষের ইচ্ছা অতি প্রবল। কিন্তু মানুষ শুধু যশের মধ্যে সীমিত থেকেছে এমন উদাহরণ কম। চিত্রতারকারা অতি জনপ্রিয় কিন্তু তাদের ক্ষমতা কম। অনেক সময় দেখা গেছে যশের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করে তারা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফুটবল বা ক্রিকেট তারকারাও নিজেদের মাঠ ছেড়ে প্রায়শই রাজনীতির মাঠে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে চিত্রতারকারা অত্যন্ত যশাধিকারী কিন্তু 'কমিটি ফর আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিজ' এর মতো অখ্যাত প্রতিষ্ঠানও এদের খ্যাতির অবসান ঘটাতে পারে। ইংল্যান্ডের রাজার মতো আমাদের দেশেও রাষ্ট্রপতির সম্মান অনেক বেশি যদিও তার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর

তুলনায় কম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। ১৮১৪ সালে বুচার নেপোলিয়ানের প্রাসাদগুলো দেখে নাকি বলেছিলেন, এতকিছুর অধিকারী হয়েও যে মস্কোতে অভিযান চালিয়েছিল সে কী বোকাই না ছিল। প্রশ্ন হল মানুষ বহুকিছুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন ক্ষমতানুরাগী হয়? ক্ষমতার উদগ্র বাসনা কেন মানুষকে তাড়িত করে? এজন্য আমাদের দেখতে হবে ক্ষমতা কাকে বলে?

তিন

'Power refers to a capacity that A has to influence the behavior of B, so that B acts in accordance with A's wishes. 5

ক্ষমতা হল বিশেষ ধরনের শক্তি যা অন্যকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত ব্যক্তি যতটা প্রভাবকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে ততই প্রভাবকের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। ক্ষমতা ব্যবহারকারীকে নেতা পক্ষান্তরে যার ওপর ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে তাকে কর্মী বা জনতা বলা যেতে পারে। এ কারণে ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নির্ভরতা। কর্মী বা জনতা নেতার ওপর যতটা নির্ভরশীল হয় ততই নেতার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

অসংখ্য মানুষের মধ্যে কে ক্ষমতাবান বেশি, এটা নির্ণয় করা শক্ত। ক্ষমতা নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি তার উদ্দিষ্ট ফলাফল। এ কারণে ক্ষমতা অনেকটাই সাংখ্যিক ধারণা। দুজন ব্যক্তির যদি একই ধরনের প্রত্যাশা থাকে এবং এদের একজন যদি একের পর এক প্রত্যাশাগুলো পূরণ করে চলে তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ ব্যক্তি বেশি ক্ষমতাবান। ধরা যাক দুজন চিত্রশিল্পীর ইচ্ছা ছিল তারা উভয়ই অনেক বড় শিল্পী হবেন এবং এর মধ্য দিয়ে হয়ে উঠবেন ধনী। বাস্তবে দেখা গেল এদের একজন হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট শিল্পী, তিনি ধনী হলেন না। অন্যজন হয়ে পড়লেন ধনী কিন্তু তিনি শিল্পী হলেন না। প্রশ্ন হল এদের কে বেশী ক্ষমতাবান? এ প্রশ্নের উত্তর অতি জটিল। তবে এটা বলা যায়, প্রথমজন দ্বিতীয়জন থেকে বেশি ক্ষমতাবান। কারণ প্রথমজন দ্বিতীয়জন থেকে বেশি উদ্দিষ্ট ফলাফল লাভ করেছে।

ক্ষমতার রয়েছে নানাদিক। বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে থাকে। J.R.P French Ges B. Raven 'স্টাডিজ ইন সোস্যাল পাওয়ার' গ্রন্থে ক্ষমতার পাঁচটা ভিত্তির উলেখ করেছেন– দমনমূলক, পুরস্কারমূলক, বৈধ, দক্ষ ও আরোপণমূলক। [৬]

দমনমূলক বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রকাশের প্রধান অস্ত্র ভয়, ভীতি ও অস্ত্র। এই ধরণের ক্ষমতাকে নগ্নতা বলেও অনেকে অভিমত দিয়েছেন। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি পরিচিত। পৃথিবীর নানাদেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে শাসকেরা বিশেষ করে সমর নায়কেরা এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন। আমরা পশুর ওপর যেভাবে বল প্রয়োগ করি, রাজনীতিতে অনেক সময় এই ধরনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। শুকরকে টেনে-হিঁচড়ে জাহাজে তোলা কিংবা গরুকে শক্তি প্রয়োগ করে ট্রাকে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা এ ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করি। অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখন অধস্তনদের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

প্রয়োগ করে তখন ঐ কর্মকর্তার ক্ষমতাকে দমনমূলক ক্ষমতা বলা যেতে পারে। যে কর্মকর্তা তার অধস্তনদের মুহূর্তে চাকরিচ্যুত করতে পারে, বেতন কর্তন করতে পারে, বহিষ্কার করতে পারে সে কর্মকর্তার এই ধরনের ক্ষমতা তত বেশি।

দমনমূলক ক্ষমতার ঠিক বিপরীত পুরস্কারমূলক ক্ষমতা। গাধার সামনে মুলো ঝুলিয়ে তাকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করিয়ে নেওয়ার মতো এ ধরনের ক্ষমতা প্রলোভনমূলক। এভাবে ক্ষমতা প্রকাশের উদ্দেশ্য চাতুরীপনা ও ছলনায় পূর্ণ। এখানে থাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা, থাকে আরো কিছু পদক্ষেপ। যেমন– কর্মীদের বোনাস, পদোন্নতি ইত্যাদি। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুরস্কারমূলক ক্ষমতার ব্যবহার বেশি লক্ষ্যণীয়।

কোন দল বা সংগঠন পরিচালনার জন্য তার অভ্যন্তরে পদসোপান অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধীনস্তদের যে আদেশ দিয়ে থাকেন তার মধ্যদিয়ে বৈধ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন অথবা ব্যাংক পরিচালকরা যথাক্রমে শিক্ষক, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কিংবা ব্যাংকারদের যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাকে বৈধ ক্ষমতা বলে। বৈধ ক্ষমতা যেকোনো সংগঠন পরিচালনার জন্য অতি জরুরী। সংগঠনের শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য বৈধ ক্ষমতার প্রয়োগকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

এক্ষেত্রে দক্ষতার প্রভাব সর্বাগ্রে বিবেচ্য। সম্ভবত পৃথিবীতে এই ধরনের ক্ষমতা অতি শ্রদ্ধেয়। বর্তমান শতাব্দীতে যারা প্রাযুক্তিক জ্ঞানে এগিয়ে আছে তারাই সবচেয়ে শক্তিধর। একইভাবে কম্পিউটার কুশলী, শিল্প-মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ অথবা প্রকৌশলীদের সমাদর সবখানে। এদের মেধা, মনন, দক্ষতা ও কুশলতার কারণে এরা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। সমাজ-সংগঠনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাই এদের সবচেয়ে বেশী।

আমরা যাদের বেশি পছন্দ করি সাধারণত তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। তাছাড়া আমাদের ওপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টাকে আমরা অসহ্য মনে করি না বরং এটা উপভোগ করি। যাজকীয় ক্ষমতাও এ ধরনের। অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের ওপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তাও এই রকমের। এ ধরনের ক্ষমতার আরেক নাম আরোপণমূলক ক্ষমতা।

কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) মনে করেন মানুষের সমগ্র তাড়না পরিচালিত হয় সম্পদের জন্য। মার্কস বলেন, অর্থনীতি হল সমাজের ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে চিন্তাশক্তি, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন বা অন্যান্য মতাদর্শ, যাকে বলা হয় উপরিকাঠামো। মার্কস বিশ্বাস করেন ভিত্তি উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবশ্য মার্কসের সমালোচকেরা মার্কসীয় দর্শনকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ বলে নিন্দা করেছেন। রাসেল মার্কসের এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে অজ্ঞতামূলক অনুর্বর ভাবনা বলে তীব্র আক্রমণ করেছেন। [৭] রাসেল মনে করেন মার্কস মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষের জীবনের উপায় আর লক্ষ্য মার্কসের হাতে এসে

উল্টিয়ে গেছে। মানুষ সম্পদ প্রাপ্তির আকাংখা করে সত্য কিন্তু সেটা যদি ক্ষমতা থেকে পৃথক কিছু হয় তাহলে তা হয়ে পড়ে সীমিত। তাঁর নিজের কথায়–

> The desire for commodities, when separat
> from power and glory, is finite, and can be fully satisfied by
> a moderate competence. The really expensive desires are not
> dictated by a love of material confort.' [৪]

মানুষের সম্পদ চাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে তবে সেখানে কোনো সীমানার গণ্ডি নেই। এবং সেটা হল সম্পদের মধ্যদিয়ে অন্যান্য জিনিসের আকাঙ্খা। এ ধরনের রাসেলীয় চিন্তাও সমালোচনাযোগ্য। কেননা আমরা জানি জীবন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন থাকলেও তার নিশ্চয় একটা সীমা আছে। বর্তমান পৃথিবীতে ধনী ব্যক্তিদের অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী একটা র‍্যাংকিং হয়। তাতে আমরা দেখেছি যে বিপুল সম্পদ এক এক মানুষ জোগাড় করেন তা শুধু অর্থের জন্যই অর্থ সংগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। কেননা এগুলো জীবন নির্বাহের জন্য শুধু অতিরিক্তই নয় অর্থহীনও বটে। এদের অনেকেই কোনো ধরনের রাজনৈতিক কামনা চরিতার্থ ছাড়াই পিঁপড়া বা মৌমাছির মতো শুধু সম্পদ জোগাড় করেই চলে। তাহলে মানুষের লক্ষ্য ও উপায় নির্ধারণে মার্কসের দোষ কোথায়? তবে অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যেসব মানুষ জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে অর্থকে বেছে নিয়েছে এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে তাদের চূড়ান্ত চাওয়াটা আসলে অর্থ নয়। বরং অর্থের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ যশাধিকারী হওয়া। এক্ষেত্রে অর্থকে তারা প্রকারান্তরে উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় উল্টো। বিশেষভাবে বলা যায় এসব ক্ষেত্রে শুধু অর্থ নয় বরং তাদের লক্ষ্য আর্থিক ক্ষমতা অর্জন। শক্তির যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রকাশরূপ আছে তেমনি ক্ষমতারও নানারকম দিক আছে। যেমন– অর্থ, অস্ত্র, রাজনীতি, মতামতের ওপর প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি। এগুলোর কোনোটাই কোনোটির অধীনস্থ নয়, বরং এগুলোর একটির সাথে অন্যটির আছে নিবিড় সম্বন্ধ। মানুষের ক্ষমতাকে মোটাদাগে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, সৃজনশীল ক্ষমতা; দুই, ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা।

মানবসভ্যতার যে জায়গার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে পিছনের দিকে তাকালে আমরা দেখব মানুষের অপূর্ব দক্ষতা, কৌশল, মেধা, মনন, তথা সৃজনশীল ক্ষমতা তাকে আজকের এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে ক্ষমতা যখনই রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে, অর্থের সাথে যুক্ত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে প্রচার-প্রপাগান্ডার সাথে তখনই বেরিয়ে পড়েছে ক্ষমতার হিংস্র চেহারা। আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ক্ষমতার এই উলঙ্গ চেহারা অনেকাংশে আতঙ্কিত করেছে মানবতাকে। তাই ভীষণভাবে মানুষ উপলব্ধি করেছে নৈতিকতার প্রয়োজনের কথা।

চার

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছেন দার্শনিক পেটো (খ্রী. পূ. ৪২৭-৩৪৭)। তিনি তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থটি রচনা করেছেন এমন এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মাথায় রেখে। পেটোর মাতৃভূমি এথেন্স পিলোপনেশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভয়ংকরভাবে বিশৃংখল হয়ে ওঠে। নাগরিকরা হয়ে পড়ে অসহায় ও সম্বলহীন। তখন অধঃপতিত গণতন্ত্র থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য তিনি গভীরভাবে ভাবতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তিনি এমন একটা প্যারাডাইমের প্রস্তাব করেন যেখানে রাষ্ট্রের জনগণ সর্বাধিক শান্তিতে বসবাস করতে পারে; রাষ্ট্রনায়কেরা যাতে কোনোমতেই জনগণের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হতে না পারে।

> The nominal purpose of the Republic is to define 'justice'. But at an early stage it is decided that, since everything is easier to see in the large than in the small, it will be better to inquire what makes a just state than what makes a just individual. And since justice must be among the attributes of the best imaginable state, such a State is first delineated; and then it is decided which of its perfections is to be called 'justice'. [9]

প্লেটো রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উৎপাদক, দেশরক্ষক ও শাসক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতিটা নাগরিকের তিনটি গুণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন; এগুলো হল– বুদ্ধি, বীর্য ও কামনা। একটা আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য যেমন এই তিন ধরনের মানুষের সমন্বয় দরকার তেমনি প্রতিটা মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে এই তিনটা গুণ। অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শাসক শ্রেণী। কেননা শাসকরা হবেন অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন, বিচক্ষণ আর প্রাজ্ঞ। মোটকথা দার্শনিকরাই হবেন রাষ্ট্রের শাসক।

প্লেটোর প্রস্তাবনা ছিল ইউটোপিয়া; এ ধরনের আদর্শ রাষ্ট্র আদৌ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক চলে আসছে হাজার বছর ধরে। আমরা সেই বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি আদর্শ রাষ্ট্র পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও কোনো রাষ্ট্র এর কাছাকাছি যতটুকু পৌঁছাবে সে রাষ্ট্র ততটুকুই কল্যাণমূলক হয়ে উঠবে। তবে সবকিছুকে বাদ দিলেও দার্শনিক রাজার প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের উপলব্ধি করতেই হবে। প্লেটো এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> 'দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থী যদি দীর্ঘদিন দর্শনের শিক্ষা ও আলোচনায় অতিবাহিত করে, তাহলে তার অন্তরে হয়ত সত্যের আলো আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং একবার উদ্ভাসিত হলে অন্তর থেকে অন্তরে সে আলো বিস্তার লাভ করবে। জ্ঞানের আলো একবার

প্রজ্জ্বলিত হলে আলোই আলোর ইন্ধন যোগাবে, তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখবে।' [১০]

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে দর্শন জানতে হবে যাতে করে সে রাষ্ট্র পরিচালনায় একদিকে হবে দক্ষ ব্যবস্থাপক অন্যদিকে তার থাকবে অসীম প্রজ্ঞা। গুকণের এক প্রশ্নের জবাবে সক্রেটিস (আদতে এটি প্লেটোর কথা, কারণ রিপাবলিকে সক্রেটিস চরিত্রের মাধ্যমে প্লেটো তার নিজের কথাই বলেছেন) বলেন–

> 'যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের 'রাজা' না হবে কিংবা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের 'রাজাগণ' যতক্ষণ দার্শনিকের ভাব এবং শক্তিতে সমৃদ্ধ না হবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক-শক্তি এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে সম্মিলন না হবে এমনকি যারা রাষ্ট্রকে শাসন করতে যেয়ে এই দুই গুণের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চর্চা করার নীতি অনুসরণ করবে এবং তাদের রাষ্ট্র শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হবে, ততক্ষণ কোনো নগরী যেমন তার বর্তমান দুঃশাসন থেকে মুক্ত হবে না, তেমনি মানব জাতিরও মঙ্গল সাধিত হবে না।' [১১]

প্রশ্ন উঠতে পারে কাকে আমরা দার্শনিক বলব? এর উত্তরে প্লেটো বলেন দার্শনিকরা হবে জ্ঞানের প্রেমিক। সত্য বা পরম সম্পর্কে যাদের শুধুমাত্র ধারণা থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে জ্ঞান। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিই পারে অলংঘনযোগ্য ভয়ংকর প্রবৃত্তিকে নৈতিকতার চাদরে আচ্ছাদন করতে। এবং কীভাবে সম্ভব আমরা তা দেখব পরবর্তী অংশে।

পাঁচ

মানুষ দুটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ। একদিকে তার মাঝে আছে ঈর্ষা, ঘৃণা, কপটতা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতিহিংসা, প্রতিযোগিতা, ক্রোধ, জিঘাংসার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে আছে মানবিকতা, মূল্যবোধ, প্রেম, সৃজনশীলতা এবং আত্মত্যাগের মতো পরম মংগলময় বৈশিষ্ট্য। মানুষ তখনই মানবিক হয়ে আবির্ভূত হয় যখন তার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে ইতিবাচক প্রবৃত্তি পরাস্ত করে। মানুষের প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং নৈতিক শিক্ষা, আইন, মনোভাব, প্রেষণা এবং প্রেমের দ্বারাই তা ঘটতে পারে। দার্শনিক কান্ট মনে করতেন মানুষ পরিচালিত হবে তার কর্তব্যের বোধ দ্বারা। যে কাজ সম্পূর্ণরূপে সদিচ্ছা ও নীতি দ্বারা চালিত হবে কেবলমাত্র সে কাজই কর্তব্যসম্মত হবে। এ কারণে শর্তহীনভাবে একমাত্র সদিচ্ছাই শুভ বা ভালো। আমরা এরপর লক্ষ্য করতে চাই মানুষের এই ধরণের কর্তব্যবোধ কীভাবে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। কীভাবে তার সৃজনশীল প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করা যায়।

এক, ক্ষমতার প্রতি সীমাহীন বাসনা মানুষকে পশুবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিক জীবনবোধ; হারিয়ে ফেলে মানুষের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক। ক্ষমতার অব্যাহত ব্যবহার মানুষকে করে তোলে হিংস্র।

পক্ষান্তরে মানুষের মাঝে যে সমস্ত নীতিবোধ থাকে, নৈতিক শিক্ষা তাকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে নিজের কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত করে। মানুষের জন্য শিক্ষা দরকার দুটি কারণে; আত্মিক উন্নয়ন ও বস্তুগত সুখ প্রাপ্তি। অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা প্রাযুক্তিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার দরকার। তবে এই ধরনের শিক্ষার মধ্যদিয়ে সমাজের ইট, কাঠ, পাথরের উন্নয়ন হয়, ক্ষুধা নিরসন হয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সুবিধার বৃদ্ধি ঘটে। সর্বোপরি এপথেও বস্তুগত সুখের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। কিন্তু নীতিশিক্ষাবিহীন মানুষ অনেকটা তলোয়ারবিহীন যোদ্ধার মতো। রাসেল 'কেন আমি খ্রিস্টান নই', 'কেন আমি কমিউনিস্ট নই' ইত্যাদি লিখেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি যদি 'কেন আমি নৈতিক নই' লিখতেন তাহলে সারা জীবনে শুধু ঘৃণাই পেতেন। প্রশ্ন হল মানুষ কীভাবে নৈতিক হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেছেন অব্যাহত নৈতিকতার চর্চার ফলে নৈতিক শিক্ষা মজবুত হয়। বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় নৈতিকতার দু'চারটা কথা শুনলেই মানুষ নৈতিক হয়ে উঠতে পারে না। নিরন্তর অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্যদিয়ে নৈতিক শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে। নৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিতর দিয়ে মানুষ ছোটবেলা থেকেই শিখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, পরবর্তীকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সে ঐ কাজ করতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

নৈতিকভাবে শক্ত মানুষ কোনো ধরনের প্রলোভন, সুবিধা ও আকস্মিক সুযোগ গ্রহণ করেন না– এর অনেক প্রমাণ আছে। পত্রিকায় দেখেছি রিকশাচালক, যাত্রীর ফেলে যাওয়া একলক্ষ টাকার ব্যাগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার ফলে প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করার অনেক উদাহরণ আমাদের জানা আছে। অনেকে ভাবতে পারেন আমরা কেন নৈতিকভাবে কাজ করব? যার জবাব হল, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আমরা অনৈতিকভাবে কাজ করলে সামাজিক বিশৃংখলা মানুষকে গ্রাস করতে পারে, মানুষ হারিয়ে যেতে পারে চরম অনিশ্চয়তা আর নৈরাজ্যে। যদিও নৈতিকতা-অনৈতিকতার প্রশ্নে মানুষ কোনোদিনই একমত হতে পারেনি। তবুও যে নির্দেশনা সমাজের সর্বাধিক দীর্ঘকালীন মংগল বয়ে আনে তা কোনভাবেই পরিতাজ্য হওয়া সঠিক নয়। কেননা মানুষই পারে তার নিজস্ব প্রজাতির মংগল কামনা করতে পারে বুদ্ধি দিয়ে, যা প্রবৃত্তির তাড়নায় হওয়া সঠিক নয়। অন্যান্য প্রাণীর সে ক্ষমতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনুপস্থিত। সর্বোপরি মানুষের প্রয়োজন একটা সার্বজনীন নৈতিকতার। এ হিসাবে নীতিশিক্ষার মূল দর্শনটা একেবারেই নিরেট, নিচ্ছিদ্র ও ইস্পাত-কঠিন।[১২]

দুই, নৈতিক শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষকে আইনী করে তোলে। আর আইন মানুষকে যেহেতু শাস্তি অথবা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে সুশৃংখল করার চেষ্টা করে তাই মানুষ পুরোপুরি নৈতিক হয়ে পড়লে সম্ভবত আইনের প্রয়োজন পড়বে না । যে সমাজে যতটা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সমাজে বৈষম্য ততটা কম, মানুষের দুর্নীতির প্রবণতাও ততটা অল্প। আইন মানুষকে নৈতিক করে তোলে না আবার

বিশৃংখল, নৈরাজ্য থেকেও বিরত রাখে। যেকারণে শুধু আইননির্ভর রাষ্ট্রীয় সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নানা বিষয় উল্লেখ থাকে, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিস্তৃত নির্দেশনা দেওয়া থাকে কিন্তু নৈতিক হয়ে ব্যক্তির গড়ে ওঠার কোনো পরামর্শ থাকে না।

তিন, সামাজিক মনোভাব ও পারিপার্শ্বিক চাপ মানুষকে বদলাতে সহায়তা করে। নীতিহীন, অসাধু, অসৎ মানুষ যদি সর্বত্র ঘৃণা পেতে থাকে তাহলে মানুষের পরিবর্তন হতে বাধ্য। কেননা মানুষ সবসময় মূল্যায়িত হতে চায় সমাজের আয়নায়। তবে সেক্ষেত্রে সামাজিক সমতা বেশি দরকার। কেননা অসৎ, কপট, হীন ও নীচু মানুষগুলো যে সমাজে বেশি আদৃত হয় সেখানে ব্যক্তিক নৈতিকতা হোঁচট খায়। এজন্য সামগ্রিকভাবে যদি সবাই নৈতিকতার মনোভাব পোষণ করে তাহলে আশানুরূপ ফল ফলবেই একথা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়।

চার, বহুকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে আজ প্রমাণিত হয়েছে অহিংসা, প্রেম, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, করুণা, দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য্যের ওপর কোনো মানবিক গুণ নেই। মূল কথা হল, এই পৃথিবীটাকে চমৎকারভাবে চলতে দিতে গেলে পশুবৃত্তির দমন করতেই হবে। সমাজ-সংসারসহ সব ধরনের সম্পর্ককে কল্যাণমুখী করতে হলে অহিংসার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র প্রেমের ভিতর দিয়ে মানুষ সুখী হতে পারে। সহযোগিতা কিংবা দয়ার ভিতর যে আনন্দ আছে পৃথিবীর কোনো অশুভ প্রতিযোগিতায় সেটা নেই। হিংসা, জিঘাংসা, অধিকারলিপ্সা অথবা আধিপত্যবোধের ভিতর দিয়ে অপ্রেম প্রকাশিত হয়। মানুষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হিংস্র হয়ে উঠলে ক্রমে ভেঙে পড়ে মানবিকতার সব কাঠামো। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী এ-সত্য স্বীকার করেন। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, আইনস্টাইন, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, টলস্টয় সবাই এই প্রেমধর্মের ওপর জোর দিয়েছেন।

ছয়

গণতন্ত্র হল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বাধিক জনপ্রিয় প্যারাডাইম। এত জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভবত একটাই কারণ, যে-সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের প্রাণ তারা এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে সর্বাধিক স্বতন্ত্রতা উপভোগ করতে পারে। এই ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ব্যক্তির সর্বাধিক চাওয়া রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারে এবং সরকার জনগণের কাছে সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এ বাদেও আরেকটা বিষয় সম্ভবত মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে– গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্র সবার একান্ত কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

তবে প্লেটো মনে করতেন গণতন্ত্র নীতিহীন সংখ্যাধিক্যের শাসন। জ্ঞান, সম্মান বা অর্থ কোনোটাই গণতন্ত্রের আদর্শ নয়। আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বিচ্যুতি ঘটলে একের পর এক রাষ্ট্রগুলোর অধঃপতন হয়। অধঃপতনের প্রায় শেষ পর্যায়ে গণতন্ত্রের অবস্থান। রাসেলও অনেকটা মনে করেন যারা ইতিহাস আর মানব চরিত্রের খবর রাখেন তারা

সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন গণতন্ত্র মোটাদাগে সমস্যা সমাধান করতে পারলেও তা একমাত্র সমাধান নয়। কেননা গণতন্ত্র সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর জন্য দরকার মোট চারটি শর্তের সমন্বয়। এগুলো হল– ১. রাজনৈতিক শর্ত; ২. অর্থনৈতিক শর্ত; ৩. প্রচারমূলক শর্ত এবং ৪. মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শর্ত। [১৩] এগুলো বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা একটু দেখতে চাই রাষ্ট্রীয় আদর্শটা কেন ব্যক্তিক আদর্শের ওপর নির্ভরশীল হবে।

ব্যক্তি হল রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। ব্যক্তিক নীতিবোধটাই রাষ্ট্রীয় বৃহৎ আঙ্গিকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিক চাওয়া মেটানোর জন্য যে-সুযোগ থাকে, রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পৌঁছে সে-সুযোগ অনেকগুণ বেড়ে যায়। এ কারণে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন ব্যক্তিক চাওয়ার সর্বাধিক মূল্য দেওয়া। রাসেল লিখেছেন–

> Political ideals must be based upon ideals for the indi vidual life. The aim of politics should be to make the lives of individuals as good as possible. There is noth ing for the politician to consider outside or above the various men, women and children who compose the world. [14]

আর যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে সর্বাধিক উপযোগ মেটানো সম্ভব, তার শর্তগুলো হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রচারমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শর্তের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া যায়; তা হল, রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনস্তাত্ত্বিক দিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিস্তেজীকরণের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার; কারণ ক্ষমতা যদি জনগণের মনস্তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, তাহলে মানুষ অন্ধভাবে তাদের নেতাকে অনুসরণ করতে থাকে। মানুষ নেতার প্রতি অতি আবেগের কারণে অন্যদের প্রতি হয়ে ওঠে হিংস্র। একারণে প্রকৃত গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে, মানুষের উন্মাদনাকে হ্রাস করতে দরকার রাষ্ট্রীয় সার্বজনীন নৈতিকতার। সে নৈতিকতা রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তথ্যপঞ্জী

১. Power A New Social Analysis; Bertrand Russell, Rutledge P. 186
Human Society in Ethics and Politics; B. Russell, Rutledge P. 16

২. উপনিষদ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ, ৩১৮।

৩. Human Society in Ethics and Politics; B. Russell, P. 161

৪. Organizational Behavior; Stephen P. Robbings. Prentice – Hall of India Private ltd. New Delhi. P. 352

৫. Studies in Social Power; D. Cartwright (ed). Ann Arbor; University of Michigan, Institute for Social Research. P. 150-67.

৬ Basic Writings of B. Russell, Why I am not Communist প্রবন্ধে তিনি Marx কে Muddle-headed বলে সমালোচনা করেন। Routledge, Page. 479.

৭. Power; P. 9.
৮. History of Western Philosophy; Routledge. P. 125
৯. রিপাবলিক; পেণ্ডটো (অনুবাদ সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, পাতা- ৪২ (ভূমিকা)।
১০. প্রাগুক্ত; পাতা-২৭৫।
১১. প্রাগুক্ত; পাতা-২৩
১২. Power, P. 187
১৩. Political Ideals, B. Russell, Unwin Paperbacks, P. 9.
১৪. power .p. 187

আ লা প

দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব

ম ঈ ন চৌ ধু রী – স লি মু ল্লা হ খা ন

হালখাতা

জুলাই ৬, ২০০৭ শুক্রবার সকাল ১১.৩০ টা। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘হালখাতা’র পক্ষ থেকে আজ আমরা বসেছি একটা বিষয়ে বুঝবার জন্য। বিষয়টা হলো ‘দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব’। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা বাংলাদেশের দু-জন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, কবি-প্রাবন্ধিক মঈন চৌধুরী এবং গবেষক-লেখক সলিমুল্লাহ খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওনাদের কাছথেকে জানতে চাইব আসলে ‘দুর্নীতি’ বিষয়টিকে তারা কীভাবে দেখেন, এর আগাগোড়া তথা এর পরম্পরা ও কার্যকারিতার বিভিন্ন দিক কী, এর জন্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার কাজটি কীভাবে ঘটে।

আসলে দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে দুর্নীতি সম্পর্কে জানা দরকার; সেদিক থেকে প্রথমে মঈন চৌধুরীর কাছথেকে জানতে চাই, দুর্নীতি বলতে আপনি কী বোঝেন?

মঈন চৌধুরী

'দুর্নীতি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে 'নীতি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী। এই 'নীতি' শব্দকে কেন্দ্র করে 'দর্শন ও তত্ত্ব' কী ধরনের জ্ঞানসীমায় অবস্থান করছে, তার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দুর্নীতির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে আমাদের মনস্তত্ত্ব, আমাদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্যারাডাইম বা ছক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা হচ্ছে না বললেই চলে। দুর্নীতি যে 'নীতি' থেকে সরে আসা, এ সত্যটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন সবার আগে ।

হালখাতা

আমরা মঈন চৌধুরীর প্রারম্ভিক বক্তব্য শুনলাম। জনাব চৌধুরীর কথার রেশ ধরে সলিমুল্লাহ খানের কাছথেকে এবার জানতে চাইব, 'দুর্নীতি' বলতে আপনি কী বোঝেন?

সলিমুলট্রু খান

দুর্নীতি নিয়ে সমাজে এখন কয়েকটা আলোচনা চলছে। আমার মনে হয় সে সব বিষয়কে বাদ দিয়ে কিংবা সে সব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু দুর্নীতিকে আলাদা করে বোঝা যাবে না। আমি এখান থেকেই শুরু করতে চাই। 'দুর্নীতি' কথাটা আমরা ব্যবহার করছি বিশেষ বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় গিয়ে মানুষ যখন অপরাধ করে তখন আমরা তাকে 'অপরাধ' না বলে 'দুর্নীতি' বলছি, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে 'দুর্নীতি' কথাটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। অর্থাৎ সরিষার মধ্যেই ভূত। আমরা যে পদ্ধতিতে দুর্নীতি দূর করতে চাচ্ছি, সে পদ্ধতির ভেতরেই দুর্নীতি আছে কিনা সেটাও আমাদের দেখতে হবে।

হালখাতা

আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাচ্ছি, 'দুর্নীতি' বিষয়টি আসলে কী? মঈন চৌধুরী বললেন, "দুর্নীতি যে 'নীতি' থেকে সরে আসা, এ সত্যটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন সবার আগে"। আপনার মতে এই সুনীতিই বা কী?

সলিমুলট্রু খান

আমি সে দিকেই যাচ্ছি। রাজনৈতিক ক্ষমতায় থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি'র সময়ে কী করছিলেন?; বিরোধী দলের অফিসে গোপনে রেকর্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে আমেরিকান সমাজের বুদ্ধিমান কয়েকজন সাংবাদিক খবরটা ফাঁস করে দেন। ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। বিরোধী দলের অফিসে গোপনে রেকর্ডের এই ব্যবস্থাকে আমরা 'রাজনৈতিক দুর্নীতি' বলতে পারি। আরেক ধরনের দুর্নীতি হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আপনি আপনার

স্বজনদের সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন, আপনি তাদের ক্ষমতায় বসাচ্ছেন– এটাও এক ধরনের দুর্নীতি। আরেক ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, সেটা 'চাঁদাবাজি'। এটা এমন এক দুর্নীতি– যা সাধারণ লোকে করলে হয় চুরি আর বড়লোকে করলে সেটা হয় চাঁদাবাজি, না হয় দুর্নীতি হয়ে যায়। এখানে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। সেজন্য বলবো, দুটি জিনিসকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। একটি হলো সম্পদ উপার্জনের যেসব পদ্ধতি আছে সেগুলোকে আমরা বলছি নীতিসম্মত। যেমন ধরেন আপনি একটা কারখানা দিলেন, সেখানে বিনিয়োগ করলেন, সেখানে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে আপনি লাভবান হলেন, আপনি শিল্পপতি হলেন– আবার আপনি নিজে শিল্পপ্রতিষ্ঠান না দিয়ে মাস্তান নিয়ে আরেকজনেরটা দখল করলেন এবং আপনি নিজেকে শিল্পপতি হিসেবে দাবি করলেন, বা সমাজে সেটা প্রতিষ্ঠিত করলেন– তখন আপনি হলেন 'শিল্পদস্যু', 'ভূমিদস্যু'– এরকম আরও অনেক শব্দ আছে। কাজেই দুর্নীতি কিভাবে নীতি হিসেবে প্রচারিত হয় তার বহু পথ আছে। আমার কথা হলো, যে উপার্জনের নীতিকে আমরা সঠিক উপার্জনের নীতি বলছি সেটা আসলে সুনীতি কিনা সেটাও জিজ্ঞাস্য।

হালখাতা

তাহলে জনগণ যেটাকে সুনীতি বলে জানে, তাদের সেই জানা অর্থাৎ কথিত সুনীতি-কে আপনি কীভাবে বিবেচনা করবেন?

সলিমুল্লাহ খান

বলছি। আমার কথার ভেতরে আপনার প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে আশা করি। কথা হলো রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থেকে যে অতিরিক্ত উপার্জন করা হয়, সেই অতিরিক্ত উপার্জনের পন্থাকে আমাদের সমাজে সম্ভবত দুর্নীতি বলা হচ্ছে। ধরা যাক আমরা যে একটা শব্দ বলছি 'কালো টাকা'। আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা কালোটাকা কী ? এটা কি দেখতে কালো? সে বলেছে না এটা দেখতে কালো নয়। তাহলে এটাকে কালো টাকা বলছি কেন? সে বলছে, এ টাকার কোনো ট্যাক্স দেয়া হয় না। সে জন্য এ টাকাকে কালো টাকা বলা হয়। ট্যাক্স দিলে এ কালো টাকা সাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকার ট্যাক্স দিলে রাষ্ট্র আপনার দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলবে না। এটা নীতি হয়ে যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে নীতি আর দুর্নীতির পার্থক্য একটা সুতার সমান। সেখানে আমাদের ভাবতে হবে, যেতে হবে গোড়ায়। অত্যন্ত জোরালোভাবে আমি আবারও বলতে চাই, যে নীতির ভিত্তিতে দুর্নীতির সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে সেই নীতিই সুনীতি কিনা ভাবতে হবে!

হালখাতা

সলিমুলাহ খান দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে নীতির প্রসঙ্গও যেভাবে টানলেন অর্থাৎ গণমানুষ যে নীতির কথা সাধারণভাবে জানেন, সেই নীতিকেই তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করলেন যে, আসলে সেটাই সুনীতি কিনা।

মঈন চৌধুরী

দুর্নীতি বিষয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে নীতি বা সুনীতি প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ খান যা বললেন, তা দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশ করতে আমাদের খুবই সাহায্য করবে। আমাদের রাষ্ট্র বা সমাজ স্বাধীনতার পর গত ৩৫/৩৬ বছরে দুর্নীতিগ্রস্ত হলো, নাকি এই প্রক্রিয়া আরো অনেক আগে থেকেই চলে আসছিল। এবং সেই বিশ্লেষণে গেলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকেই নেড়েচেড়ে দেখতে হয়। সমাজ-মনস্তত্ত্বের গহীনে যাবার একমাত্র পথই হলো ভাষার বিশ্লেষণ, কারণ আমরা জানি যে আমাদের 'মন' নামক ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা অস্তিত্বটি আসলে ভাষার তৈরি। ব্যাপারটি গ্রাহ্য করে দার্শনিক হাইডেগার বলেছেন – The language is the home of Being and man dwells in this house. অর্থাৎ ভাবই ভাষার বাড়ি আর মানুষ এই বাড়িতেই বসবাস করে।

আমাদের ভাষার বিশ্লেষণে দেখতে পাব যে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদির মতো অনেক শব্দই আমাদের ভাষায় ঐতিহাসিকভাবে ছিল। 'দুর্নীতিবাজ', 'ঘুষখোর' ইত্যাদির মতো শব্দও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ', 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা', ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক প্রবাদ-প্রবচনও আমাদের দুর্নীতিবিষয়ক ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ করছে। কিন্তু সেখানে ভাষাকেন্দ্রিক একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। ছিঁচকে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদিকে আমরা যে মাত্রায় অন্যায় বা পাপ হিসাবে গণ্য করি, ঠিক সে মাত্রায় 'দুর্নীতি' বা 'ঘুষ খাওয়া'-কে অন্যায় বা পাপ ভাবি না। সমাজের 'অসাধারণ' লোকজন কিছুটা দুর্নীতি করবে, ঘুষ খাবে– এমন ব্যাপার যেন আমাদের সমাজে অনেকটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। অনেক মেয়ের বাবা মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে
ভালোভাবে জানতে চান ছেলের 'উপরি আয় কত',। আমাদের ইতিহাসেও তাই 'দারোগা', 'পুলিশ', 'সি এস পি', 'ইঞ্জিনিয়র' ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনই দুর্নীতিবাজ হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এই পুরো ব্যাপারটা আসলে আর কিছু নয়, এটি মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়; যে বিপর্যয় আমাদের জাতীয় চরিত্রকে এবং সামাজিক দর্শনকেই উপস্থাপন করে!

হালখাতা

আমাদের প্রশ্ন, চুরি, ডাকাতি এবং দুর্নীতি– এগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কী?

সলিমুলল্লাহ খান

আমি মনে করি, মঈন চৌধুরী আপনি যে দর্শন, মনস্তত্ত্ব– এরকম বড় বড় শব্দ উত্থাপন করছেন, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কেচোঁ খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি বলছি কেঁচো হচ্ছে দুর্নীতি আর সাপ হচ্ছে নীতি। কেঁচো দেখতে বিশ্রী, গা ঘিন ঘিন করে আর সাপ ছোবল মেরে হত্যা করতে পারে। আমাদের দেশে যে দুর্নীতির ইতিহাস আমরা দেখছি, বিশেষ করে সম্পত্তি-দুর্নীতির যেসব ঘটনা আমরা দেখছি সেটা একদিনের নয়– কারণ আমাদের এই রাষ্ট্রটা তৈরি হয়েছে ৩৫/৩৬ বছর আগে, তার আগে এখানে যারা রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ছিল অর্থাৎ প্রধান জাতি হিসাবে যারা ছিল, আপনি বাঙালি মুসলমানের কথাই বলেন– আর শওকতের মতো আপনারও যদি মুসলমান শব্দটি নিয়ে আপত্তি থাকে, তাহলে বাঙালি বললেই চলে– তাতে কিছু যায় আসে না। যা হোক মূল কথা হলো এই সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতার ইতিহাস বেশি দিনের নয়, কিন্তু এই সমাজে মানুষের ইতিহাস অনেক দিনের। আমরা আজকের আলোচনায় বিশেষ করে যে দুর্নীতির কথা বলছি, সেটা হলো রাষ্ট্র-ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত দুর্নীতি। আমি বলবো চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি-ছিনতাই, খুন-অপরাধ যখন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, জনগণের আড়াল করা হয়, তখন তাকে দুর্নীতি বলা হচ্ছে। অবশ্য এরূপ কোনো সংজ্ঞা আমি দেখিনি কোনো বইয়ে বা কাগজে। আমি বলবো, সব ধরনের চুরিকে প্লেইন চুরি বলতে পারলে, ডাকাতিকে ডাকাতি বলতে পারলে ভালোই হতো। আপনি জানেন আমাদের পেনাল কোডে রবারি এবং ডেকয়টি দুটি আলাদা অপরাধ। এটা লিখেছিলেন ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে। ওনারা রবারি এবং ডাকাতির পার্থক্য করেছিলেন কেন? ওনারা বলেছেন, পাঁচ জনের কম মানুষ মিলে করলে রবারি আর পাঁচ জনের অধিক মানুষ মিলে করলে সেটা ডাকাতি। কাজেই আমার ধারণা আপনারা দার্শনিকেরা মিলে দুর্নীতির একটা সংজ্ঞা তৈরি করবেন– এটা আমার আশা।

হালখাতা

মঈন ভাই নিজেকে দার্শনিক মনে করেন কি-না সেটা একটা ব্যাপার, যদিও খান ভাই তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথার শেষ কথাটিতে মঈন চৌধুরীকে দার্শনিক বলে সম্বোধন করলেন। এবার চৌধুরীর বক্তব্য...

মঈন চৌধুরী

আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে কখনো দার্শনিক মনে করি না। আমি দর্শন পাঠ করতে পছন্দ করি, দর্শন চর্চা করি। সলিমুল্লাহ খান হয়তো দার্শনিকদের কাছেই দুর্নীতির যথার্থ সংজ্ঞা সৃষ্টির আশা ব্যক্ত করেছেন। আমি দুর্নীতি নিয়ে আমাদের সমাজের পেক্ষাপটে একটি কথা বলতে পারি, সেটা কোনো দর্শন নয়, সেটা একটি সামাজিক

সত্য– তা হলো, আজকাল যেন চোর বললে কারও মানসম্মান যায় না, বরং সম্মান বেড়ে যায়।

সলিমুলাহ্ খান

মঈন ভাই'র অনেক বিষয়ের সঙ্গে হয়ত আমি একমত নই কিন্তু দুর্নীতিবাজ শব্দটি যে প্রায় একটি সম্মানজনক শব্দে পরিণত হয়েছে, সে-ব্যপারে তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং এটা রীতিমতো আতঙ্কিত হওয়ার মতো ব্যাপার, এই জন্যে যে, অন্যায়কে আইন করে প্রতিরোধ করা যায় কেবল তখনই, যখন সেটাকে সমাজের মানুষ অন্যায় মনে করে এবং যদি সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে। পক্ষান্তরে যদি দুর্নীতির মতো একটি বিষয়কে সমাজ খারাপ কিছু মনে না করে, যেমন ঘুষকে বা যৌতুককে এই সমাজ খারাপ মনে করে না, তাহলে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এই সমাজ থেকে কখনোই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব নয়; মূল কথা হলো আইন কার্যকরী হবে তখনই, যখন সমাজটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঐ আইন মেনে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

হালখাতা

এবার পুনরায় আসা যাক মঈন ভাই'র কাছে। দুর্নীতি একটি ক্ষতিকর বা নেগেটিভ ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে সমাজ কেন তাকে পজিটিভ হিসাবে ভাবছে? এভাবে ভাবনার ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে থাকে? এ নিয়ে যদি আমাদের বিস্তারিতভাবে কিছু বলেন। এর পেছনে কি শুধুই অভাব কাজ করছে নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে? অন্য কোনো কারণ থেকে থাকলে, তার পটভূমি সম্পর্কে আপনার কাছথেকে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি...।

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, দুর্নীতি একটি নেগেটিভ শব্দ না হয়ে এটি প্রায় পজিটিভ শব্দ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকানো দরকার, দরকার দুটি কারণে; এক. চুরি, ডাকাতি এসবের সাথে 'অস্তিত্বের সঙ্কট' জড়িত কিনা; দুই. আর এই অস্তিত্বের সঙ্গে 'সংকট' ইতিহাসের কোনো এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিলো কিনা। আমাদের এই বঙ্গদেশ তৈরি হয়েছিল বঙ্গ, হরিকেল, সমতট ইত্যাদি জনপদের সমন্বয়ে। আমাদের আদিম বা প্রাচীন বঙ্গে যে জনগোষ্ঠী বসবাস করত তাদের বলা হতো বঙ্গাল, পরে দ্রাবিড়রা এখানে আসেন এবং তখন তারা একটি কৌম সমাজের অধীনে ছিলেন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব সংকট কখন শুরু হলো? যখন ব্রাহ্মণরা এসে বলতে লাগল যে, আমরা শ্রেষ্ঠ, অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা এবং উঁচু ঘোষণা করে বলতে লাগল যে, আমাদের পুজো দাও– এটা করো সেটা করো– তখন থেকে আমাদের সমাজে শুরু হলো অস্তিত্ব সংকট। তখন থেকেই

আমাদের সমাজে বর্ণভেদ এলো এবং নিচুজাত তৈরি হলো। আর ব্রাহ্মণদের খুশি করতে তাদের চারপাশে তৈরি হলো চেলা-চামুণ্ডা শ্রেণীর। আমাদের সমাজে দুর্নীতির বীজ আমি মনে করি তখনই বপন করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের সমাজে অফিসের পিয়ন, কেরানী, গ্রামের কৃষক, মাওলানা সাহেব থেকে আরম্ভ করে একজন ইউ.এন.ও, ডি সি, সরকারের উঁচু লেভেলের কর্মকর্তা বা অনেক পুঁজি দিয়ে যিনি ব্যবসা করেন এদের অনেকেই দুর্নীতিবাজ। আমি বলছি না যে, প্রতিটি লোকই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে আমার অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই দুর্নীতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই জীবন-যাপন করে আর এই দুর্নীতির সঙ্গে আমি মনে করি অস্তিত্ব সংকট জড়িত। একজন কৃষক বা কেরানীর অস্তিত্ব সংকট হলো দৈনন্দিন থাকা-খাওয়ার সংকট, অন্যদিকে টাকার কুমিরদের সংকট হলো জবরদখল করে দখলকৃত সম্পদ রক্ষা করা। সম্পদ রক্ষার জন্য সে তৈরি করে মাস্তান বাহিনী, তারা হয় পত্রিকার মালিক, তারা টি.ভি চ্যানেল চালু করে। এবং এরাই রাজনৈতিক শক্তি বা ঢ়ড়বিৎ ঃঃৎঁপঃঁৎব-এর মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে এভাবে নিজে দুর্নীতি করছে এবং দুর্নীতির জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রক্রিয়ায় একটা দুর্নীতি আরেকটা দুর্নীতি সৃষ্টি করছে, এটা অনেকটা জাঁক লাকার একটা সিগনিফায়ার যেমন আরেকটা সিগনিফায়ার সৃষ্টি করে, তেমনি একটা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি করছে আরেকটি দুর্নীতি।

হালখাতা

এই ফাঁকে আমি একটু বলি, খান ভাই আপনি তো জাকঁ লাকা অর্থাৎ আপনার জবানী অনুসারে জাকঁ লাকাঁনের দর্শনচর্চা করেছেন ও করছেন, 'লাঁকা বিদ্যালয়' নামে একটি সংগঠনও তৈরি করেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি– 'জাক লাকাঁর একটা সিগনিফায়ার যেভাবে আরেকটা সিগনিফায়ার সৃষ্টি করে' তার সঙ্গে 'একটা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার ফলে আরেকটি দুর্নীতি সৃষ্টি হয়'-এর মিলের যেকথা মঈন ভাই বললেন এব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

সলিমুলস্থ খান

মঈন ভাই'র সঙ্গে আমি একমত, তাকে ধন্যবাদ জানাই ।

মঈন চৌধুরী

এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভাষার প্রলেপ দিয়ে দুর্নীতিকে নানা রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন চুরি, চুরি আবার বহুরকম– ছিঁচকে চুরি, পুকুর চুরি। এর উপরের ধাপে আছে ডাকাতি– এরপর দেখা যাচ্ছে হাইজ্যাক। শব্দটি বাংলাভাষায় ছিল না, ছিনতাই শব্দটিও আমাদের ভাষায় ছিল না– পরে হাইজ্যাক আসলো, হাইজ্যাক থেকে ছিনতাই আসলো। আমার মনে আছে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন

'দুর্নীতিবাজ' বলে কোনো শব্দ আমাদের সমাজে খুব একটা প্রচলিত ছিল না– তখন 'ঘুষখোর' শব্দটি বেশ প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল যে অমুকে ঘুষ খায় অমুকে ঘুষ খায় না– অর্থাৎ অমুকে অসাধু লোক আর অমুকে সাধু লোক। তার অনেক পরে দুর্নীতিবাজ শব্দটি প্রচলিত হলো– এতেই বোঝা যাচ্ছে ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক একটি বিষয়ের সম্পর্ক আছে।

সলিমুলহুক খান

মানুষ চুরি করে কেন! প্রশ্ন করা হলো তুমি চুরি কর কেন? বলে যে সমাজে কাজ নাই। বলে যে আমার অস্তিত্বের সংকট, খেতে পরতে পারছি না তাই চুরি করি একটু বেঁচে থাকার জন্য । মানুষ আসলে দু'কারণে চুরি করে; অভাবে পড়লে মানুষ চুরি করে আর মানুষের স্বভাব নষ্ট হলে চুরি করে। যেমন– অফিসে ছোট চাকরি করে,তাকে টু-পাইস কামাই করতে হয়– হোটেলের বেয়ারা, তাকে বকসিশ দিতে হয়; বলা হয় যে, এর আয়-রোজগার কম বলে এগুলো করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো বড় দুর্নীতির মতো এগুলোও দুর্নীতি, যা আমাদের সমাজে প্রায় বৈধতা পেয়ে গেছে। ছোট ছোট দুর্নীতিকে আমাদের সমাজে ঘুষ বলা হয়, বকসিশও বলা হয়। এগুলো সমাজের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমার কথা হলো এগুলো না হয় ছোট ছোট দুর্নীতি, কিন্তু এই যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি এগুলো কী অভাব থেকে করেছে! নিশ্চয়ই না, এগুলো স্বভাবের কারণেই করেছে। মানুষের কত সম্পদ দরকার? মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কিংবা আরাম আয়েসের জন্যও এতো ধনসম্পদের প্রয়োজন হয় না– কাজেই এসব দুর্নীতি অভাবের কারণে নয় স্বভাবের দোষেই একাজ করা হয়ে থাকে। মানুষ আরও উপার্জনের বাসনায় আরও সম্পদ চায়। কথা আছে টাকায় টাকা আনে– এটাকেই মঈন ভাই একটু আগে লাকানের শব্দ দিয়ে বললেন, সিগনিফায়ার; আসল দুর্নীতি একজন ব্যক্তির কাজ নয়– দুর্নীতি একটা জগৎ। ইংরেজীতে বলা যায় সিস্টেম।

হালখাতা

বাংলাদেশের জনগণের মনে দুর্নীতি নিয়ে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির বিপরীত বিষয় 'নীতি' বা 'মূলনীতি' কী? অর্থাৎ কোন মূলনীতি থেকে চ্যুতিকে তারা দুর্নীতি বলছে?

সলিমুলহুক খান

দুর্নীতির পাশাপাশি আরেকটি কথা, সেটা মূলনীতি– মূলনীতিটা কোথায়? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি সংবিধান পাশ হয়েছিল ১৯৭২ সালে– সেখানে ছিল রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তা– তাজুদ্দিন সাহেব বলেছিলেন তিনটার কথা, বঙ্গবন্ধুর আমলে ৪টা হয়েছে– জাতীয়তা যোগ হয়েছে– পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের সময় সেটাকে কিছুটা বদলানো হয়েছে– আরেকটি

গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্ভবত সংবিধানের ১২ নম্বর ধারায়, পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকেই রায়টা এসেছিল যে, ধর্মের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবহার করা হবে না। জিয়াউর রহমানের সময় সংশোধনীর মাধ্যমে এটা তুলে দেয়া হয়। আমি কথাটি বলছি কোনটি নীতি আর কোনটি দুর্নীতি– তা বোঝার জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে, মূলনীতিকে পরিবর্তন না করলে ধর্মকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না– তাই জিয়াউর রহমান এই মূলনীতি তুলে দিলেন। তার মানে তিনি চান ধর্মকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে। আমি মনে করি এই যে মূলনীতির পরিবর্তন করা– এটা যেমন দুর্নীতি – একইভাবে আপনি সরকারি চাকরি করে বেতন পান ৫,০০০/- টাকা অথচ আপনার সংসারে দরকার ২০,০০০/- টাকা– বলা হলো বাকি টাকা আপনি ঘুষ খেয়ে যোগাড় করেন– এটাও দুর্নীতি। অর্থাৎ কোচিং করা, টিউশনি করা– এগুলো শিক্ষকদের করতে বলা হচ্ছে। রাষ্ট্রই যদি বলে তোমরা এগুলো করো তাহলে আমি কি সেগুলোকে দুর্নীতি বলতে পারব? রাষ্ট্র বলছে তুমি ধর্মকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে, রাষ্ট্র যদি তাকে বৈধতা দিয়ে দেয় সেখানে আমি কি কিছু করতে পারছি না!

এখন মূল কথায় আসি, আপনার মূলনীতিতেই আছে আপনি প্রাইভেট প্রোপার্টির মালিক হতে পারবেন; আমি মনে করি এটা একটি দুর্নীতিগ্রস্ত মূলনীতি। প্রোপার্টি হতে হবে দশের, আল্লাহর। আমরা তার জিম্মাদার মাত্র। সেই দশের প্রপার্টি ব্যক্তির নামে লিখিত করে দিয়ে দেওয়াটা একটা বড় ধরনের দুর্নীতি। অথচ এই দুর্নীতিকেই রাষ্ট্র ও সমাজ তার সুনীতি মনে করে। প্রাইভেট প্রপার্টির এই অধিকারের কথা আমাদের সংবিধানেই আছে– কাজেই এটা একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সংবিধান; সকল দুর্নীতির এটা গোড়াঘর, এই গোড়ায় হাত দেয়া দরকার কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক বলে আমরা গোড়ায় হাত দেই না।

হালখাতা

সেটা তো আছেই। কিন্তু যেটাকে আপনি দুর্নীতিগ্রস্ত সংবিধান বলছেন এই সংবিধানকেও তো প্রতিমুহূর্তে হত্যা করে দুর্নীতি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

সলিমুল্লাহ খান

এ ধরনের সংবিধানে প্রাইভেট প্রপার্টির অধিকার দেয়া হয়েছে, এই সংবিধান অনুসারেও বলা আছে মজুরের পারিশ্রমিক সঠিক সময়ে দিয়ে দাও– কিন্তু সেই পারিশ্রমিকের টাকা সঠিক সময়ে না দিয়ে মালিকপক্ষ ২ মাস ঐ টাকা ব্যাংকে রেখে দিল এবং ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত সুদ পেল– এই যে সুদের টাকা সে অর্জন করল এটা দুর্নীতি। কাজেই দুর্নীতির সংজ্ঞা নতুনভাবে দিতে হবে– দুর্নীতির নানা স্তর রয়েছে, সেই দিকগুলো ভেবে বহুমুখী চিন্তাকে মাথায় রেখে সব ধরনের দুর্নীতিকেই হিসাবে

আনা জরুরী। যেমন– সরকার ঘোষণা দিল, বছরে বেশ কিছুসংখ্যক বই কেনা হবে– এবং সেই জন্য 'বই ক্রয় কমিটি' গঠন করা হলো– বাস্তবে দেখা গেল ক্রয়ের তালিকায় মন্দ বই ঢুকিয়ে দেয়া হলো আর ভালো বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো না– এতে করে ভালো বইয়ের প্রকাশকরা বিদায় নিতে বাধ্য হলো– এটা কি দুর্নীতি নয়? বই ক্রয়ের ঐ কমিটিতে সুশীল সমাজের লোকজন ছিলেন– কাজেই সরাসরি বলা যায় সুশীল সমাজের এই লোকদের দ্বারাই বই কেনার মতো কাজেও দুর্নীতি সংক্রমিত হলো। এর কারণ হলো সুশীল সমাজটাও দুর্নীতিগ্রস্ত। কাজেই দুর্নীতির সংজ্ঞার জন্য আরও বিস্তৃত আকারে ভাববার সময় এসেছে। এতগুলো জিনিস যদি একসাথে আসে তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই দুর্নীতি কি স্বয়ং আপনা থেকে এসেছে নাকি এর আসার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। সেই কারণের দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, আপনি যে হাজার বছরের বাঙালি জাতির দুর্নীতির ইতিহাসের কথা উল্লেখ করলেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর আমার ভাষা নেই– তবে আমি মনে করি আমরা যদি আলোচনার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি যেতে চাই– তাহলে সমসাময়িক দুর্নীতির আগাগোড়া নিয়েই আমাদের অলোচনা করা দরকার। অন্য কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা দুর্নীতির অতি প্রাচীন বা মধ্য-প্রাচীন কালের ইতিহাস নিয়ে আলোচানা করতে পারব। ইতিহাসের প্রসঙ্গ যখন তুললেন তখন ইতিহাসের একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। ইংলন্ড কী-করে বাংলাদেশ দখল করল– ইংলন্ডের এখন যারা বিদগ্ধ ঐতিহাসিক তাদের মধ্য থেকে একজনের নাম করা যায় পিটার মার্শাল, ক্যামব্রিজের অধ্যাপক– আরেকজন ক্রিস্টোফার বেইলি; এরা বলেন যে, বাংলা দখল করার কোনো পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। এটা হলো দুর্নীতির ছক। কী করে দুর্নীতির ছক? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিটি কর্মচারী, তারা তাদের বুদ্ধি দিয়ে কৌশল দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে বাংলা দখল করেছে, ইংলন্ড সেটা জেনেছে অনেক পরে। কাজেই এটাকে ইংলন্ডের অপরাধ বলা যাবে না, এটা নিশ্চয়ই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় ধরনের দুর্নীতি। আমি বলব এসব অজুহাত দেখিয়েও কি ইংলন্ড দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই পাবে? পাবে না। কাজেই খুঁজে বের করতে হবে ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাসকে, তাহলে দুর্নীতির আসল চেহারাটা আমরা দেখতে পাব।

প্রসঙ্গক্রমে আমি নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটির কথা বলব, এদের মধ্যে কোনোরকম দুর্নীতি নাই– অথবা তারা দেশের জন্য একশত ভাগ নিয়োজিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে– আর এমনি দুর্নীতি হঠাৎ করে এসে গেল একথা সঠিক নয়। বরং আমি বলব দুর্নীতির উৎস খুঁজতে হবে সিভিল সোসাইটির মধ্যে। বঞ্চনা-শোষণের মূলে পদ্ধতিগতভাবে যে অবদমন রয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে। সমাজকে অবদমিত অবস্থায় রাখার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বঞ্চনা-শোষণ-নির্যাতনের জায়গায় রাখার ক্ষেত্রে কিংবা শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ সৃষ্টি এবং তা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সবচেয়ে বড়

ভূমিকা রয়েছে। সেটার সুরাহা করা সবচেয়ে জরুরী কাজ। এই অবদমন শব্দটি মঈন চৌধুরীর মত অনুসারে এক মনোবিশ্লেষণাত্মক শব্দ; এই অবদমন শুধু সেক্সুয়াল নয়– এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক। কাজেই আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটিই সৃষ্টি করেছে অসম বাণিজ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিনিয়োগ। আফ্রিকাসহ অন্যান্য জায়গায় তারা করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নামকাওয়াস্তে মূল্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া– এভাবে যদি আমাদের সহযোগিতা করার কথা বলা হয়– সেটা কি দুর্নীতি নয়? আর এই কাজে আমাদের দেশের মধ্য থেকে যারা সহযোগিতা করে তাদের আমরা বলছি নীতিপরায়ণ। যদি বলি চট্টগ্রাম বন্দরের কথা, যারা বন্দর বিদেশীদের দেয়ার জন্য কাজ করছে তারা যদি মাফ পেয়ে যায়– যারা চট্টগ্রামের পাহাড় কেটেছে তারাও মাফ পেয়ে যায়; তাহলে দেখতে হবে দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতি শুধু একটি দুটি দিক থেকে নয়, এই দুর্নীতি প্রায় সবদিক থেকে যা সরাসরি বলা যায় অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মূলনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। মূল কথা হলো, মূলনীতি সঠিক না হলে তার তো পুরোটাই দুর্নীতি!

হালখাতা

ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্যে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সলিমুল্লাহর সাথে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করি না। তবে কথা প্রসঙ্গে যে ধর্ম ও রাষ্ট্রধর্ম প্রসঙ্গ উঠে এলো, তার প্রেক্ষিতে আমি ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে চাই। ধর্ম সাধারণ মানুষের দর্শন। এবং দর্শন ছাড়া পৃথিবীতে বা আমাদের সমাজে কেউ অবস্থান করতে পারে না। পৃথিবীর সব ধর্মেই 'মানবিকতা'র পক্ষে অনেক কথা আছে, আবার ধর্মকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হচ্ছে দুর্নীতি। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি "আলাহ্'র সম্পদ" হয়, তারপরও এই সম্পদকে ব্যক্তিগতভাবে ভোগের উদ্দেশ্যে নিজের আয়ত্তে এনে মানুষ দুর্নীতি করে। ধর্ম নিয়ে এর প্রচার সম্পর্কে বলি, ধর্মগুরু বা মাওলানারা বলেন, একটি মসজিদ তৈরি করলে সত্তর হাজার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আবার হজ্জ করে আসলে পবিত্র শিশুর মতো হয়ে আসে। কিন্তু এটা বলা হয় না যে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করলে বা চুরি করলে, সে সম্পদের প্রকৃত মালিক ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করতে পারবেন না। বরং বলা হয়, যত পাপই করা হোক না কেন ইবাদত করলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই যেহেতু গুনাহ মাফ হওয়ার প্রশস্ত পথ খোলা আছে তাই চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, অন্যায়, শোষণ সবকিছু ধর্মের প্রচারগত কারণেও এ সমাজে টিকে আছে। একজন চোর যদি মসজিদ তৈরি করে, সে মসজিদে যে নামাজ হবে না– আল্লাহ কবুল করবেন না– এটা বলা হয় না– বরং মসজিদ তৈরির মাধ্যমে চোর ডাকাতরা সমাজে সম্মানিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে ধর্মের ব্যানারে দুর্নীতিকে

চরমভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের সুদখোর, লুটেরা, দুর্নীতিবাজরা দিনদিন তাদের কাজ করেই যাচ্ছে। এই যে ধর্ম, আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর– এসব শব্দেরও মনোবিশ্লেষণ করে দুর্নীতির উৎস ও প্রতিকার খুঁজে দেখা দরকার। সলিমুল্লাহ সুশীল সমাজের কথা বললেন। সলিমুল্লাহর সাথে আমি একমত যে বাংলাদেশ সুশীল সমাজ যা করছে সেটা নীতি না দুর্নীতি সেটাও সমাজের দেখতে হবে। বাংলাদেশ সুশীল সমাজের সদস্য হিসাবে আামি যাদের দেখছি, তাদের আমার মনে হয়েছে, তারা সবসময় টেক্সটবুক, ইকোনোমিক্স, স্যোশিওলজি গ্রাহ্য করে সেভাবেই কথা বলেন। এরা বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি সুশীল সমাজের সমাজ তৈরি করেছে– যার সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন আর ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিবাজদের সহযোগিতা করছে কিংবা নিজেরা দুর্নীতি করছে। যে সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করলাম– এগুলোই তো দুর্নীতির উৎস– কাজেই তাদের পরামর্শে যে সব দুর্নীতি উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলবে, সেই প্রক্রিয়াও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। কাজেই দুর্নীতি দিয়ে দুর্নীতি ঠেকানো যাবে না। এদের শক্তি হলো, সমাজে এরা একধরনের নায়ক সেজেছে মিডিয়ার মধ্যদিয়ে; এই নায়কত্ব দিয়েই এরা সমাজে দুর্নীতি করে থাকে। জনগণ মিডিয়াতে এদেরদেখতে দেখতে একসময় ভেবে বসে যে, এরাই সমাজের মুক্তিদাতা– জনগণের এই ভুল আস্থার পাত্র হয়ে জনগণের দুর্বলতাকে নিয়ে এরা ব্যক্তিগত ফায়দা লুফে নেয়। অর্থাৎ সুশীলরা হলো জনগণ ও দুর্নীতিবাজদের মধ্যস্থতাকারী শ্রেণী। এরা দুর্নীতিবাজদের জনগণের রোষানল থেকে রেহাই পাইয়ে দেয়ার কাজটি খুব সূক্ষ্মভাবে করে থাকে। বাংলাদেশের এমন সুশীলকে দেখেছি এরশাদের পতনের জন্য পল্টনের মাঠে লাফালাফি করতে । আর তাকেই এরশাদের পতনের পূর্বে দেখেছি দিল্লী গিয়ে এরশাদের পক্ষে কথা বলতে। এদের নাম না বলাই ভালো কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা। কাজেই আমাদের সমাজের গুরু হয়ে যারা বসে আছেন আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী– তারাও দুর্নীতির সঙ্গে কেন এবং কীভাবে জড়িয়ে আছেন বা থাকেন তারও একটি সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হালখাতা

সেটা তো দুর্নীতির কারণ দঘাটন পদ্ধতি। কিন্তু এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা যাবে কীভাবে?

মঈন চৌধুরী

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কারণ বেরিয়ে আসবে, সে কারণগুলো দূর করার পদ্ধতিগত প্রতিকারের ব্যবস্থা বের করতে হবে। সেটা অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া হবে না। বিক্ষিপ্তভাবে এই দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা যাবে না। প্রয়োজন একটা আমূল পরিবর্তন।

হালখাতা
এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

সলিমুলাহ্ খান
দুর্নীতি প্রতিকারের একটি উপায় হলো– কেউ যেন দুর্নীতি করে কোনোভাবেই প্রশংসিত হতে না পারে । দুর্নীতি যিনি করেন তিনি যেন পুরস্কৃত না হতে পারেন এবং দুর্নীতি-ব্যবস্থাকে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে যদি এম.পি. ইলেকশন করে তাহলে ক্ষমতায় আসাটা যেমন দুর্নীতি তেমনি ক্ষমতায় এসে সে যে কাজগুলো করবে সেটাও দুর্নীতি। যেমন ২০০১ সালের কথিত ইলেকশন ছিল দুর্নীতি। ঢাকায় ও ঢাকার বাহিরে ১৪ আনা এম.পি. ইলেকশন করেনি। সেই ইলেকশনের মধ্যমে খালেজা জিয়া ক্ষমতায় এলেন সেটা ছিল দুর্নীতি। আর একটি উদাহরণ, ড. ইউনুস– বসে আছেন ; একপাশে মান্নান ভূইয়া, আরেক পাশে সাদেক হোসেন খোকা– এটা ড. ইউনুসের একটি চেহারা। ক্ষুদ্রঋণের কথা বলে চিন্তায় যে দুর্নীতি তিনি করেছেন সেটা অনেক বড় দুর্নীতি হলেও– এ দুটোই দুর্নীতি।

হালখাতা
ড. ইউনুস আন্তর্জাতিক সন্মান অর্জন করেছেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মধ্যদিয়ে– এটা বাংলাদেশের জীবনে সর্বাত্মক সন্মান। আবার যেজন্য তাকে এই প্রাইজ দেয়া হলো সেই ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতিকে এদেশের মানুষ কিন্তু ভালোভাবে নেয়নি।

সলিমুলাহ্ খান
তিনি তো ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের বিপদ নিয়ে কিছু বলতে আসেননি। এর পেছনে তার কী ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করে? সেটা একটু চিন্তা করলেই আমরা পেয়ে যাই। সমাজে যারা 'নোবেল প্রাইজ' পান, সমাজে যারা বড় বড় চেহারা নিয়ে বসে আছেন তারা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিতেন তা হলে দুর্নীতি কিছুটা হলেও প্রতিহত করা যেত। কিন্তু বাস্তবে এর চেহারা উল্টা। এরা দুর্নীতি করে সমাজে বড় হচ্ছে আবার বড় হয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের এই প্রক্রিয়া একটি দুর্নীতি। যদিও পৃথিবীর অনেক ভালো কাজের জন্য বিভিন্ন বছর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে কিন্তু ড. ইউনুসের নোবেল প্রাইজ হলো দুর্নীতি করার পুরস্কার। এই দুর্নীতির সত্যতা বিশেষ করে গ্রামের গরীব নারীদের কাছথেকে পাওয়া যাবে, যা সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে এ দেশের জনগণও জেনেছে। দেশের মানুষ উৎপাদনশীল একটি দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, ঋণ পাবে এই আশায় তারা যুদ্ধ করেননি। একদিকে আদমজীসহ শত শত জুটমিল বন্ধ হয়, আরেক দিকে ড.ইউনুস নোবেল প্রাইজ পান– আমরা এ

দুয়ের মধ্যে তুলনা করলে দেখি, উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে ঋণ গ্রহণে আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে।

হালখাতা
নোবেল প্রাইজও কি তাহলে দুর্নীতির উর্ধ্বে নয়?

সলিমুলহুক খান
'নোবেল প্রাইজ'ও দুর্নীতির উর্ধ্বে নয়, তার ঢের প্রমাণ আছে। ['অর্থনীতি বিজ্ঞান'-এ নোবেল পুরস্কার বলে কিছু নেই। অথচ সারা দুনিয়াকে বলা হয়েছে এটাও নোবেল পুরস্কার। যেটা আছে তার আসল নাম 'ব্যাংক অব সুইডেন পুরস্কার'।]

হালখাতা
এবার মঈন চৌধুরীর কাছথেকে জানতে চাই, ভাষা কীভাবে মানুষের মনস্তত্ত্বকে দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে?

মঈন চৌধুরী
আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা আমি জোর দিয়েই বলি। আদিকাল থেকে আমাদের মনস্তত্ত্বের গহীনে কতগুলো ভাষাসৃষ্ট টার্ম ঢুকে গেছে যেগুলো দুর্নীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। যেমন: চুরি মহাবিদ্যা যদি ধরা না পড়ে, পড়ালেখা করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে, ইত্যাদি। বিষয়টির বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছোবেলায় আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হলো, পড়া-লেখা করলে বড় হয়ে গাড়িতে চড়া যাবে। একই জিনিস আমার সন্তানকেও পড়াচ্ছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে পড়ালেখা করে আমি যদি গাড়ি কেনার মতো টাকা যোগাড় না করতে পারি তাহলে চুরি ডাকাতির পথ ধরবো। এভাবে নানা কথা দ্বারা আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাজগত ভরপুর হয়ে আছে। কখনো সচেতনভাবে কখনো আবার নিজের অজ্ঞাতেই এরূপ ভাষার সূত্র আমাদের দুর্নীতি করতে উৎসাহিত করে। পাওনাদার-এর ভয়ে বাড়িতে অবস্থান করে যদি আমরা আমাদের সন্তানকে বলি– 'বলে দাও বাবা বাড়িতে নেই', তবে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান যে একজন বড় মিথ্যাবাদী হবে, তা প্রায় নিশ্চিত।

হালখাতা
সলিমুল্লাহ খান দুর্নীতির ক্ষেত্রে 'অভাব' ও 'স্বভাব' এই দুরকম কারণের কথা বলেছেন। এব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সলিমুলাহ খান মানুষের স্বভাব ও অভাবের প্রসঙ্গ টেনেছেন; এই সূত্র ধরে আমি অভাব ও স্বভাবের প্রসঙ্গে আসব। যেমন, বলা আছে 'ভাত নাই যার জাত নাই তার'। প্রশ্ন হলো, মোসাদ্দেক আলী ফালু যে দুর্নীতি করেছেন সেটা কি ভাতের অভাবে করেছেন? কত ভাত খায় সে? এখানে আমি মনে করি অভাব নয়, এখানে ফালু সাহেবের স্বভাবটাই দুর্নীতির প্রধান কারণ। আপনি নোবেল প্রাইজের কথা বললেন। তার সঙ্গে আমরা বাংলা একাডেমীর প্রসঙ্গেও আসতে পারি। বাংলা একাডেমী দুর্নীতিপূর্ণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত এবং এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির কর্মপ্রণালী দুর্নীতিগ্রস্ত। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দুর্নীতি অবস্থান করছে এবং এ কারণে পুরস্কার নিয়েও মানুষ এখন হাস্যরস করে, মশকরা করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানুষের কিছুই করার নেই। প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিকে আমরা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও সেটা নিয়ে মানুষ হাসাহাসিই করে। আরও একটি উদাহরণ দেই ভাষা বিষয়ক। আমাদের সমাজে এটা গ্রহণযোগ্য যে, ভাবী আর ননদের মধ্যে কিংবা বউ ও শাশুড়ির মধ্যে ঝগড়া হবেই; কাজেই দুই নারীর ঝগড়া আমাদের কাছে সহনীয় চিত্র। হাসিনা-খালেদার ঝগড়া সেই কারণে সবাই যেন স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। প্রায় মুহূর্তে ঝগড়া হচ্ছে– কিন্তু জনগণ কিছু না বলে চুপ করে থাকছে, কিছু জনগণ আবার এই ঝগড়াকে সম্মতি দিচ্ছে তাও কিন্তু নয়। কাজেই আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্যারাডাইম যেভাবে তৈরি হয়েছে সেখানে আঘাত করতে না পারলে এই দুর্নীতির বীজ ধ্বংস করা অসম্ভব। সমাজে যারা দৈনিক পত্রিকা, টি.ভি. চ্যানেল, রেডিও চ্যানেল ইত্যাদি মাস-মিডিয়ার মালিক,এরা চাইলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে জনতাকে সচেতন করতে পারবে না, কারণ এইসব প্রচারমাধ্যমের মালিকরা প্রায় সবাই নিজেরাই দুর্নীতিবাজ। আর জনগণকে দুর্নীতি বিরোধী করে তুললে নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাবে, সেই ভয়ে সংবাদ মাধ্যমকে ওরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার কাজেই ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের যে প্যারাডাইম তৈরি হয়ে আছে সেটা ভাঙ্গার জন্য কোনো ব্যবস্থা সমাজে নেই।

হালখাতা

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু পাশের রাষ্ট্র ভারত সেদিক থেকে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হলেও আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারত সেখানে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। কারণ সেখানে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাবস্থা রয়েছে। তবে ভারতে দুর্নীতি নেই তা বলব না।

হালখাতা

ভারতে দুর্নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ এর কথা বললেন। সেই নিয়ন্ত্রণটা কোথায়?

মঈন চৌধুরী

ভারতে দুর্নীতির ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা হলো– ভারতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কারণেই সেখানে একজন কৃষকের তুলনায় আরেকজন কৃষকের চিন্তাভাবনার খুব বেশি পার্থক্য নেই বা বলা যায় এক পেশার লোকের থেকে অন্য পেশার লোক নিজেকে খুব বেশি আলাদা ভাবে না– অর্থাৎ এত জাত-পাতের মানুষ থাকা সত্ত্বেও অন্তত তারা প্রায় কাছাকাছি একটি চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে থাকছে বাংলাদেশের মতো খুব দ্রুত কোটিপতি হওয়ার কোনো পথই সেখানে খোলা নেই। সেখানে একজন মন্ত্রী-মিনিস্টারও যদি ঘুষ খায় তার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম নিয়ন্ত্রণটা এখানেই, বাংলাদেশে সেটা নেই। ইদানিং বাংলাদেশের 'দুদক' যদি ভারতের সি বি আই-এর মতো শক্তিশালী হয়, তবেই 'নিয়ন্ত্রণ' আসবে কিছুটা।

হালখাতা

তাহলে কি এটা বলা যায়, সুযোগের অভাবে ভারতীয়রা দুর্নীতি করতে পারছে না?

মঈন চৌধুরী

হ্যাঁ সেটা তো কিছুটা বলা যায়ই। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে চুরি, ডাকাতি বিষয়গুলো আছে। একটি দেশের আইন-কানুন এবং তার প্রয়োগের কারণে মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে এবং বিরত থাকতে থাকতেই এক সময় তারা দুর্নীতি না করার জন্য অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভারতসহ অন্যসব দেশে, সেখানে দুর্নীতি কম, সেখানে তারা যে শুধু সুযোগের অভাবে দুর্নীতি করে না বিষয়টি পুরোপুরি তা নয়, তাদের মনস্তত্ত্ব দীর্ঘদিন যাবত তৈরি হয়েছে দুর্নীতি না করার জন্য। সে জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগ পেলেও তারা দুর্নীতি করে না। বাংলাদেশে সেই দৃশ্য বলা যায় প্রায় অনুপস্থিত। বাংলাদেশের মানুষের মনস্তত্ত্বটা দীর্ঘদিন ধরে বরং দুর্নীতি করার জন্যই তৈরি হয়েছে।

হালখাতা

তাহলে আপনি কি বলতে চান, ভারতীয়রা দুর্নীতি করে না?

মঈন চৌধুরী

আমি তো বারবার বলেছি, দুর্নীতি করে না, সে কথা বলা যাবেনা। তবে তাদের দুর্নীতির ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আছে যা আমি আগেই বলেছি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, ইন্ডিয়াতে কনসালটেন্সির একটি কাজের একটি ঘটনা আমি জানি। দিল্লি থেকে

হায়দারাবাদ পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরির কাজটি পাওয়ার জন্য সর্বমোট আট লক্ষ টাকা ঘুষ বাবদ বরাদ্দ রাখা হলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কর্তৃপক্ষ দেড় লক্ষ টাকার বেশি ঘুষ নিতে রাজি হলো না। কেন রাজি হলো না? তার কারণটা ছিল দেড় লক্ষ টাকার বেশি নিলে তারা হজম করতে পারবে না। আমরা টাকা এখানে ব্যাংকে রাখতে পারি, বাড়ি বানাতে পারি, গাড়ি কিনতে পারি কিন্তু ওখানে সেটা সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক টাকা দেখলেই ওখানে, টাকার উৎস খোঁজ করা হয়।

সলিমুল্লাহ খান

কেন, তাদের বালিশ ছিল না?

মঈন চৌধুরী

এখন কথা হলো, এটা হলো কেন? এটা হয়েছে ভারতে দুর্নীতিবিরোধী কন্ট্রোল আছে বলে।

হালখাতা

এবার খান ভাই। মঈন ভাই যে বললেন, নানা সমস্যার কথা, বিশেষ করে ভাষা সংস্কারের কথা–এ বিষয়ে আপনি কি একমত? নাকি আপনি অন্য কোনো উপায়ে এর সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন?

সলিমুল্লাহ খান

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি একমত। কিন্তু তিনি যে ভাষাগত সংস্কারের কথা বললেন সেখানে যাওয়ার উপায় কী? সেটা কি একটা অধ্যাদেশ জারি করলেই হয়ে যাবে? বলে দিলেই হবে যে, আপনারা কেউ ভাষাকে এভাবে ব্যবহার করবেন না? আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে না। তাহলে উপায়টা কী? ধরেন জামাই ঘুষ না খেলে মেয়ে বিয়ে দেয়া হয় না। এখানেই তো দুর্নীতির সূত্রপাত। সমাজে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, বলতে হবে জামাই ঘুষ খেলে মেয়ে বিয়ে দেব না। এখন কথা হলো– ঘুষ যে উপকারী, ভালো জিনিস এই চিন্তা আসে কোথা থেকে এটা খুঁজে বের করতে হবে। এটা খুঁজে পেলেই এই পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। 'ঘুষ'-কে যদি সমাজ উপরি-আয় বলে সম্মানজনক অবস্থান দেয়, তাহলে এই ভাষাগত ভিন্নতর ব্যবহারে কাজে আসবে না। দুর্নীতির বিষয়টি ভাষা নয় বরং সেটা আমাদের বাসনার মধ্যেই ঘটে থাকে। এবং কেন ঘটে থাকে সেই পথ বন্ধ করলেই ভাষার সংস্কার সমাজে এসে যাবে। তখনই সৎপাত্রে কন্যা দান করতে আগ্রহ তৈরি হবে– অসৎ পাত্রে মানুষ আর কন্যা বিসর্জন দেবেনা– আমি এটাকে...বিসর্জনই বলব। মঈন ভাই বললেন পুরস্কারের কথা। একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন পুরস্কার দুর্নীতি সৃষ্টি করে। তার নাম জাঁপল সার্ত্র। সার্ত্রকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো– উনি নিলেন না– ওই সময় আরেকটি পুরস্কারের

ব্যবস্থা ছিল রাশিয়ায়, 'লেনিন পুরস্কার' । সার্ত্র বল্লেন, আমাকে যদি 'লেনিন পুরস্কার'ও দেয়া হয় আমি নেব না । পৃথিবীর অনেক পুরস্কার রয়েছে, সে সব পুরস্কার যে দুর্নীতির আখড়া নয় তার প্রমাণ কী? ধরেন সালমান রুশদীর কথা, উনি যদি নিজের ভালো রচনাগুলোর জন্য বুকার পুরস্কার পেয়ে থাকেন তাহলে আমার আপত্তি নাই– কিন্তু আমার অভিমত রুশদি মুসলিম সমাজের নিন্দা করেছেন সে জন্যই তাকে বুকার দেয়া হলো । তসলিমা নাসরিনকে যে পুরস্কার দেয়া হলো, সেটা সে ভাল লিখে বলে নয় বরং সে বাঙালি নারী হয়েও মুসলিম সমাজের নিন্দা করেছে বলে । সু-লেখক আমাদের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অসুস্থ ছিলেন, সে জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার নিতে বাধ্য হলেন– অথচ আনন্দ পুরস্কার দুর্নীতিগ্রস্ত সে কথা ইলিয়াসও বহুবার বলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সেটা নিতে বাধ্য হলেন । মানুষজন পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ছাড়া কারো বই পড়তে চায় না , তা না হলে বইয়ের গায়ে কেন লেখা থাকে 'আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত'? এসবই দুর্নীতি । আমাদের মঈন ভাই, তিনিও এই পুরস্কার একদিন পাবেন– আমি দোয়া করি । আমি এও দোয়া মানে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই পুরস্কার গ্রহণ না করেন ।

মঈন চৌধুরী
আনন্দ পুরস্কার আপনি পেলে...

সলিমুলহুদা খান
আমি আনন্দ পুরস্কার পেলে কী করব সেটা ভবিষ্যতে বলব । এখন এ বিষয়ে আপাতত কিছু না বলি । তবে আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি– এ পুরস্কার আমি পাব না ।

হালখাতা
এই যে আপনি তসলিমা নাসরিন এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা একইসঙ্গে বললেন; তসলিমা হয়ত এমন অবস্থায় ছিলেন না যে তিনি পুরস্কার গ্রহণ না করলে তার বড় ধরনের সমস্যা হয়ে যাবে– কিন্তু ইলিয়াস যে অবস্থায় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য তার অনুশোচনাবোধ ছিল । এই দু'জনকে আপনি কি এক করে দেখবেন?

সলিমুলহুদা খান
না ভাই আমি দু'জনকে এক করে দেখছি না, আমি এ বিষয়ে এখন আর কথা বাড়াতে চাই না ।

হালখাতা

আরেকটা প্রশ্ন, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের সম্পদ জিজ্ঞেস না-করে নিয়ে সেটা দ্বারা বিপ্লবের ব্যয়ভার বহন করা– এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সলিমুলহ্ক খান

(একটু উত্তেজিত হয়ে) আমি এখানে কমিউনিজমের নিন্দা করতে বসিনি। সেটা ঘটে থাকলে তার প্রেক্ষাপট দেখতে হবে। এসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, এখন আমরা দুর্নীতি নিয়ে আলোচনায় বসেছি– কাজেই দুর্নীতির বাইরে অন্য কোন বিষয়ে কথা বলতে চাই না।

হালখাতা

নিন্দা করার কথা বলছিনা, কমিউনিজম নিয়েও সমালোচনা হতেই পারে। জানতে চাচ্ছি যে, এটা দুর্নীতি কিনা।

সলিমুলহ্ক খান

না আমি সেটা মনে করি না। আমি কোনটিকে দুর্নীতি মনে করি শোনেন। লাল বিপ্লবের বিপরীতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা প্রসঙ্গে আসি– একটি যুক্তিসংগত ও মৌলিকভাবে নির্যাতিত মানুষের রাষ্ট্র-দর্শনের বিপরীতে গিয়ে মানুষের বঞ্চনাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য কিছু লোক দরকার হয়– অর্থাৎ যারা সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছে, তাদের পুরস্কার দেয়া হলো বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। আমি এটাকে দুর্নীতি মনে করি। যে উদ্দেশ্যে কমিউনিজম চালু হয়েছিল সেটাকে দুর্নীতি মনে করি না, কিন্তু কমিউনিজমের নামে একটা লোক যদি সম্পত্তি দখল করে ব্যক্তিগত ফাণ্ডে রাখে সেটাকে আপনি কী বলবেন! বলেন তো দেখি কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো'র ব্যাংকে কত টাকা আছে...? ফিদেল কাস্ত্রো আজ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন, তিনি কয় আনা দুর্নীতি করেছেন? কাস্ত্রো'র মেয়েরা কোন মন্ত্রীর পদ দখল করেছেন? তাঁর ছেলেরা কী কী দুর্নীতি করেছে? কেউ বলুক, তাহলে ভাবব, কমিউনিজম মাত্রই দুর্নীতি। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রকে তো নোবেল প্রাইজ, ইংলান্ডের স্যার উপাধি, এর কোনোটাই দেয়া হবে না– এ দ্বারা আমরা কী বুঝব? বাংলা একাডেমীর কথা মঈন ভাই বলেছেন বলে আমি রিপিট করলাম না।...

মঈন চৌধুরী

শুধু বাংলা একাডেমী নয় বাংলাদেশের সকল পুরস্কারই দুর্নীতিগ্রস্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।। সবশেষে একটি বলে আলোচনা শেষ করতে চাই, আমি যে দুর্নীতি প্রতিকারের ক্ষেত্রে সাইকো-থেরাপীর কথা বললাম– এর পদ্ধতি কী হতে পারে; আমার মনে হয় আমাদের সমাজ থেকে যদি দুর্নীতি দূর করতে হয়– সেক্ষেত্রে এখন যে পদ্ধতিগুলোকে দুর্নীতি দূর করার উপায় হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে, তার আরেকটু গভীরে গিয়ে সাইকো-এ্যানালাইটিকাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্নীতির মূলে গিয়ে সোশ্যাল সাইকো–থেরাপির ব্যাবস্থা করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখতে হবে, আমি আলটিমেটলি সেই দিকটির ওপরই জোর দিতে চাই।

হালখাতা

মঈন ভাই ও খান ভাই, আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ। দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ করা যায়। তবে মঈন ভাইয়ের সঙ্গে আমরাও একমত যে, সামাজিক মানুষের 'মন' দুর্নীতির পক্ষে থাকলে দুর্নীতি দূর হবে না। সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে দুর্নীতির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

[সমন্বয় ও গ্রন্থনা: শরমিন নিশাত ও শওকত হোসেন।

দুর্নীতি নিয়া কয়েকটা কথা

ফ য়ে জ আ ল ম

দুর্নীতি নিয়া এখন খুব কথাবার্তা হচ্ছে। চারপাশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ জিহাদ ভাব। আমার নিজের দেশের কথা খালি বলছি না। এই ব্যাপারটা নিয়া আলোচনা-সমালোচনা বিশ্লেষণ চলছে অনেক দেশেই। পত্রিকায় বড় বড় শিরোনামে খবর দেখা যায় অমুক প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন, তমুকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

এইরকম খবর দেখলে আমার ভালোই লাগে। মনে হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী যুদ্ধটাই না হচ্ছে ঐসব দেশে! হয়তো শেষে ঐ যুদ্ধবাজ ফেরেশতা ভদ্রলোক সমুদয়ের তৎপরতায় আর চাপে গোটা দেশের মানুষ ফেরেশতাই হয়ে যাবে।

আসলে আমরা কারে দুর্নীতি কই সেইটাই পরিষ্কার না। এইটা বোঝার জন্য সরকার বা অন্য কোনো সংগঠনের কথায় বিশ্বাস রাখতে পারি আবার নিজের মতো করেও বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারের নীতি লঙ্ঘন করে কাজ করা এবং এর মাধ্যমে কিছু পাওয়ার ব্যাপারটাকেই দুর্নীতি বলা হচ্ছে। মোটা দাগে বলা যায় ঘুষ নেয়া, স্বজনপ্রীতি, আর দলপ্রীতির কাজগুলোই এখনকার বিবেচনায় দুর্নীতি। এই মানদণ্ড ঠিক করেছে সরকার। কারণ নীতি বলতে বোঝায় সরকারী নীতি। এ কালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্য কোনো নীতির কানা পয়সার মূল্য নাই। বুড়া মা-বাবাকে ইজ্জতের সাথে লালন-পালন করা আমাদের গ্রামসমাজের নৈতিকতার বিচারে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সকল ধর্মেই তাই। কিন্তু রাষ্ট্র এই ব্যাপারে উদাসীন। রাষ্ট্র এইটাকে নৈতিকতা বলে না অনৈতিকতাও বলে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের চোখে এই ব্যাপারটা নৈতিকতার বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যই না। এই কারণে বললাম এখন নৈতিকতা বলতে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের নির্দেশিত নৈতিকতা।

এ পর্যায়ে একটা কথা বলে নিই। দুর্নীতি অর্থাৎ ঘুষ, স্বজনপ্রীতি আর দলপ্রীতি যে আমাদের দেশটাকে জন্মের পর থেকেই খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে সেই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নাই। সমাজের প্রায় প্রত্যেকটা লোক এর শিকার। এর কারণে অনেকের বেলায় আইনকানুনও স্থগিত হয়ে থাকে। সরকারী কোনো কোনো পরিকল্পনা

ও প্রকল্প পর্যন্ত সফল হতে পারে না। এর শুরু কোথায়, আর কিভাবে? আর সেইটা বোঝার জন্য আমাদের দুর্নীতির মনস্তাত্ত্বিক দিকটায় দৃষ্টি দিতে হবে।

একজন লোক দুর্নীতি করে কয়েকটা কারণে। এক: ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের জন্য, দুই: পছন্দের ব্যক্তি বা স্বজনদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, তিন: আত্মগত কারণে অর্থাৎ মনের খেয়াল-খুশি বা রাগ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার কারণে। তিন নম্বর দিকটা আমাদের এখানে আলোচিত হয়না, হয়তো এর দৃষ্টান্ত কম বলে। কিন্তু বাস্তবে এর দৃষ্টান্ত কম হলেও দুর্নীতি সৃষ্টিতে এর ভূমিকা কম নয়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার নমুনা আমাদের এখানে চোখে পড়ার মতো। এর মধ্যে নগদে ঘুষ নেয়ার ব্যাপার আছে, সরকারী নীতিমালা অমান্য করে সম্পদ কুক্ষিগত করার ঘটনা আছে। এসবই সরকারের নিম্ন-পদের কর্মচারী থেকে শুরু করে মন্ত্রীদের পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা এর ঐতিহাসিক পরম্পরাটা একটু খুঁজে দেখি–

রাজা-বাদশাদের শাসনামলে ঘুষের চলন ছিলো। বাদশা বা সুবেদারের কর্মচারীরা এখানে সেখানে ব্যবসায়ী, জোতদার ও সম্পদশালী গৃহস্থদের কাছ থেকে ভেট বা উপহার আদায় করতো। তবে সমাজের সকল মানুষের কাছে ভেট চাওয়া হতো না। আর এই চর্চা সকল কর্মচারীর মধ্যে ছিলোও না। অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিলো।

ঘুষ দিয়ে একটা দেশের প্রশাসক পাল্টে দেয়া বা সেই দেশের স্বাধীনতা বিলোপ করার নমুনা ধূর্ত মহান বৃটিশ জাতির কীর্তি। ভারতীয় উপমহাদেশে বানিজ্যের অধিকার লাভ থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা হরণের কাজে বৃটিশরা অস্ত্রের মতোই ব্যবহার করে ঘুষকে। ওরা দেদারসে ঘুষ দিয়েছে, ঘুষ নিয়েছে তার চেয়ে বেশি করে । ঐ সময় নবাবী পাওয়ার জন্য ইংরেজদের বিরাট অংকের ঘুষ দিয়েছিলেন মীরজাফর। এইসব ঘটনা সকলেরই জানা আছে।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর উপহার হিসেবে ঘুষের ব্যাপক চল হয়। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিয়ে জমিদারী বা খেতাব বাগিয়ে নিতো ঐ সময়ের পয়সাঅলা লোকেরা। এই প্রবণতা পরের দুইশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো আর ছড়িয়ে পড়েছিলো নিচের দিকে। যে সব বৃটিশ কর্মকর্তা এদেশে শাসনব্যবস্থা বা খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কামকাজ করতো তাদের অনেকেই দুর্নীতি করে বিপুল টাকা কামাই করে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। আর অবৈধ উপায়ে অর্থ অর্জনে সহায়তা করেছে এদেশের লোকেরা। অর্থাৎ ইংরেজরা স্থানীয়দের হাতে কলমে দুর্নীতি শিখিয়েছে, নিজেদের স্বার্থেই। কাজেই এটি হঠাৎ করে এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি, দুর্নীতির ঐতিহাসিক পরম্পরা আছে।

দুর্নীতি হলো নৈতিকতার খেলাপ। নৈতিকতার সূচনা হয়েছে সমাজের সকল মানুষের ভালো করার ধারণা থেকে। সমাজের সকলের যাতে ভালো হয়, কারো ক্ষতি না হয় সে জন্য কোনো কোনো কাজ করা, আর কোনো কোনো কাজ না-করার

বিষয়টিই নৈতিকতা। নৈতিকতার এই ধারণার বড় একটা অংশ জীবন যাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কামাই করা, বাকীটা ধর্মবোধ থেকে। এই ব্যবস্থা সকলে মানে নাই বা মানতো না বলেই নৈতিকতা কথাটা জন্ম নিয়েছে, এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে, দুর্নীতির জন্য শাস্তির বিধান হয়েছে। কাজেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, সমাজে অনৈতিক কাজ বা দুর্নীতি একটা অবিরাম ব্যাপার। সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ কল্পনামাত্র। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ সফরে কখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কখনো শাসকগোষ্ঠী ছিলো নৈতিকতার মা-বাপ।

আমাদের সময়ে নীতি ও নৈতিকতার ধারক-বাহক হচ্ছে রাষ্ট্র স্বয়ং। নীতি ভাঙলে রাষ্ট্রই ভর্ৎসনা করে বা শাস্তির ফতোয়া দেয়। নীতির সমর্থনে তৈরি হয়েছে আইন ও শাস্তির বিধান। কাজেই নীতি ভাঙার আগে যে-কেউ এই শাস্তির কথা চিন্তা করবে। এইটা একটা মানসিক প্রক্রিয়া। যখন সে নিশ্চিত হবে তার শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন সে দুর্নীতি করবে, এর আগে না। এমন উদাহরণ বিরল যে শাস্তি হবে জেনেও কেউ দুর্নীতি করছে। এর অর্থ হলো যে সমাজে দুর্নীতি হচ্ছে সেই সমাজে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে যে, আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকে নিশ্চিত নয়। সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, একটা সমাজে তখনই ব্যাপক হারে দুর্নীতি হতে পারে যখন আইনের প্রয়োগ প্রায় হয় না বললেই চলে। কাজেই তাত্ত্বিকভাবে দুর্নীতির জন্য এক নম্বরে দায়ী হচ্ছে আইন, আইনের প্রয়োগকারী ও রক্ষকেরা।

প্রথমে স্বল্প পরিসরে কিছু কিছু জায়গায় দুর্নীতি শুরু হয়। যখন সেইসব দুর্নীতি প্রতিরোধ করা হয় না, দুর্নীতিকারীর শাস্তি হয় না তখন অন্যরা একই রকম দুর্নীতির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলে উৎসাহিত হয়। উৎসাহিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ে। এক পর্যায়ে তারা সংখ্যায় এতটাই বেশি হয়ে পড়ে যে জনগণের একটা অংশ বাধ্য হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়, আত্মরক্ষার জন্য কখনো বা একটু ভালোভাবে ও স্বচ্ছন্দে বাঁচার জন্য।

অপরাধীদের ধরে জেলে দেয়া বা ফাঁসীতে লটকানো আইনের আসল কাজ না। আইনের মুখ্য কাজ হচ্ছে শাস্তির ভয় দেখিয়ে সম্ভাব্য অপরাধীদের নিরুৎসাহিত ও ভীত করা যাতে সে অপরাধ না করে। এ কারণে আগের কালের সমাজে শাস্তি দেয়া হতো প্রকাশ্যে। উদ্দেশ্য, সবাই যাতে নিশ্চিত হয় যে এই রকম অপরাধ করলে এই এই শাস্তি হবে এবং শাস্তি হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত। এখনো কোনো কোনো দেশে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার নিয়ম আছে। কাজেই দুর্নীতিকে যেভাবেই উল্টাপাল্টা করে দেখি না কেন তা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক দায়ভার আইন আর তার প্রয়োগকারীদের ওপরই পড়ে।

এরপর ভাবা দরকার শুরুতে দুর্নীতি কোন স্তরে বেশি দেখা দেয়, উপরের স্তরে নাকি নিচের স্তরে। সরকার প্রধান, মন্ত্রী, সাংসদরা প্রথমে দুর্নীতি আরম্ভ করেন, নাকি পিয়ন-দারোয়ান-কেরানীরা। এ প্রশ্নটার মীমাংসা খুব জরুরী। কেননা মহামারী আকারে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার কারণগুলা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে তার সূচনা কোথায়।

ঐতিহাসিক কালে দুর্নীতি যে কেবলই ক্ষমতাবানদের আয়ত্তে ছিলো তা আগে উল্লেখ করেছি। এমনকি উপরের স্তরের লোকেরা দুর্নীতিকে দুর্নীতিই মনে করতো না। যেমন এ উপমহাদেশে ছুৎমার্গের স্রষ্টা ব্রাহ্মণরা একবার অদ্ভুত নীতি জারি করেছিলো। তা হচ্ছে চণ্ডালের মতো নিচু জাতির মানুষ অস্পৃশ্য হলেও, চণ্ডাল নারীর সাথে ব্রাহ্মণরা যৌনসম্ভোগ করতে পারবে। তো সেইকালে উপরের স্তরের মানুষদের মধ্যে এইরকম আচানক নৈতিকতা বা অনৈতিকতার বহু নমুনা ছিলো।

আসলে আইনকে অকেজো করে রেখে দুর্নীতি করতে হলে প্রয়োজন ক্ষমতার সমর্থন ও প্রয়োগ। সরকারের নিচের পর্যায়ের লোকদের ক্ষমতা একেবারেই সীমিত, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার ওপরও নির্ভরশীল। কাজেই প্রথমে নিচের দিকে দুর্নীতি শুরু হলে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব। আসলে আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই গড়ে উঠেছে এই ধারণা নিয়ে যে, সাধারণ মানুষ বা নিচের দিকে কর্মচারীরা দুর্নীতি করবে। তাই তাদের দুর্নীতি রোধ করার কৌশলও গ্রহণ করা আছে। এই কৌশল অর্জিত হয়েছে শত শত বছরের পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতা থেকে। তা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই ক্ষীণ, যদি-না উপরের দিকে কোনো গোলমাল ঘটে। এই ব্যবস্থায় উপরের দিকের মানুষদের নৈতিকতার রক্ষক বলে ধরে নেয়া হতো। তারাই নৈতিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, ব্যাখ্যা যোজনা করেছেন, শাস্তির বিধান দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এ ব্যবস্থায় ধরে নেয়া হয়েছে যে, নীতির রক্ষকেরা দুর্নীতি করবেন না। আমার ধারণা দুর্নীতি বা অনৈতিকতা নিয়ে আগ্রহী কেউ গবেষণা করলে আমরা দেখতে পাবো আদি বা মধ্যযুগ থেকে শুরু করে দুর্নীতি কেবল উপর থেকে নিচের দিকে ছড়িয়েছে।

আধুনিককালে 'আইন সবার জন্য সমান' শ্লোগানটা সৃষ্টি করার পর থেকে এ বিষয়ে নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও উপরের সারির মানুষদের দুর্নীতি রোধে তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত তৈরি হয় নাই। তাই সরকারের বা কোনো সংগঠনের উপরের সারির ব্যক্তিরা দুর্নীতি শুরু করলে তা সহজে বন্ধ হয় না, বরং জড়িয়ে নেয় নিচের দিকের অনেককে। এই ধরনটা এখন অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে। উপমহাদেশে বৃটিশদের দুর্নীতির স্বভাব ছিলো ঐ রকম, আগে যা নিয়ে কিঞ্চিত কথা বলেছি।

তবে, মহামারী আকারে দুর্নীতি ছড়িয়েছে স্বাধীনতার পরে। এইটাই স্বাভাবিক, যা শুরু হয় তার কোনো স্থিতাবস্থতা থাকে না, হয় উঠতে উঠতে চরমে পৌঁছবে, নয়তো পতিত হতে থাকবে। তবে এর মাঝামাঝি কোনো একটা সীমার মধ্যেও তা কমতে বাড়তে পারে কিন্তু আমাদের দেশে দুর্নীতি রোধে বিশেষ প্রয়াস ছিলো না বলে তা কেবল বিস্তৃত হয়েছে। এই যে মহামারী আকারে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার কথা বললাম তার সূচনা কিন্তু উপরের সারি থেকে। সম্প্রতি আমরা তার বাস্তব প্রমাণ পাচ্ছি, এত বেশি প্রমাণ যে এই নিয়া তর্ক তোলারও সুযোগ নাই।

তিন নম্বরে আরেকটা জটিল দিক সম্পর্কে কয়েকটা কথা কইতে হয়। যে নীতি বা নীতিমালা ভাঙ্গার ব্যাপারটাকে বলছি দুর্নীতি সেইসব নীতির অবস্থাটা কেমন? সেই

সব নীতি মানলে সকল মানুষের ভালো হয় কি না, সেগুলা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি না, আর বৈষম্যহীন কি না তা তো দেখতে হবে। বৈষম্যহীন কথাটা আরেকটু খোলাসা করতে চাই। যদি একজন সরকারী কর্মচারী তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো মানুষের নিকট থেকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ গ্রহণ করে তবে তা হবে ঘুষ গ্রহণ অর্থাৎ দুর্নীতি। কিন্তু যদি কিছু দোকানদার দল বেঁধে প্রতিদিন সওদাপাতির দাম বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা লুটে নেয় তা হলে কি এই মুনাফা অর্জন দুর্নীতির মধ্যে পড়ে? যদি তা দুর্নীতি আখ্যায়িত না হয় তাহলে বলবো আমাদের দুর্নীতির সংজ্ঞায় খুঁত আছে। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। একজন সাংবাদিক যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃত ঘটনার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরে এমন জনমত সৃষ্টি করছেন যা পুরো ঘটনা প্রকাশ করলে ঘটতো না তখনো তাকে দুর্নীতি বলা হচ্ছে না। সামাজিক ও যুক্তির বিচারে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে রীতিমতো জুয়াচুরি হচ্ছে। বলা হচ্ছে অমুক সাবানের সামান্য ঘষাতেই সব ধবধবা পরিষ্কার। বাস্তবে তা ঘটে না। বলা হচ্ছে এই এই ক্রীম ব্যবহার করলে মুখের সব দাগ উঠে যাবে, রঙ ফর্সা হয়ে যাবে (কালা জাতের বাঙালির মনে ফর্সা হওয়া তো আলাদীনের চেরাগ পাওয়ার মতো, হয়তো প্রাক্তন বৃটিশপ্রভুরা ফর্সা হওয়ার কারণে)। অথচ সেই ক্রীমে দাগও উঠছে না, ফর্সাও হচ্ছে না। এই যে নানা কায়দার প্রতারণা, প্রকাশ্যে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, সেটা কি অনৈতিক নয় ? রাজনীতিবিদ বা যে কোনো জাতের শাসক ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়ায়, ঘোষণা দিয়ে থাকেন যে, তিনি ক্ষমতা পেলে অমুক অমুক কাজগুলা করবেন। পরে দেখা যায় তিনি কাজগুলা করেন না, ক্ষমতাও ছাড়েন না। এইটা কি প্রতারণার মধ্যে পড়ে না? আমাদের প্রচলিত নৈতিকতার বিচারে এর সবগুলাই পার পেয়ে যাচ্ছে।

দুর্নীতি নিয়ে কিছু সংগঠনের তৎপরতার কথা না বললেই নয়। যেমন ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল। এর দুর্নীতি বিচারের সূচকগুলো কি বৈষম্যহীন ? সেই সূচকে কি অন্যদেশে আক্রমণ, অন্যদেশ দখল, নির্বিচার গণহত্যা, নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের ব্যাপারগুলা অন্তর্ভুক্ত আছে? এগুলো যে অন্তর্ভুক্ত নেই তার প্রমাণ বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছিলো (না কি দ্বিতীয়; এইটা আমার কাছে কখনো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নাই বলে ভুলে গেছি।)। দুর্নীতি মাপার কাঠিতে ঐগুলা থাকলে বাংলাদেশ প্রথম হতে পারতো না, কারণ ঐসব কাজের একটাও করার মুরাদ নেই আমার দেশের। আমি বলতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে দুর্নীতির যে সংজ্ঞা মেনে কাজ করতে চাচ্ছি তা ত্রুটিপূর্ণ। অর্থাৎ দুর্নীতি শব্দটার অর্থ নির্দেশিত সীমানা কমিয়ে নেয়া হয়েছে ইচ্ছামতো।

আন্তর্জাতিকভাকে দুর্নীতির বাছবিচার আর প্রতিরোধ নিয়ে যা করা হচ্ছে তার মধ্যে আরেকটা গোঁজামিলের ঘটনা আছে: এই যে 'অমুক দেশ' 'তমুক দেশ' দুর্নীতিতে প্রথম বা পঞ্চম তার সবকয়টা আগে উপনিবেশ ছিলো; ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দখলে ছিলো ওরা। আমরা যদি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো দুর্নীতিটা যেন প্রাক্তন উপনিবেশগুলাতেই হচ্ছে।

আর যারা উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, উপনিবেশিত দেশের সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজের দেশ সমৃদ্ধ করেছিলো তাদের ওখানে দুর্নীতি তেমন সমস্যা না। অর্থাৎ তারা দুর্নীতিবাজ না।

তাহলে উপনিবেশী আগ্রাসনের কী হবে? গায়ের জোরে আরেকটা দেশ দখল করা, সেই দেশের মানুষকে নির্যাতন করে ওদের ঘাম শ্রমের ফায়দা লুটে নেয়া কি অনৈতিক না? আর এখন যে স্বৈরতান্ত্রিক বাজার (ওপেন মার্কেট) আর বিশ্বায়নের বাহানায় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে নয়া উপনিবেশিকতা, সেইটাও কি নীতিসম্মত?

আরেকটা কথা। দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তিকে ফেরেশতা ভাবা ঠিক হবে না। ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব আর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বিকশিত হয়। একই জায়গায় একদল ইবলিশ আরেকদল ফেরেশতা বাস করে এমন ধারণা করলে শেষে ঠকতে হবে। কাজেই অমুকে দুর্নীতিবাজ বলে তাকে সরিয়ে তমুককে বসালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন ধারণা প্রায় বিপর্যয়কর। বরং আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি গোটা সমাজকেই আক্রান্ত করেছে, অতি বিরল দু-একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। তার পরিবর্তে খুঁজে বের করতে হবে এমন একটি বিন্যাস ও কৌশল যাতে পাল্টাপাল্টি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকবে, এমন স্বচ্ছতা থাকবে যেন দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সরাসরি জানতে পারে। যেহেতু দুর্নীতির সূচনা উপরের স্তরে তাই ঐ স্তরে ক্ষমতার পরিমাণ আরো কমিয়ে আনতে হবে। দুর্নীতিকে উপলব্ধি করার আর প্রতিরোধ করার যে-কোনো উদ্যোগে এই বিষয়গুলো ভাবনায় রাখা জরুরী।

বিশ্বপুঁজিবাদ ও দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব

আ হ মে দ স্ব প ন মা হ মু দ

কোন্ ধরনের সমাজকাঠামো দুর্নীতি উৎপাদন করে, কোন ধরনের কলকব্জা ও প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি উৎপাদনে সহায়তা করে এবং একে টিকিয়ে রাখে, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক কী, পুঁজির সাথে অর্থাৎ বিশ্বপুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সাথে দুর্নীতির সম্পর্কের ধরন, সমাজে দুর্নীতির ভিত কিভাবে মজবুত হয়, কারা দুর্নীতি তৈরি করে এবং কারা এর ছত্রছায়ায় বাস করে, ক্ষমতা তথা ক্ষমতাকাঠামোর সাথে দুর্নীতির দফারফা কী নিয়ে, তার স্বরূপ কী; রাষ্ট্র, জনগণ, বহুজাতিক কোম্পানি, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আর এদের দোসর বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি তথা বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক ও ধরন, জনমানসে নীতি বা দুর্নীতির প্রশ্নে কোন ধরনের রূপ ও স্বরূপ কাজ করে, সমাজে কী কী শর্ত দুর্নীতি তৈরি করে বা করে না, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রশ্নে জনগণের দায় ও দায়িত্বে দুর্নীতি কোন ধরনের প্রপঞ্চ হিসেবে কাজ করে বা করে না ইত্যাদি প্রশ্ন খোলাসা না করে দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারা কঠিন।

যে পদ্ধতি বা কর্মপন্থাকে আমরা দুর্নীতি প্রতিরোধের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করছি, সেখানে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো কদাচিৎ গুরুত্ব পায়। কেন এসব বিষয় গুরুত্ব পায় না তার পেছনে হিসেব নিকেশ আছে– আর আছে বলেই এই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় সকল তন্ত্রমন্ত্র, অধিকার-মানবাধিকার, ন্যায্যতা-সমতা, সভ্যতা-ভব্যতা ইত্যাদি গুরুত্বহীন, বরং পুঁজির দাসত্বের কাছে সব ম্লান হয়ে যায়। বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতির তথা জীবনাচরণের সকল ক্ষেত্রের ধারকবাহক যখন পুঁজি, যার লক্ষ্য মুনাফা, সেখানে সমাজকাঠামোর প্রশ্ন গুরুত্ব কম পাবে, আশ্চর্য নয়। যে অগণতান্ত্রিক, অন্যায্য সমাজকাঠামো আমরা চাই না, সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সমাজে থেকেই অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের ছায়ায় থেকেই দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছি।

বাজারে দুর্নীতি বহুল আলোচিত শব্দ। শব্দটি নিজের ক্ষমতায়ই এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এর অর্থ ও মর্মার্থের সাথে সুপরিচিত। দুর্নীতির রীতিনীতি এমন একটি ঘোর তৈরি করেছে যে কেউই আর এর

বাইরে নেই। রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ দুর্নীতির ওপর সওয়ার– আর তার ওপর বিশ্বপুঁজিবাদ– আমেরিকা ও তার সহযাত্রীরা– বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি-বহুজাতিক কোম্পানি। রাষ্ট্রের বৈধতা থেকে শুরু করে দারিদ্র্য নিরসন সবকিছুর সমাধানের যারা নিয়ামক তারাই দুর্নীতির ত্রাতা। এক মহা দানবীয় শক্তি নিয়ে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দুর্নীতি আমাদের সামনে হাজির-নাজির। আর পুঁজির দাস হিসেবে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে– বুর্জোয়া সমাজের প্রতিভূ হিসেবে দুর্নীতি বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, সেখানে দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা আর যাই হোক সমাজের মৌলিক কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন যে আনতে পারবে না তা আমরা প্রায় সকলেই জানি।

রাষ্ট্র যখন পুঁজির দাস হয়– তখন এর মদদদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভুঁইফোড় হয়ে ওঠে– কারণ শিষ্য না পেলে ওস্তাদি ঠিকমতো হয় না। ফলে ওস্তাদ ও শিষ্যের সম্পর্ক আর রাষ্ট্রের সাথে পুঁজিওয়ালাদের সম্পর্ক এক; প্রশ্ন, কে কার ওপর কখন সওয়ার হয় সেটা নিয়ে। রাষ্ট্র কোন নীতির ওপর চলে, কে বা কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, ক্ষমতাকাঠামো কে কার কতটা নিকটাত্মীয় তাই নির্ণয় করে দেয় রাষ্ট্রের চরিত্র।

নীতির প্রশ্নটি দার্শনিক, দর্শনশাস্ত্রের একেবারে গোড়ার কথা– অ আ ক খ। নীতিপ্রশ্নে দর্শন ও তত্ত্ব এবং দুর্নীতির প্রশ্নে তার রূপ এক নয়। নীতির দার্শনিক ভিত থাকলেও দুর্নীতির ভিত সমাজ ও রাজনীতি। ফলে দুর্নীতি প্রশ্নে রাজনীতি কী ভূমিকা পালন করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশ হিসেবে যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতার সাথে ছিল তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা দরকার, অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত কর্মসূচির অংশ হিসেবে।

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের চেহারার সাথে দুর্নীতির চেহারা এক করে না দেখলে এ সময়ে তার রূপ বোঝা প্রায় অসম্ভব। কারণ দুর্নীতি তৈরির মেশিন হিসেবে পুঁজি বিশ্বব্যাপী যে খবরদারি ও শাসন কায়েম করছে, জনসম্পদ ও ইতিহাস-সংস্কৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে সেই প্রক্রিয়ার বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে দুর্নীতি হাজির হচ্ছে এবং আলাদা চেহারা ধারণ করে দুর্নীতি নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলছে। এই বিশিষ্ট করে তোলার পেছনে তার স্বার্থ জড়িত, তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও নর্তনকুর্দন জড়িত। কিন্তু যে কাজটা বিশ্বায়ন বা এর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো করে তা একটি বৈধতা নিয়ে হাজির হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুর্নীতির বৈধতা কী? অপরাধ তো অপরাধই, এর বৈধতা মানে ক্ষমতার বলয়ে চাপানো নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য শর্ত। এবং এরকম করার ফলেই দুর্নীতি-বিরোধী স্লোগান নিয়ে যখন রাষ্ট্র হাজির হয় বা পুলিশ বা সামরিক বাহিনী বা পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদী সংগঠন হাজির হয়, তখন এমনভাবে তা জনগণের সামনে আসে যে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই জনপ্রিয়তা এক ধরনের বৈধতা তৈরি করে, যা বিপজ্জনক।

রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তায়নের যে তকমা রাজনৈতিক দলগুলোর গায়ে লাগছে এ নিয়ে বিস্তর কথা তোলা দরকার। আবার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে রাজনীতিক,

আমলা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ি– যারা জেলহাজতে তাদের সাথে রাষ্ট্রের স্বার্থ-অস্বার্থ নিয়ে টানাপোড়েন কোথায় তাও ভাবতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় চাপরাশি প্রয়োজন হয়, মোসাবিদা করার লোক লাগে, চাকর বাকর, আর্মিপুলিশ, আইন, ক্ষমতা সবই লাগে– আমজনতারও দরকার হয়। রাষ্ট্রের মৌলিক কোনো পরিবর্তনের কথা জোরেশোরে হচ্ছে না, প্রায় একইরকম সুরে ও স্বরে সরকারের তাল লয় সব চলছে; দুর্নীতির আশ্রয়প্রশ্রয় পেয়ে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বেড়ে উঠেছে, তারা কি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল? তাছাড়া, এ সময়ে বিশ্বব্যাংক-এডিবি-আইএমএফসহ তেলগ্যাস কোম্পানিগুলোও সরব, রাষ্ট্রের পিঠে চড়ে বসে আছে। ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রশ্নটি আপাত খুব বড় মনে হলেও পেছনের সূক্ষ্ম এজেন্ডা কী তা আমলে নেয়ার দরকার আছে।

পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার একটি মাধ্যম দুর্নীতি, কারণ এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির স্বার্থ ও লাভালাভকে আমলে নিতে হয়। যারা সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, তাদের দুর্নীতি করার যে সক্ষমতার দরকার তা নেই, তারা দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতি করে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, এদের দোসর সংঘ বা সংগঠন। আমরা এখানে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতিকে নজির হিসাবে হাজির করতে পারি।

জাতিসংঘের সাংগঠনিক তালিকার দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায়, 'বিশ্বব্যাংক গ্রুপ' এদের মধ্যে অন্যতম এবং এর অন্যতম অঙ্গসংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট গুরুত্বপূর্ণভাবে দুর্নীতির তালিকায় স্থান পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পল উলফোভিৎসের কথা আমরা সবাই জানি, যিনি ইরাক যুদ্ধের নায়কদের একজন। গত মে ২০০৭ তারিখে তাকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। আবার অনেকে এও বলেন যে, ২০০৫ সালে পল যখন বিশ্বব্যাংকে যোগ দেন, সেই সময় ব্যাংকে ভয়াবহ দুর্নীতি ছিলো, এবং তিনি নাকি চেষ্টা করছিলেন কিভাবে প্রকল্পভিত্তিক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, অসদাচরণ ইত্যাদি রোধ করা যায়। এখানেই নাকি বিপত্তি দেখা দেয়, তার সহকর্মীরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং শেষপর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সহকর্মীদের চাপ সামলাতে না পেরে তাকে সরে আসতে হয়। হয়তো দুটি ঘটনাই সত্য, কিন্তু মূল প্রশ্ন বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান যা সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের কাছে অপরাধী ও জনগণের বিপক্ষের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত সেটি তার সাংগঠনিক কাঠামোর কারণেই দুর্নীতিতে লিপ্ত।

পলের বিশ্বব্যাংক ছাড়ার আগেই সাবেক ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান মি. পল ভলকারকে সভাপতি করে বিশ্বব্যাংক বোর্ড একটি কমিটি গঠন করে। ভলকার ইরাকে পরিচালিত জাতিসংঘের কর্মসূচি 'খাদ্যের জন্য তেল' কার্যক্রমের দুর্নীতি প্রকাশ করেছিলেন। উলফোভিৎসের ঘটনার তদন্তে পল ভলকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিশ্বব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক দুর্নীতি হয়। ব্যাংকের ৪০ শতাংশ কার্যক্রম বা কর্মসূচি দুর্নীতিগ্রস্ত। যে ২০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক বাজেট অনুসারে দরিদ্র দেশগুলোতে প্রকল্প সহায়তা দেবার কথা, যে অর্থের অধিকাংশ

আমেরিকার ট্রেজারি থেকে প্রাপ্ত, সেই অর্থ বিভিন্ন পকেটে চলে যায়। ভলকার প্রতিবেদনে ব্যাংকের দশ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারির মধ্যে উচ্চপদস্থ আমলাদের কতজন দুর্নীতিগ্রস্ত তাও উল্লেখ করেন। বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট রবার্ট যোয়েলিক এমন মেঘ ও ধোঁয়াশার মধ্যেই বিশ্বব্যাংকে যোগ দেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির যে কালি, তিনি তার কতটুকু কী করবেন তা সহজেই অনুমান করি আমরা।

আমেরিকা থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সমস্যা তুলে ধরে যেমন, বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের ক্ষেত্রে হিসাবপত্র, গোপনীয় চুক্তি, ঘুষ ও আত্মসাৎ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের ২০ শতাংশেরও বেশি বা বছরে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ বিতরণে দুর্নীতি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের ওপর অধ্যাপক রবার্ট ভন (Professor Robert Vaughn)-এর এক তদন্ত প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অসংখ্য সমস্যার কথা উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো প্রধানত দুর্নীতিগ্রস্ত। যেমন: বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে এর জন্য কর্মীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু দুর্নীতির প্রতিবেদন তৈরির জন্য পুরস্কৃত করা হয় না। বরং তথ্যমতে, যারা দুর্নীতির প্রতিবেদন করে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। ব্যাংক-এর 'ডিপার্টমেন্ট অব ইনস্টিটিউশনাল ইনটেগ্রিটি (আইএনটি)'র হাতে বর্তমানে ২৫০টি অভিযোগ রয়েছে। কাজ চলছে শ্লথ গতিতে। এমনকি এই বিভাগটিও স্বাধীন নয়। অধ্যাপক ভন-এর প্রতিবেদনে এই প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনভাবে কাজের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে ব্যাংকের ৬০০ মিলিয়ন ডলারের এক কার্যক্রম দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়, কিন্তু এই বিষয়টি গোচরে আনতে ২ বছর সময় লাগে, এবং উন্মুক্ত তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয় চার বছর। শেষমেশ বিশ্বব্যাংকের এই কার্যক্রমে চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক কমিশনকৃত অধ্যাপক ভন-এর প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করেনি, পরে গভর্ন্যান্স একাউন্টেবিলিটি প্রজেক্ট ২০০৬ সালে এটি প্রকাশ করে।

কাজেই বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান যখন এদেশে সুশাসন কায়েমের পরামর্শ, আদেশ-নির্দেশ-শর্ত দেয় তখন অবশ্যই প্রশ্ন তৈরি হয়। আমেরিকার গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার তেমন কিছু নেই, দুনিয়া জানে, ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনে কিভাবে নির্বিচারে নারী-পুরুষ-শিশু তথা আবালবৃদ্ধবণিতা হত্যা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এক্ষেত্রে আদৌ কি নৈতিক কোনো ক্ষমতা রাখে সুশাসনের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার? সেই ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান কথা বলে কেন? তারপরও দুর্নীতির যে অর্থনীতি-রীতিনীতি আছে, চাকর-বাকর-উজিরনাজির আছে সেইসব টিকিয়ে রাখার জন্য হয়ত কথা বলে। অথচ মুক্তবাজার অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দুর্নীতি যা পণ্য ও পুঁজি আমদানির সাথে ফ্রি হিসেবে এদেশে চলে আসে। গালগপ্প যতই করুক বিশ্বব্যাংক বা সমগোত্রীয়

প্রতিষ্ঠানগুলো, এদের প্রকল্প বা অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি বিষয়ে জেনে কেউই এখন আর অবাক হয় না।

বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পের কথা আমরা জানি। মনে করা হয়, এদেশে দুর্নীতি আমদানি করার পেছনে দায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলো, বিশ্বব্যাংক-এডিবির প্রকল্প এবং বহুজাতিক তেলগ্যাস কোম্পানিগুলোর অযাচিত লিপ্সা, বিনিয়োগ ইত্যাদি। এক কোটি টাকা মূল্যের গাড়ি উৎকোচ হিসেবে গ্রহণ করার দায়ে জনৈক মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়, কানসাটের জনআন্দোলন হয়েছিলো মূলত দুর্নীতি, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এশিয়া এনার্জি, নাইকো-অক্সিডেন্টাল এদেশে দুর্নীতি উৎপাদন কম তৈরি করে নি। বিশ্বব্যাংক-এডিবিও দুর্নীতি করেছে, এসব বিষয় আড়াল হয়ে যায় কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা কী ? রাষ্ট্র কার হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, সরকারের দায় আর রাষ্ট্রের দায় কি এক? দেখা যায়, রাষ্ট্রযন্ত্র নিজেই দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পুঁজির দাসত্ব চিরস্থায়ী করতে। সেখানে সরকার তো ঐ রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে সুতায় বাঁধা পুতুল মাত্র।

পুঁজির ধর্ম স্ফীত হওয়া। এই স্ফীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট উদ্যোগ ও স্বপ্নকে গলাধঃকরণ করে নেয় পুঁজি। পুঁজির স্ফীতির জন্যই বা পুঁজিকে বা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নেই প্রয়োজন হয় প্রতিষ্ঠানের। অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে তার সখ্য হতে হয়। দুর্নীতির প্রশ্নে যেমন: একটি হচ্ছে দুর্নীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য, অপরটি দুর্নীতিকে নির্মূলের জন্য। কিন্তু দুর্নীতি নির্মূল হয় না, বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর কারণ কী? যেসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালায়, সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য কী? দেখা যায়, দুর্নীতিকে টিকিয়ে রাখতেই অনেক প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে। কারণ যে সমাজব্যবস্থা ও আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজকর্ম করতে হয়, সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা এইসব সংগঠন হারিয়ে ফেলে এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতা ও পুঁজিবাদের পক্ষেই তাদের অবস্থান নিতে হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলো না তুলে এরা সস্তা দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযান চালায় এবং আসল প্রশ্নগুলোতে কৌশলে চুপচাপ থাকে। যেমন, বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চবাচ্য করে না? অথচ সারা দুনিয়া জানে বিশ্বব্যাংকে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি মহামারীর মতো। আর যেসব প্রকল্পে ব্যাংক সহায়তা করে সেগুলোতে তো দুর্নীতি আছেই। এসব প্রশ্নে রাষ্ট্রের নীরব ভূমিকার কারণ হচ্ছে জনসম্পদ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব সীমিত। দুর্নীতি তৈরি হয় যখন ক্ষমতা একক হয়ে ওঠে বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কারও দখলে থাকে এবং তখন সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। বিশ্বপুঁজিবাদী শক্তির ওপর গরিব দেশগুলোর কর্তৃত্ব থাকে না, বরং এই অপশক্তিকে টিকিয়ে রাখতে অসহায় এইসব রাষ্ট্রযন্ত্র বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

দুর্নীতির উপনিবেশ – উত্তর-উপনিবেশ

ম জি দ মা হ মু দ

মানব সমাজে 'নীতি' অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধের দ্বারা সম্পর্কিত নয়। এটি এমন একটি জটিল শব্দার্থ– যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুজন মানুষের কাছে সমান অর্থবহ করে তোলা প্রায় অসম্ভব। মানব-চিন্তনের বহুমুখী সৃষ্টিশীলতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির টিকে থাকার লড়াই এবং দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বহুমুখী ন্যায় ও নীতির বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা এটি সম্পর্কিত। তাই 'নীতি' সংক্রান্ত এই অনিশ্চিত মীমাংসাটুকুর উল্লেখ ছাড়া 'দুর্নীতি'র যে কোনো অলোচনা অহেতুক প্রয়াসে পর্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির জন্য নীতি অধিকাংশ সময় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম সাপেক্ষ। কেউ এই সব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা অলিখিত সাধারণ নিয়মাবলীর বাইরে গেলে তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বা আইনবহির্ভূত বলে অভিহিত করা হয়। ইংরেজি খধি শব্দটি বিধি, আইন, নিয়ম কিংবা নীতির সমার্থক হলেও ঙঁঃ ষধবিফ মানে নিষিদ্ধ ঘোষিত। যেমন নিষিদ্ধ ঘোষিত 'পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি'। এখানে রাষ্ট্রের নির্ধারিত ন্যায় বনাম একটি রাজনৈতিক দলের ন্যায় মুখোমুখি সাংঘর্ষিক অবস্থানে বিরাজমান। সত্তর দশকে ভারতে নকশাল নিধন কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' পাঠককে এইসব নিষিদ্ধ ঘোষিত সমাজতন্ত্রীর হত্যাকারির নীতিকে নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। প্রায় একই ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণজিৎ দাশের 'বংশী সামন্ত' কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

'সেদিন আর নেই যখন নকশালদের ভয়ে ডাক্তারেরা নামমাত্র ফিস নিয়ে রোগী দেখত। রিক্সাচালক বংশী সামন্ত সেই ভাগ্যবান রোগীদের একজন। কঠিন অসুখ হয়েছিল তার, হৃদপিণ্ডের, স্রেফ অচিকিৎসায় মারা যেত, যদি না একটি নকশাল ছেলে তাকে এক বিলেতফেরত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। মাত্র পাঁচ টাকা এবং অদৃশ্য পাইপগানের বিনিময়ে। পরে পুলিশের গুলিতে সেই ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু সুস্থ দেহে বেঁচে আছে বংশী। বেঁচে আছেন সেই ডাক্তারটিও, তাঁর ফিস এখন দুশ টাকা, বংশী শুনেছে। কচিৎ-কখনো গাড়িতে ওঠার মুখে বংশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তিনি এখনো হেসে জিজ্ঞেস করেন, 'ভালো আছ তো?' বংশী কৃতার্থ হয়ে যায়। তার মনে

হয় সেই ছেলেটির স্মৃতি এখনো ডাক্তারকে সম্পূর্ণ ছেড়ে যায়নি, না হলে ওর মতো নগণ্য লোককে তিনি এতদিন মনে রাখবেন কেন। রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বংশী, এখনো, প্রায়ই সেই ছেলেটির কথা চিন্তা করে।

নকশাল ছেলেটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। অস্ত্রের মুখে ডাক্তারকে ইচ্ছাহীন সেবাদানে বাধ্য করেছিল। মানুষের ইচ্ছাপূরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে দুর্নীতি করার প্রবণতা। আর এ ইচ্ছা কখনো ব্যক্তিগত, আবার কখনো রাষ্ট্রিক। এবং রাষ্ট্রের মধ্যে তা ছোট কিংবা বড় দলের সাধারণ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এমনকি কবিতায় উল্লিখিত গরীব বংশী সামন্তকে সেবাদানের অদম্য ইচ্ছা থেকে নকশাল ছেলেটি রাষ্ট্রের নির্দেশিত আইন অমান্য করেছিল। আর তার কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ায় রাষ্ট্র তার প্রাণ হরণ করেছিল।

'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' রাষ্টের মৌল কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রায় অসম্ভব– কে দুষ্ট আর কে শিষ্ট। রাষ্ট্রের বিবেচনায় প্রধানত সেই শিষ্ট যে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের জন্য হুমকি নয়। আর এই হুমকির রকমফের আছে। যেমন ধরা যাক, কিছু ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রিয়ভাজন কিন্তু সাধারণ লোক কিংবা প্রতিবাদকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকারে বারংবার হস্তক্ষেপ করে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তখন আর তাদের আশ্রয় দিতে পারে না। আর আশ্রয় দিলে জনগণ তাদের ওপর বিদ্বিষ্ট হয়। প্রতিবাদ করে তাদের কাঠামো দুর্বল করে দেয়। কিংবা বিপক্ষে রায় দিয়ে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ততা প্রমাণ করে। তখন কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের সাধারণ ইচ্ছা প্রয়োগ করে।

আর এসব ইচ্ছার প্রায় অধিকাংশ ঘটে থাকে মানুষের টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকে। প্রথমে সে টিকে থাকতে চায় নিজে– শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যে। নিজের টিকে থাকার প্রাথমিক শর্ত পূরণ হলে স্বগোত্রের টিকে থাকার বিষয়টি তার কাছে প্রাধান্য পায়। তারপর স্থান, কাল, ভাষা ও ধর্মকে কেন্দ্র করে সেই ইচ্ছা পল্লবিত হয়। প্রাণীজগতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা এ সত্য টের পাই, খুব বিরল সংখ্যক প্রাণী যারা স্বগোত্রের সদস্যদের হত্যা করে থাকে। আর মানুষ এই বিরল সংখ্যক প্রাণীর অন্যতম। মানুষ ভিন্ন আর কোনো প্রাণী তার স্বজাতিকে এতবেশি হত্যা করেনি। অথচ জীবজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে প্রাণসংহার ছাড়াই জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু মাংসাশী এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের পক্ষে হত্যা ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়। মানুষ ভিন্ন অন্যপ্রাণী ঠিক ততখানিই হত্যাযজ্ঞ চালায় যতখানি তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে থাকে তার অতিরিক্ত লোভ চরিতার্থ করার জন্য। আর তার দুর্নীতির মূলেও রয়েছে লোভ। তবে নীতি শব্দটির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অর্থ না থাকায় দুর্নীতির সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ প্রায় দুরূহ। কারণ নীতি শব্দটি এমন কিছু প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিবেচিত যা একই সমাজের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ও লাভজনক নয়। 'নীতি' নিজেই একটি দমনার্থক শব্দ। কেননা

নীতির মধ্যেই দুর্নীতির বীজ উপ্ত রয়েছে। ইতিহাসের সব কালেই মানুষ কম বা বেশি মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। দুর্নীতির মাত্রা কম হওয়ার পেছনে দমনমাত্রার রকমফের, ন্যায়বিচার, বণ্টনের সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল। লিখিত কিংবা অলিখিত মানব ইতিহাসে যতদূর চোখ যায়, ততদূরেই আমরা দেখতে পারি দুর্নীতি বা ন্যায়হীনতা সেইসব সমাজে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য নৃতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ আদিম কৌম সমাজ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ কাঠামোতে দুর্নীতির মাত্রা আধুনিক সভ্যসমাজের চেয়ে অনেক কম। তবে মানুষ মানুষকে হত্যা করেনি, এক দেশ অন্যদেশকে দখল করেনি, মানুষ মানুষের শ্রম শোষণ করেনি এমন কোনো সময়ের কথা আমাদের জানা ইতিহাসে অনুপস্থিত। ধর্মগ্রন্থ এবং মানুষের সংগঠন-যুগের মহাকাব্যগুলোকে আমরা মানুষের প্রথম সামাজিক ইতিহাস হিসেবে দেখতে পাই। এই গ্রন্থগুলোতেও মূলত মানুষের জটিল কুটিল ও কৌশলী স্বভাবের বর্ণনা করা হয়েছে। ভ্রাতৃহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং কারুকার্যময় ভাষার বর্ণনায় এই গ্রন্থগুলো সর্বোপরি একটি উৎকর্ষ লাভ করেছে।

সব কালেই মানুষ তার নিজের কালকে যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করেছে, নিজের কাল সম্বন্ধে হতাশ হয়েছে আবার নিজের সময়টিকে অতীতের সব কালের চেয়ে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে উন্নততর ভেবেছে। তবু এ বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা প্রতিপাদন করতে চাই মধ্যযুগের অন্ধকারের গুটি কেটে আলোকপ্রাপ্তির যুগে ইউরোপ তথা ঔপনিবেশিক শক্তি কিভাবে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি সংঘবদ্ধ অপরাধ করেছে। ব্যক্তি দুর্নীতি করলে তার প্রতিকার করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্র কিংবা শক্তিশালী রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের প্রতি অসদাচরণ করলে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, সভ্যের বর্বরলোভ।

দুই.

পনের শতকের একেবারে শেষের দিকে, কয়েক বছরের আগ-পাছ, ইউরোপীয় দুই নাবিক দুই বিপরীত দিক থেকে সমৃদ্ধ ভারতের খোঁজে বের হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, ভারত ছাড়া তাদের পৃথিবীতে আর কোনো দেশ ছিল না, যে দেশ খাদ্য দিতে পারে, দিতে পারে সমৃদ্ধি। তাদের দেশে ছিল প্রচণ্ড শীত আর অসহনীয় ক্ষুধা। শীত ও ক্ষুধার কামড় থেকে বাঁচতে এমনিতেই প্রতি বছর বহুলোক দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতো। কিংবা করতে হতো উপকূলীয় অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি। না হলে মেনে নিতে হতো অকালবার্ধক্য ও মৃত্যুর নখর-ঘস্টানি। তাছাড়া তাদের অনেকের ভূখণ্ডই ছিল সমুদ্র-পৃষ্ঠের নিচে। এমনকি কোনো কোনো দেশের নাম থেকেও সে সত্য মেলে। যেমন নেদারল্যান্ড মানেই নিচুভূমি; যার অর্ধেকের বেশিটা ছিল সমুদ্রের ভেতর। পর্তুগালেরও একই অবস্থা। স্পেন ছিল পার্বত্যময়, শুষ্ক ও শীত। ব্রিটেন-ফ্রান্সও তথৈবচ। তবে সামুদ্রিক শয্যা তাদের দুঃসাহসী করে তুলেছিল।

ঔপনিবেশের এই গল্প শুরু হয়েছিল, মহারথী ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে দিয়ে। ১৪৯২ সালে ইতালীয় এই নাবিক স্পেনের রানী ইসাবেলার আশীর্বাদ নিয়ে খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের নামে সুখী ভারতের উদ্দেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। একই বছরে রানী ইসাবেলার হাতে স্পেনের সাত'শ বছরের মুর শাসনের অবসান হয়েছিল। মুররা নাকি আমেরিকা যাওয়ার জলপথ জানতেন। যাই হোক, সমুদ্রের তর্জনি উপেক্ষা করে এক অজানা স্থলভাগে শেষমেশ পৌঁছতে পেরেছিলেন কলম্বাস। তার এই মরণযাত্রার সঙ্গীরা তাকে পথিমধ্যে মেরে ফেলে অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। বালাই! তার মৃত্যু হলে আদি আমেরিকানদের এত দ্রুত স্বর্গপ্রাপ্তিতে সহায়তা করতো কারা? ভূখণ্ড যাই হোক না কেন, কলম্বাস কিন্তু তার নাম দিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া। যদিও তারা পৌঁছেছিলেন সান সালভাদর দ্বীপে তবু নব-আবিস্কৃত এ ভূখণ্ডকে তারা ইন্ডিয়া বলেই জানতো। কারণ, ইন্ডিয়া ছাড়া তাদের গ্রহে আর কোনো দেশ ছিল না। সেখানকার তাইনোরো গোষ্ঠী কলম্বাসকে ভালোই খাতির-যত্ন করেছিলেন। সত্যিই তারা যদি সেদিন জানতো এই লোকটির বংশধররা কালক্রমে তাদের নির্বংশ করবে তাহলে আতুড়েই জাহাজশুদ্ধ তাদের সাগরে ডুবিয়ে দিতেও হয়তো কসুর করতো না। কলম্বাস স্পেনের রানীকে লিখেছিলেন, 'এখানকার মানুষজন এতই সুবোধ ও শান্তিপ্রিয় যে, মহামান্য রাজপদে আমি শপথ করে বলতে পারি সারা দুনিয়াতে এদের চেয়ে ভালো কোনো জাতি নেই।' তবে কলম্বাস এ কথা বলতেও ভোলেননি যে, 'তারা বেশ কিছুটা নগ্ন, তবু তাদের ব্যবহার ও সৌন্দর্যবোধ অতীব প্রশংসাযোগ্য।' অর্থাৎ যা কিছু অ-ইউরোপীয়, যা কিছু অখ্রীস্টীয় এমনকি চামড়ার রঙও তাদের মতো, না হলে তা-ই ইউরোপীয়দের কাছে বর্বরোচিত। তাইনোরোদের স্বল্প-বসন নিয়ে কলম্বাস যে ধরনের মন্তব্য করেছিলেন, ঠিক তার বিপরীত কর্ম করেছিলেন তার অর্থ-মন্ত্রদাতা ইসাবেলা ও রাজা ফার্নান্দেজ যে, স্পেনে থাকতে হলে মুরদেরও তাদের মতো স্বল্প-বসনা হতে হবে। যতই শীত হোক মেয়েদের সৌন্দর্যের অঙ্গগুলো অনাবৃত রাখতে হবে এটিই ইউরোপের শিক্ষা। ইউরোপ বিগত পাঁচশ বছর ধরে একটি কাজ সুচতুরভাবে করতে সক্ষম হয়েছে, যা কিছু ইউরোপীয়, যা কিছু শাদা তার সবই ভালো এবং সেই ভালোত্ব অন্য মহাদেশের মানুষদের মানতে বাধ্য করা ঈশ্বরের কর্তব্য।

ইউরোপের চিন্তার বিকাশ মূলত উপনিবেশ-দুর্নীতি সাপেক্ষ। উপনিবেশিকযুগের আগে ইউরোপ ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের ভূখণ্ডে কিংবা তা অতিক্রমকারী কোনো চিন্তার জন্ম দিতে পারেনি। অনেকেই বলতে পারেন, গ্রীসও তো ইউরোপেরই অংশ। সেখানে তো একটা সময়ে সীমিত আকারে হলেও কিছু জ্ঞানচর্চা হয়েছিল। এ কথা সত্য কিন্তু গ্রীসের ভূখাণ্ডিক অবস্থান যেমন শতভাগ ইউরোপ নয়, তেমনি আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়বীক্ষা এবং দ্বীপরাষ্ট্রের টিকে থাকার লড়াইয়ে উপনিবেশ ছিল জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায়। তাছাড়া গ্রীসের এই জ্ঞানচর্চা সমগ্র ইউরোপের কাছে ছিল অজানা। শত শত বছর ধরে তা ছিল অন্ধকার প্রকষ্ঠো; অনাবিস্কৃত খনির গহ্বরে। প্রায় হাজার বছর পরে এশিয়ার জ্ঞানতাত্ত্বিকদের হাতেই প্রান্তিক ইউরোপের এই জ্ঞানের মুক্তি ঘটেছিল।

জ্ঞানের দিক দিয়ে ইউরোপের গর্ব করার মতো তেমন কিছু নেই। ইউরোপের বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব মারণাস্ত্রগুলোকে আরো বেশি শাণিত করা। যাকে বলা যায় বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রক্রিয়াকরণ। অন্যের ভূখণ্ড দখল করা এবং নানা রকম ছলনা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে শোষণ-শাসন বজায় রাখা। এশিয়া ও ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারে একটি মৌলিক তফাৎ ছিল প্রায় সব কালেই। তাহলো, মঙ্গোলিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত প্রায় সমগ্র এশিয়ার জীবনের মধ্যে রয়েছে যাযাবরবৃত্তি কিংবা সন্ন্যাস ধর্মের প্রভাব। আর এটিই এশিয়া জীবনের দর্শনের পিতৃভূমি। অর্থাৎ এশিয়ার লোকজন যেখানে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছে, সেখানকার জীবনের সঙ্গেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবং সে ভূখণ্ডকেই তারা নিজেদের দেশ মনে করেছে। যে দেশ তারা ত্যাগ করে এসেছিল, সে দেশ তখন তাদের কাছে স্মৃতির বিদেশভূমি। সুতরাং দখলকৃত দেশ লুণ্ঠন করে নিজের দেশে পাঠানোর তাড়া তারা টের পাননি। কিন্তু ইউরোপীয়রা জন্মভূমিকে নোঙ্গর করে অন্য পৃথিবীকে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এশিয়ার সর্বত্র এটা সত্য, তদুপরি বাইরের জগত অর্থাৎ স্পেনেও এ উদাহরণের সত্যতা মিলবে।

সুসভ্য ইউরোপ খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের নামেই তাদের জীবন নির্বাহ করে কিংবা খ্রিস্টীয় ঈশ্বর তাদের আবর্তন করে সবকিছু সমাধা করে বলে তাদের বিশ্বাস। এবং প্রায় সব ধর্মের মতো তারাও তাদের নবী কিংবা ধর্ম সম্বন্ধে এমন অযৌক্তিক সব অধিভৌতিক বিষয়াদি বিশ্বাস করে, যা যুক্তিগ্রাহ্যতার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। সব ধর্মেই এমন কিছু রীতি ও বিশ্বাস বিদ্যমান যা যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। আর এই অযৌক্তিক অধিবিদ্যক দুর্নীতি ছাড়া যে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব নয় তার প্রমাণও ইউরোপ।

কলোম্বাস কর্তৃক তাইনারো গোষ্ঠীর গুণাবলীকে অখ্রীস্টীয় বা বর্বরতার চিহ্ন হিসেবে যত না গণ্য করা হয়েছিল তারচেয়ে বেশি বিবেচনা করা হয়েছিল দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে। কলম্বাসের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, ইউরোপীয় জীবনপ্রণালীকে সহজ করার জন্য এই সব লোকজন ব্যবহার করা উচিত। এরপর চারশ বছর ধরে (১৪৪২-১৮৯০) চলেছে সেইসব মানুষকে বশে আনার অবিরাম চেষ্টা। মিথ্যা আশ্বাস, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ আর হত্যা ছিল বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয় জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা। কলম্বাসকে সেদিন যারা আশ্রয় দিয়েছিল দেশে ফেরার পথে তাদেরই দশজনকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল রানীকে উপহার দেবার জন্য। বসতি স্থাপনকারীদের দাস-প্রথার শুরুও এখান থেকে। নিরস্ত্র ভালোমানুষগুলোকে যে ইউরোপীয় জীবনের সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে লাগানো যায়, সে স্বপ্নও দেখেছিলেন কলম্বাস। গৃহপালিত পশুদের নিয়ে মানুষের যে চেতনা কাজ করে ইউরোপীয়দের চেতনাও এসব মানুষ সম্বন্ধে তারচেয়ে বেশি ছিল না। এমনিতেই ইউরোপীয় সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল দাসপ্রথার ওপর। তদুপরি নতুন ভূখণ্ডে বসতি স্থাপনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বন্যপ্রাণির মতো মানুষ ধরার কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। এবং দীর্ঘ সময় ধরে এটিই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কেবল আঠার ও উনিশ শতকেই ইউরোপীয় জাহাজগুলো দুই কোটি দাস বহন করেছিল। আর এই দাসদের জাল

বিছিয়ে ধরার সময় কিংবা জাহাজের খোলে খাদ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনহীন বহনকালে ৫ কোটিরও বেশি লোক নিহত হয়েছিল।

এ রচনার শুরুতে কলম্বাসের কথা একটু বেশি করেই চলে আসে, কারণ ঔপনিবেশিক আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞজনও একটি ভুল করে বসেন। তাহলো, তারা বলে থাকেন, আমেরিকানরা ব্রিটিশদের মতো উপনিবেশ বিস্তার করেনি। বরং আমেরিকানরা ইউরোপীয় উপনিবেশের স্বীকার। এ ধরনের ভুল ইতিহাস-জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আমেরিকার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিপরীতমুখী। প্রথম পর্যায়ে খোদ আমেরিকাতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তবে স্পেন, ব্রিটেন ও পর্তুগাল ভিন্ন সেখানের উপনিবেশের দাবি তেমন কারো ফলপ্রসূ হয়নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়রা তাদের আদিভূমির অধিকারে থাকতে চায়নি। গড়ে তুলতে চেয়েছেন নিজেদের প্রজাতন্ত্র। যার নামই আমেরিকার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কিছুতেই ভারত এশিয়া কিংবা আফ্রিকার দেশের প্রাপ্ত স্বাধীনতার মতো নয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ছিল মূলত তাদের নিজেদের শাসন থেকে নিজেদের মুক্তি– ভাই-ভাইতে লড়াই।

তবে একটি বিষয়ে খোদ ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং বসতিকারীরা একাট্টা ছিল যে আমেরিকার ভেতরে আমেরিকাকে সম্প্রসারিত করা। কারণ এই বিশাল ভূমিকে তাদের করায়ত্ত করতেও লেগেছে প্রায় চারশত বছর। এই বিশাল ভূমিকে পদানত করেই ইউরোপীয়রা আজকের পৃথিবীতে সর্বাধিক অর্থবিত্তের মালিক হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে আমেরিকাকে জানি সেই সমন্বিত ইউরোপীয় আমেরিকার বয়স এক-দেড়'শ বছরের বেশি নয়। সুতরাং বাইরের দুনিয়ায় যখন উপনিবেশের সর্বগ্রাসী নীতি বলবৎ ছিল তখন আজকের আমেরিকায় যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা নব আবিস্কৃত ভূখণ্ডে তৎপর ছিল।

যে কারণে দুই নাবিকের কথা এখানে একসঙ্গে বলা দরকার। অর্থাৎ ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা উত্তম-আশা (নিয়ে) অন্তরীপ হয়ে ভারত আসার আগে ইউরোপীয়দের কাছে এ পথ ছিল অজানা। আগেই বলেছি, দুই নাবিকেরই অভীষ্ট গন্তব্য ছিল সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। সুতরাং, তারা ভারতবর্ষে তো এসেছিলেনই, উপরন্তু আজকে আমরা যাকে আমেরিকা বলি, ভাগ্য তাদের সেখানেও নিয়ে গিয়েছিল। উপনিবেশের শুরু এখান থেকেই, তার আগে ইউরোপীয়দের কোথাও কোনো উপনিবেশ ছিল না। যদিও দুই নাবিকের নব আবিষ্কারের এক-আধ-শ বছর পরে উপনিবেশের প্রকৃত বাস্তবতার শুরু। শুরু উপনিবেশের দুর্নীতি। সেই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের বিভোর করে তুলেছিল। এমনকি স্পেন ও পর্তুগীজ নাবিকদের এই আবিষ্কারের পরই পৃথিবীটাকে তারা তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন সে দলিলও বিরল নয়।

পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার ১৪৯৩ ও ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বহির্বিশ্বকে বণ্টন করে চারবার আদেশ-নামা জারি করেছিলেন। যদিও মনে হতে পারে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, তবু ১৫০২ সালে উক্ত পোপ পতুর্গালের

রাজাকে ইথিওপিয়া, আরাবিয়া, পারস্য, ভারত ও সমুদ্রপথের অধিপতি উপাধিতে ভূষিত করেন। তবে সত্যিই পোপের ডিসাইপলরা কালক্রমে এসব ভূখণ্ডের মালিক হয়ে উঠেছিল।

উপরিউক্ত দুই নাবিকই ছিল নৃশংস প্রকৃতির। যারা তাদের আশ্রয় ও সম্মান দিয়েছিল, তাদের ওপরই তারা করেছিল নির্দয় অত্যাচার। কলম্বাস দেশে ফেরার পথে দশ তাইনোরোকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। নতুন আবহাওয়ায় একজন পথিমধ্যে মারা যায়। যিশুমতে তার স্বর্গে যাওয়ার গল্পও ফেঁদেছিলেন তারা। আর ভাস্কো-ডা-গামাকে কালিকট বন্দরে জামোরিণ নামে যে হিন্দু রাজা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, গামা সেই রাজার সৈন্যদের হত্যা করেছিলেন। আরব বণিকদের রাজার অঞ্চল থেকে বের করে দেয়ার জেদ ধরেছিলেন। অথচ রাজাকে একটু ভালো উপহার দেবারও মুরোদ ছিল না তাদের। অবশ্য ইউরোপের অভাবের কথা বিবেচনা করে রাজা তাতে নাখোশ হয়নি। ফরাসি পর্যটক ফাঁসোয়া বার্নিয়ারও পরবর্তীকালে এ মতের সমর্থন করেছেন। ভারতীয় সম্রাট ও রাজাদের কাছে পাঠানো ইউরোপীয় উপহার তেমন মূল্যবান ছিল না। তাছাড়া ইউরোপীয়রা যে সব পণ্য নিয়ে ভারতে ব্যবসা করতে আসতেন তাও ছিল অপ্রয়োজনীয়, নিছক খেলনা জাতীয়।

পর্তুগীজরাই সম্ভবত ভারতবর্ষে প্রথম উপনিবেশের সূচনা করেছিল। ১৫১০ সালে বিজাপুর সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দখল করে নিয়েছিল। তবে কয়েক শত বছর ধরে ভারত সমুদ্র ও নৌপথে পর্তুগীজ হার্মাদদের দৌরাত্ম্য, অকথ্য অত্যাচার ও দস্যুগিরি ইতিহাসের বিষয় হয়ে থাকলেও ভারতবর্ষে তাদের পক্ষে উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় অন্তঃকোন্দলে তারা স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। তবু সারা ইউরোপ প্রায় একই সঙ্গে নৌপথ ব্যবহার করে সমগ্র পৃথিবীতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। এ ইতিহাস দীর্ঘ। একটি মাত্র রচনায় তা খোলাসা করা সম্ভব নয়। ইউরোপীয়দের পুরো আমেরিকা কব্জা করতে লেগেছিল চারশ বছর। এশিয়া এবং আফ্রিকায়ও যুগপৎ চলেছিল উপনিবেশ বিস্তার। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর ৮৭ ভাগ ভূমি ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের দখলে। ১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক প্রভুদের উদগ্র লোভের নির্লজ্জ প্রকাশ। মানব সভ্যতার প্রতি তাদের ছিল না সামান্য সম্মান। এই দীর্ঘ সময়-পর্বে তারা কেবল নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করেছিল মানব-মারণ অস্ত্রে। তারা পৃথিবীকে ভাগ করেছিল কালো আর শাদায়। অর্থাৎ একদিকে ইউরোপ অন্যদিকে তাবৎ বিশ্ব। ইংরেজ গুণগ্রাহী কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং বলেছিলেন, West is west and east is east. এই নোবেল পাওয়া কবির ইংরেজ নিয়ে জাঁক করবার কারণ কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্য পৃথিবীর মানুষ কেবল বেঁচে থাকবে শাদা পৃথিবীর মানুষকে সেবাদানের মাধ্যমে। তবে যে সব ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তাদের প্রায় সবাই ছিল রাষ্ট্র-সমর্থিত বণিক। আর বণিকবৃত্তির প্রধান শর্ত অধিক

মুনাফা। মুনাফা অর্জনে তারা যে এমন মানবিক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ মন্টগোমারি মার্টিনের একটি আক্ষেপ থেকে সে প্রমাণ মেলে। দাসপ্রথার শেষ আমলে ইংরেজরা চীনে আফিম সরবরাহ করতে থাকে। ১৮৪৭ সালে মার্টিন তার China, Political, Commercial and Social গ্রন্থে বলেন, 'আফিম বাণিজ্যের তুলনায় দাস বাণিজ্য তো আশীর্বাদ ছিল; আফ্রিকানদের দেহ আমরা ধ্বংস করিনি, কেননা তাদের বাঁচিয়ে রাখাই ছিল আমাদের আশু স্বার্থ; তাদের প্রকৃতিকে অধঃপতিত করিনি, দূষিত করিনি তাদের মন, চূর্ণ করিনি তাদের আত্মা।' অনেকের কাছে একটি অগভীর প্রশ্ন, ইউরোপীয়রা সারা পৃথিবীতে যেভাবে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, সেই উপনিবেশে বসতিকারীরা তো স্থানীয় লোকজনকে আরো হত্যা করতে পারতো। যিশুর যে ধর্মের বাণী নিয়ে তারা প্রথমে সেখানে পা রাখার জায়গা করে নেয়, সেখানে কেন পরবর্তীকালে সে ধর্ম যথেষ্ট রকম বিস্তার করে না। এর উত্তর সহজ। দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করাই মূলত তাদের উদ্দেশ্য। উপনিবেশগুলোর চার্চ হচ্ছে শ্বেতাঙ্গদের চার্চ। বিদেশীদের অধিকারে। সেখানে অনেককেই আহ্বান করা হতো। কিন্তু নির্বাচিত করা হতো খুব কম সংখ্যককে। সেখানে আহ্বান করা হয় খ্রিস্টীয় প্রভুর পথে নয়, শ্বেতাঙ্গদের পথে।

তিন.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীর প্রায় সাতাশি শতাংশ ভূমি ইউরোপীয় উপনিবেশিক প্রভুদের দখলে থাকলেও পঞ্চাশ দশক থেকে সে চিত্র পাল্টে যেতে থাকে। ভূমিপুত্রদের ক্রমাগত আন্দোলন ও বিদ্রোহের ফলে উপনিবেশিক প্রভুদের ভিনদেশে টিকে থাকা যেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল, তেমন বহুমুখী যোগাযোগ ও ইউরোপ-আমেরিকায়-শিল্প বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং মারণাস্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশের ফলে উপনিবেশ ব্যবসা আর লাভজনক মনে হচ্ছিল না। তাই তিরিশ দশকের শুরু থেকে তারা দখলকৃত ভূমি থেকে বের হয়ে আসার পরিকল্পনা করতে থাকে। কিন্তু বের হওয়ার পরে যাতে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে সে ব্যাপারেও তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। জাতিসংঘ কমনওয়েলথসহ আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ তারই ভিন্ন রূপ। এসব সংগঠনের কাঠামো ও জন্ম-ইতিহাস লক্ষ্য করলে এ সত্য প্রকটভাবে ধরা দেয়। এছাড়া এই সংগঠনগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডবিউটিওসহ অনেক সংস্থা। তবু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি শক্তিশালী অবস্থান থাকার কারণে বেশ কিছুদিন একটি ভারসাম্যময় পৃথিবী বিরাজ করছিল। কিন্তু বর্তমান পৃথিবী এক অক্ষের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটি মাত্র রাষ্ট্রের হাতে পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভূমি জিম্মি হয়ে পড়ছে।

নিঃসন্দেহে সেই রাষ্ট্রের নাম যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু নীতি নিয়ে এ রচনার শুরু সেহেতু নীতিহীনতার সর্বোচ্চ উদাহরণ হিসেবে এর উল্লেখটুকু অপ্রয়োজন নয়। নাইন-এলেভেনের ঘটনার সত্যতা আমরা মেনে নিলেও বুশের 'আগাম শাস্তি প্রদান' নীতি

কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। ঐ ঘটনায় জনৈক লাদেনকে দোষারোপ করে বুশ প্রশাসন একের পর এক রাজত্বের উৎখাত এবং নিরীহ মানুষ হত্যার মহোৎসব করছে। আমরা যে লাদেনের কথা জানি সে তো বুশ পরিবারেরই লোক ছিল, নির্যাতিত মুসলিম সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী তা কারো কাছে পরিষ্কার নয়। কোনো রাষ্ট্র কিংবা কোনো মুসলিম-জনতা তাকে সমর্থন দিয়েছে এ কথাও শোনা যায়নি। তবু আমরা লক্ষ্য করি আমেরিকান সংকট ও প্রয়োজনের সময় কোথা থেকে তার ভিডিও-টেপ বেজে ওঠে। উঠুক, আমাদের আপত্তি নেই। বুশ লাদেনকে নিয়ে যা খুশি তা করুক। কিন্তু দশ লক্ষ নিরপরাধ ইরাকী হত্যার জবাব দেবে কে। বুশ কোন নীতিকে বাস্তবায়নের জন্য এই ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে তা যে কোনো অর্বাচীনের কাছেও পরিষ্কার। এবং এসব প্রচারণার ক্ষেত্রে আমরা একই সঙ্গে দেখে আসছি মিডিয়ার কারসাজি। যেমন ফক্স ও তার সহযোগি আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া যাওয়ার যে কাহিনী শোনাল তা যখন মিথ্যায় পর্যবসিত হলো তখন এসব মিডিয়া সেই সত্যকে আর তুলে ধরল না। একজন মানুষকে হত্যা করতে যখন দশ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয় তখন তার নীতি নিয়ে কথা ওঠে।

এসব লক্ষণ দেখে বলা যায়, গত শতাব্দির তিরিশের দশকে সারা পৃথিবী ইউরোপের মাত্র কয়েকটি দেশের কবলে ছিল। আর বর্তমান শতাব্দির তিরিশ দশক নাগাদ সারা পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ ভূমি একটি মাত্র দেশের দখলে থাকবে। সেই দেশের নাম আমেরিকা। তবে আমেরিকাকে একটা দেশ বললে ভুল হবে। আমেরিকা হলো সাবেক উপনিবেশিক প্রভুদের একমাত্র প্রতিনিধি যেখানে ইউরোপীয় উপনিবেশ শক্তির সম্মিলন ঘটেছে।

দুর্নীতি বনাম সুনীতি

শ ও ক ত আ লী

[শওকত আলীর জন্ম ১৯৩৬ সালে, পশ্চিমবাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে। তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে দীর্ঘ পঁচিশ বছর অধ্যাপনা করেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ'। তিনি উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প, শিশু-কিশোর সাহিত্যও লিখেছেন। তার উপন্যাসের মধ্যে: প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), ওয়ারিশ (১৯৮৯), উত্তরের খেপ (১৯৯১) ও দলিল উল্লেখযোগ্য। শওকত আলীর উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি পক্ষপাত লক্ষণীয়।]

হালখাতা

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র এবারের বিষয় 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব'। 'হালখাতা'র পক্ষথেকে আমরা আজ বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক শওকত আলীর মুখোমুখি হয়েছি, 'দুর্নীতি' সম্পর্কে অর্থাৎ দুর্নীতির আগাগোড়া এবং অন্দরবাহির জানবার জন্য। দেখা যাক আমাদের জানতে চাওয়ার জায়গাটিতে উনি আমাদের কতটা তৃপ্ত করতে পারেন।

আপনার দুটি প্রধান পরিচয়ের কথা আজ আমরা উল্লেখ করতে চাই; তার একটি হলো আপনি একজন শিক্ষক, যার কাজ সিলেবাসের শিক্ষাদান ছাড়াও ছাত্রদের মাধ্যমে সমাজে নীতি প্রতিষ্ঠা করা। আপনার আরেকটি পরিচয় হলো আপনি এদেশের একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক, যার কলম এই ভালো-মন্দের সমাজের নানা চরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাসে।

আপনার কাছে আমাদের জানতে-চওয়া হলো, একজন ব্যক্তি দুর্নীতি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে কেন দুর্নীতি করবে না; দুর্নীতি না-করার পেছনে তার বাধ্যবাধকতা কী?

শওকত আলী

তার বাধ্যবাধকতা নিজের কাছেই। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেটাতো নিজের বিচারেই আছে। কেউ যদি চায় আমি যে কোনো মূল্যে অনেক সম্পদের মালিক হবো,

আমার ভাইদের মেরে ফেলবো, আমি কিছু করব না, তা তো হয় না! আমার ভাইদের প্রতি আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই কি? এটাতেই প্রমাণিত হয় দায়বদ্ধতা ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যাবে না।

হালখাতা

তাহলে আপনার কথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব বাধ্যবাধকতাই ব্যক্তির দুর্নীতি না-করার কারণ। কিন্তু ব্যক্তি সে দায়বদ্ধতা অনুভব করবে কেন? এক. হতে পারে পরকালের ভয়ে, দুই. হতে পাবে আইনের ভয়ে আর এছাড়া হতে পারে যে, মানুষের মাঝে যে সেলফ হিউম্যানিটি আছে সেই বলে সে বাধ্যবাধকতা অনুভব করবে। কথা হলো আপনি এবিষয়ে কী মনে করেন?

শওকত আলী

মানুষের মাঝে যে মানবিকতা বা মানবীয় কল্যাণধর্মী বোধ আছে, সেটা দুকারণে সজাগ বা সক্রিয় থাকে। এক. সকল মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন-এর কারণে এবং দুই. মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কল্যাণবোধ জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে প্রেষণা সৃষ্টির মাধ্যমে। এভাবেই দুর্নীতি রোধ বা সুনীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কথা হলো সকল মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা না-গেলে বিচ্ছিন্নভাবে দুর্নীতি রোধ করা যাবে না। সেদিক থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনা পদ্ধতিই বলে দেবে দুর্নীতি রাষ্ট্রে থাকবে কি থাকবে না।

হালখাতা

হয়তো একজন ব্যক্তি নিজের দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে দুর্নীতিবাজ হয়ে ওঠে কিন্তু রাষ্ট্র কিভাবে সমস্ত দায়দ্ধতা বহনের অঙ্গীকার কাঁধে নিয়েও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়?

শওকত আলী

ব্যক্তিই তো রাষ্ট্রক্ষমতাকে পরিচালিত করে। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান কোথায়, তার মন মানসিকতা কী? শাসক ও শোষকদের সমান সমান যদি তাদের অবস্থান হয়... এই অবস্থানটা তৈরি করছে সে কিসের মাধ্যমে... শোষণের মাধ্যমে। সেখানে যদি তার টিকে থাকতে হয়, তাহলে সে কি পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত হতে পারবে? তার অবস্থানের কারণেই কিছু আপোষ তার করতেই হবে। হঠাৎ করে দু'এক বছরে কি দশ বছরে দুর্নীতি সরে যাবে না, মানুষ যখন সচেতন হবে, সব মানুষ যখন জাগ্রত হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য বলবে, তার মনের কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, ভেতর থেকে উচ্চারিত হবে তার মনের কথা, তখনই একটা পরিবেশ তৈরি হবে। সামাজিক অবস্থা তৈরি হতে পারলে যেখানে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি আর সক্রিয় থাকতে পারবে না।

হালখাতা

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনের কথা কণ্ঠে আসার যে প্রয়োজনীয়তার কথা আপনি বলেলন, আপনি কি মনে করেন আমাদের সে পরিমাণ বাক-স্বাধীনতা রাষ্ট্র এখন দিচ্ছে?

শওকত আলী

স্বাধীনতার যে প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে সে স্বাধীনতা তো কখনই থাকে না। সমাজ যখন থাকে, শৃঙ্খলা যখন থাকে তখন তা মেনে চলতে হয়। আমি ইচ্ছামতো কিছু করলে তো সমাজ থাকে না, শৃঙ্খলা থাকে না, স্বাধীনতাও থাকে না। সেজন্য কল্যাণকর মানুষের জন্য কল্যাণকর যে-পদ্ধতি, যে-পথ সেদিকে আমাদের সচেতন থাকা দরকার, তার সঙ্গে আমাদের যুক্ত থাকা দরকার। এটা যদি হয় তাহলেই দুর্নীতি কমে যাবে, একসময় হয়তো এটা থাকবেই না। তবে একেবারেই দুর্নীতিমুক্ত কোন সমাজ আছে কিনা এটা আমি জানি না। এটা আমার জানার মধ্যে নেই, দেখিনি।

হালখাতা

বলা তো হচ্ছে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত গোটা দেশ। এবং উত্তরণের জন্যও আমরা নানা প্রতিরোধ পদ্ধতি নিচ্ছি, চলমান এই প্রতিরোধ পদ্ধতিগুলো কতটা সফল হবে বলে আপনি মনে করেন।

শওকত আলী

এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ এই বিষয়ে আমি ডিটেল জানি না। শুধু একটা কথাই বলবো এই যে, দুর্নীতি হচ্ছে এটা তো আজকে থেকে নয়। ৪০ বছর ৬০ বছর ১০০ বছর আগে থেকে। তখন কেন আমাদের মগজের মধ্যে এই চেতনাটা জাগলো না! একটা সরকার চলে গেলো বা দু'টো সরকার চলে গেলো অমনি আমাদের মগজের মধ্যে গজিয়ে উঠলো 'দুর্নীতি'। যখন যারা শোষণ করছে তারা বলছে দূর করবো দুর্নীতি তখন আমরা উঠে পড়ে লেগেছি। এই লোকগুলো তো ক্ষমতা পেয়ে তখন অন্যকিছু করছেন, তখনই কেন আমারা দুর্নীতি বিষয়ে বলিনি, কেন?

হালখাতা

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমনের চলমান পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম? কতটা কার্যকর হবে এই পদ্ধতিগুলো!

শওকত আলী

দমন পদ্ধতি কতটা কার্যকর সে সম্পর্কে তো আমি বলতে পারি না। এটা কেউ বলতে পারবে না। এটার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার আছে, এই সুযোগে সবাই

যদি ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন হয়ে উঠি... । তাহলে আমূল পরিবর্তনের দিকে হয়তো সকলের এক-পা এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে...!

হালখাতা

আমাদের পশ্চাৎপদতার জন্য 'দুর্নীতি'-কে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নায়নের চেষ্টা চলছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন সচেতনতা ও ঐক্যের কথা। এই সচেতনতা ও ঐক্য বলতে আমরা কী বুঝবো?

শওকত আলী

কল্যাণমুখী সুনীতি প্রচলিত না হলে প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশ শোষিত হবে পশ্চাৎপদ হবে এবং দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে... সক্রিয়ভাবে দাঁড়াতে হবে। না হলে যারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে টাকার কাছে, তাদের মধ্যে এই মনোভাব যদি না থাকে,– না এভাবে আমি বিক্রি হবো না, আমার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে আমি থাকবো তাহলে তাকে কি কিনে নিতে পারবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি? পারবে? পারবে না।

বিষয়গুলো নিয়ে এখন চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং এটা করতে হবে তরুণদেরই। আমরা যেখানে হোক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিচ্ছি সেটার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কী সে-সম্পর্কে আমরা তো ভাবছি না। আমরা সচেতন নই। আমাদের কৃষি উৎপাদনের জন্য বলা হলো– সার লাগাও, উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। তার ফল কী হয়েছে, উল্টা হয়েছে আরো। উল্টা হয়েছে কীভাবে– যে জমিতে দশমণ ধান হতো, সে জমিতে ধান হচ্ছে পনেরো মণ, কিন্তু ক্ষতি কী হচ্ছে– জমির ক্ষতি হচ্ছে আরও অনেক বেশি। জমির শুধু ক্ষতি না – এই যে ছোট-ছোট কীটপতঙ্গ ছোট মাছ– এগুলো বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে শুরু করে একেবারে বৃষ্টি শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস থেকে একেবারে ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত ফসল ওঠার পর পর্যন্ত ধানের জমিতে ফসল রেখে যে অতিরিক্ত পানি জমতো তাতে মাছ থাকতো। ফলে প্রত্যেকদিন খাওয়ার তালিকায় মাছ থাকতো। পুঁটি-টেংরা-হাবিজাবি সব ছোট ছোট মাছ। এই সব মাছ আজ মরে গেছে। শত শত প্রজাতির মাছ এখন পাওয়া যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে-না, পাঁচ মাস ছয় মাস বাড়িতে এক কেজি করে মাছ যদি খেয়ে থাকো তাহলে কত কেজি ছিল সেটা– বলা হচ্ছে কী, দশমণের জায়গায় পনেরো মণ ধান উৎপাদন করছো। পাঁচ মণ ধান বেশি না ঐ ছয় মাসের মাছের দাম বেশি? সে হিসাব কে করে? এই যে ইরি ধান হয়েছে ঝিনাইদহ এলাকার মধ্যে এটা কে খুঁজে বের করেছে– কৃষক। তার আবিস্কার পদ্ধতিটা কী? জমিতে থেকেছে– একটা গাছকে অন্য ধরনের গাছ মনে হয়েছে সেটাকে নিয়েছে– আলাদা করে বীজ তুলে ধান করেছে– করতে করতে দেখা গেছে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাইতে এটার উপযোগিতা অনেক বেশি। বলা হলো, উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ হয় না কিন্তু ইরি ধানের বীজ হয়; এখন বিজ্ঞান করি বা প্রযুক্তি করি– ভালো জিনিস –

কিন্তু আমার দেশের মাটির সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে তার কতখানি মিল হবে মিশ খাবে এটা বিবেচনা করা হচ্ছে না। এইজন্য সচেতনতা দরকার, ঐক্য দরকার। নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে ট্রাডিশন থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়। নিজেদের ট্রাডিশন জেনে তার উপাদানগুলো আরো সমৃদ্ধতর করার মধ্য দিয়ে।

হালখাতা

একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা তাদের জরিপের ভিত্তিতে ঘোষণা করলো যে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ান। বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ– এই খেতাব নিয়ে আমরাও অনেক হৈচৈ করলাম। এই ঘটনাটিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

শওকত আলী

দুর্নীতি সর্বত্রই আছে, কম আর বেশি। বাংলাদেশে দুর্নীতির জগতের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলছে। যারা সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছে আর যারা বিরোধী দল তারা পরস্পরকে অভিযুক্ত করছে এবং তাদের যে বিন্যাস ঐটা তো ঐভাবেই আছে, ঐ তো তারা যেমন দেশটাও চলছে সেইভাবে...

হালখাতা

ঘোষণাকারী এ ধরনের সংস্থার ওপর আমরা কতটুকু আস্থা রাখতে পারি?

শওকত আলী

তাদের ওপর আস্থা রাখার কোনো কারণ নাই। তারা যে এই জিনিসগুলো করছে, তাদের দেশে এগুলো হচ্ছে না? তারা কি অন্য দেশকে শোষণ করছে না? তারাই তো দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি করছে। তারা আমাদের দেশ এবং জনগণকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে চায়, শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে রেখে দিতে চায় যেন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি।

হালখাতা

তো দেশে এবং দেশের বাইরে 'দুর্নীতি' নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে, এইসব আলোচনায় বিষয়টির নানান ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে– আপনি কিভাবে 'দুর্নীতি' বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করবেন?

শওকত আলী

নীতিকে পাত্তা না দেয়া এবং নিজ স্বার্থের জন্য যা-কিছু সমাজবিরোধী, সভ্যতা বিরোধী, এই কাজগুলো করা, এই সবগুলোকে মিলিয়ে 'দুর্নীতি' বলা যেতে পারে, আমি সেইভাবেই বিবেচনা করি। দুর্নীতি হলে সমাজ বাধাগ্রস্ত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জনজীবন বিপর্যস্ত হবে এবং সুস্থ চিন্তাভাবনা সমাজে গুরুত্ব পাবে না। দুর্নীতির ক্রিয়াকাণ্ডগুলো সমস্ত রকমের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। মানবতা বিপন্ন হয়, ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়, শোষণ আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়, জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই দুর্নীতিকে আমরা সবাই চিনি। আমরা এর সাথে আপোষ করি আর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে সহযোগিতা করি। এগুলো-তো আমাদের জীবনে সমাজে বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এটা আজকে থেকে শুরু হয়নি। এর পেছনে উপনিবেশবাদী সমাজ ছিল, তার আগে রাজতন্ত্রের ব্যাপার ছিল। ঐদিক থেকে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন হয়েছে, শ্রম শোষণ করা হয়েছে। যে নিয়মগুলো করা হয়েছে তো দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য না। সামন্ততন্ত্রের মধ্যে উৎপাদনের ভিত্তি ছিল ভূমি। ভূমির ওপর আধিপত্য কে রেখেছে, জবরদখল যারা করেছে তারাই। ভূমি নিয়ে যারা দুর্নীতি করেছে সেটাই বড় দুর্নীতি। ভূমিভিত্তিক যে আধিপত্য তার যে সম্পদ সেটার যে মালিক তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো, শোষণ করত। সামন্ততন্ত্রের পর আমাদের দেশে চলে এলো উপনিবেশবাদ – এই অপশক্তি শোষণ করতে থাকলো এবং তাদের দালাল তৈরি করল কিছু কিছু এবং তারাই হচ্ছে নতুন পুঁজিবাদ। তারা যে মিল-কারখানা করলো সেটা তো সব তাদের স্বার্থের জন্য, ঐ বিদেশী প্রভুদের স্বার্থের জন্য; বৃহত্তর যে পুঁজিবাদ তার স্বার্থপূরণের জন্য। এখন তাদের সুবিধার জন্য মৌলিক যে নীতি, মানবিক যে নীতি সেই নীতিকে তারা তো বদলে ফেলছে, বিধ্বস্ত করছে, দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে।

হালখাতা

দুর্নীতির বিপক্ষ শক্তি হিসেবে আমাদের ও আমাদের তৎপরতা কী হতে পারে?

শওকত আলী

আমি গল্প-উপন্যাস লিখি। আমার গল্প-উপন্যাসে কিছু কিছু খারাপ চরিত্র বা দুর্নীতিবাজ লোক থাকে – তারা হয় পরাজিত হয়, না হলে তারা বিজয়ী হয়। গল্পের মধ্যে আছে এরকম, উপন্যাসের মধ্যেও আছে এরকম; যা দেখি তা লেখার চেষ্টা করি। প্রতিরোধ কিভাবে করতে হবে, কিভাবে পারবো তা তো আমার পক্ষে সম্ভব না– কে করতে পারবে তাও আমি বলতে পারবো না। এটা একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার ব্যাপার। সেই মানুষগুলোকে সচেতন হতে হবে। আমার নিজের ঐতিহ্যকে আমি যদি না জানি তাহলে কেমন করে হবে? আজকে ওরস্যালাইনের কথা বলা হয়। ডায়রিয়া-জাতীয়

রোগ হলে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায় এবং লোক মারা যায়। সে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বেরিয়েছে কী– ওরস্যালাইন। কে আবিষ্কার করেছে– কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি। এখান থেকে বাইরে এটা প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এরা পেল কোথায় – এরা দেখেছে আমাদের মায়েদের কাছথেকে, বোনদের কাছথেকে; গেছে চিকিৎসা করার জন্য– যে সব অঞ্চল ডায়রিয়া-প্রবণ, কলেরা-প্রবণ ঐ বরিশাল ঐ ফরিদপুর ঐ সমস্ত জায়গায়– গিয়ে দেখে মায়েরা বলছে ওষুধ দরকার নাই– এমনি ঠিক হয়ে যাবে। মায়েরা কী খাওয়ায়– গুড়ের পানি লবণ মিশিয়ে খাওয়ায়; কী খাওয়ায়– ভাতের মাড় খাওয়ায়। এতে কী আছে দেখো– শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায়– যার ফলে সে মারা যায়, পানিটা ধরে রাখার জন্য কী দরকার– লবণটা দরকার আর বেশি পানি খাওয়ার জন্য পানিটা দরকার। এটা চলতে থাকে তাহলে রোগী আর মারা যায় না। এটা জনগণের তত্ত্ব , পিপল্‌স টেকনোলজি – আমাদের পলিটিশিয়ানরা এসব বলতে পারে? বলে? তো, দুর্নীতির বিপক্ষ শক্তি হিসেবে আমাদেরও তৎপরতা কী হতে পারে, যার জবাব হলো আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের যা আছে এবং যা নেই– এই উভয় দিক সম্পর্কে। আমার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, আজ এপর্যন্তই থাক।

হালখাতা

আপনার অসুস্থতার মধ্যেও সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

শওকত আলী

তোমাদেরও ধন্যবাদ।

[সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গ্রন্থনা: যুবা রহমান , মুহম্মদ কবীর।]

দুর্নীতির মনোবীজ

মা মু ন হু সা ই ন

[মামুন হুসাইন, জন্ম ১৯৬২, কুষ্টিয়ায়। পেশা চিকিৎসা। বাংলাদেশের নপুংসক মিনমিনে গদ্যধারার বিপরীতে তাঁর গদ্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রশ্নকাতর, আক্রান্ত করে। প্রকাশিত গ্রন্থ: শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি, আমাদের জানা ছিল কিছু, মানুষের মৃত্যু হলে, বালক বেলার কৌশল, নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা, কয়েকজন সামান্য মানুষ প্রভৃতি]

হালখাতা

বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বিগত কয়েক বছর ধরেই তুঙ্গে। বর্তমানে সেই আলোচনা-সমালোচনা চরম আকার লাভ করেছে। আপনার মতে 'দুর্নীতি' বিষয়টি আসলে কী? চুরি, ডাকাতির সাথে দুনীতির পার্থক্যটাই বা কী?

মামুন হুসাইন

খানিকটা অক্ষর জ্ঞান এবং বাক্যবাগীশতার শাস্তি হিসেবে আমাকে কখনও দুর্নীতির 'সংজ্ঞা' এবং অন্য আচরণের সঙ্গে এর 'পার্থক্য' নির্ণয় করতে বাধ্য হতে হবে আঁচ করতে পারিনি। আমার ধারণা যাঁরা নৈতিকতা, নীতিবিদ্যা কিংবা নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বে বুঁদ হয়ে আছেন– এঁরা এ সম্পর্কে সবচেয়ে উপযুক্ত মন্তব্য করার অধিকার রাখেন। দর্শনের মাস্টারমশাইরা নীতিবিদ্যা পড়ানোর সময় প্রায়শ: সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, প্লেটো, বুদ্ধ থেকে শুরু করে কান্ট-ম্যুর-নিৎসে হয়ে রাসেল কিংবা মেরি মিডগ্লে পর্যন্ত অনায়াসে বক্তৃতার সুগন্ধ চাউড় করে দেন। এঁদের লেখাপত্র ধার-কর্জ করে নিশ্চয়ই পরীক্ষা-পাশের উপযোগী একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায়। আবার ভেবেছি– ভালোনীতি কী, সদগুণ কী, কী করা উচিত, কী উচিত নয়, কোনটি মন্দ বাসনা, কোনটি ভালো বাসনা... -এ সম্পর্কে অপরের জন্য প্রযোজ্য একটি নীতিমালা তৈরি করা গেলেও, এখন পর্যন্ত আমি নিজে কাকে গোল্ড-স্ট্যান্ডার্ড ভাববো, তা স্থির করতে পারিনি। ঐ গল্পটির কথা মনে পড়ে?– নিজে মিষ্টিদ্রব্য বর্জন করে তারপর অন্যদের বর্জনের উপদেশ দেয়া যায়। কারণ আমার নিজের-ই সারা অঙ্গে এত পরিমাণ দুর্নীতির কাদা-মাটি যে, বহুজাতিক সবচেয়ে সুগন্ধী সাবানেও তা এক্ষনি

মোচন সম্ভব নয়– এমতাবস্থায় দুর্নীতির সংজ্ঞা এবং তত্ত্ব বলার যথেষ্ট অধিকার সত্যিই কি আমার ওপর বর্তায়? হেগেলের লেখায় পড়েছিলাম, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় সদগুণ। বাইবেলের দশ আজ্ঞা নিশ্চয় মনে পড়ছে? পাশাপাশি 'শাসকের নীতি' বলেও একটি ধারণা নীতিবিদ্যার দার্শনিকেরা উচ্চারণ করে থাকেন। প্লেটো ভেবেছিলেন– রাজা যদি দার্শনিক হয়, অথবা দার্শনিক যদি রাজা হয়, তবে রাষ্ট্রে নৈতিকতা বিকাশ লাভ করবে। প্লেটোর রিপাবলিকে কথায় কথায় আরো তর্ক উঠে এসেছে: যেমন দুর্বলের নৈতিকতা আইন মেনে চলা, আর সবলের নৈতিকতা আইন ভঙ্গ করা। এমনকি ন্যায়বান মানুষকে বলা হচ্ছে 'বশীভূত ন্যায়বান মানুষ', যিনি কিনা 'মিথ্যে-বিবেক' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন!

এই রকম অম্-মধুর ঝগড়া দর্শনের খুব প্রিয় বিষয় হলেও, স্রেফ উপযোগবাদী ভঙ্গীতে যদি দেখি, তবে বলা যায়– আমাদের শরীর-ধর্ম থেকে যে সব আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনা তৈরি হয়, তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ না রেখে অসামঞ্জস্যপূর্ণ করার আয়োজন হলেই দুর্নীতির আর্বিভাব হয়। লর্ড এ্যাক্টন বলতেন, দুর্নীতির জনক হল ক্ষমতা। এখন 'ক্ষমতা'-কে যদি প্রেক্ষিত বিবেচনা করি, তাহলে দুর্নীতির শেঁকড় খুঁজতে আমাকে আপনাকে ঢাকা-শহরের তাবৎ ক্ষমতাবান বিদ্বৎ-সমাজসহ নতুন একটি সিম্পোজিয়ামে নামতে হয়। আবার ঐ যে বলেছেন– দুর্নীতি নিয়ে 'আলোচনা চরম আকার লাভ করেছে'; এর অর্থ ঢাকা-নগরের সম্মানিত ভাড়াটে গোলটেবিলসমূহ আমাদের নতুন বক্তৃতার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক খালি পাওয়া যাবে তো? যাঁরা গোলটেবিলে আপাতত খেলাধুলা করছেন, মৎস্য শিকার করছেন, ডুবসাঁতার খেলছেন আমাদের এই বাচালতা তৈরির নির্দেশ কি জনগণ স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছে, নাকি ক্ষমতার সুচিন্তিত প্রয়োগে আমারা আলোচনার এজেন্ডা ও দলিলপত্র ক্যু করেছি? অতএব সর্ষের ভূত তাড়ানোর জন্য নুতন লিয়াঁজো অফিসার হব, না চুরি-ডাকাতি করবো– তার হদিস আমিও খুব ভাল জানি না! মহাত্মাদের লেখায় পড়েছি আমলাতন্ত্র হল 'ক্লেপ্টোক্রেসি'– অর্থাৎ তস্করতন্ত্র; আর পড়েছি বড় ডাকাতেরা জোট বেঁধে ব্যাংক তৈরি করে– এটি একটি চীনা প্রবাদ। এখন চোর ভাল না ডাকাত ভাল, তার খতিয়ান দিতে না পারলেও, দেখতে পাচ্ছি, চুরিবিদ্যা জগতের সবচেয়ে মহাবিদ্যা। আবার চুরিবিদ্যা বিভাগের ডালপালাও নিছক কম নয়– আপনি নিজেও গুণতে পারেন: চুরি আমাদের চোরামি, চোট্টামি, তস্করতা, রাহাজানি, ছিনতাই, হাতটান, পাচার, চোরাচালান, গাঁটকাটা, পকেট মারা, ঘরভাঙা, তালাভাঙ্গা,... এমনকি পরের মাথায় খুব সহজেই কাঁঠাল ভাঙতে সাহায্য করে। এই তস্করতন্ত্রের ছাত্র হিসেবে, যখন আমি খুব সহজেই রাষ্ট্রের সি আই পি (কমারসিয়ালি ইমপর্টেন্ট পারসন) এবং ভি আই পি (ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন) হওয়ার সুযোগ পাই, তখন একে 'দুর্নীতি' হিসেবে চিহ্নিত করার কোন প্রজ্ঞা বা সাহস আমার সত্যিই অবশিষ্ট থাকে না।

হালখাতা

বাংলাদেশের মানুষের মনস্তত্ত্বটাই কি দুর্নীতিতে পূর্ণ? যদি সেটা মনে করেন, তাহলে এ ধরনের মনস্তত্ত্ব গঠন-প্রক্রিয়ার উৎস কোথায়?

মামুন হুসাইন

'বাংলাদেশের মানুষ'– এর অর্থ কি মন্ত্রীমহোদয়, আমলা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছানাপোনারা? সারা দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত– এরকম চটজলদি মন্তব্য করা গেলেও পুরো জাতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সাহস আমার নেই। হেগেল অবশ্য বহুকাল আগে ভারতবর্ষকে বলেছিলেন, একটি রূপকথার দেশ আর খানিকটা মায়াবী এবং অতিশয় কল্পনাপ্রবণ! কিন্তু ইতিহাস বলে, খোদ সাহেব এবং সভ্যতার পীঠস্থানেও দুর্নীতি খুব চমৎকারভাবে চর্চা হয়েছে, বিশেষ করে 'নির্বাচন'-এর সময়। বিলেতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি আইনও করা হয়েছিলো করাপ্ট এ্যান্ড ইল্লিগাল প্রাকটিসেস প্রিভেনশান এ্যাক্ট (১৮৮৩) এবং করাপ্ট প্রাকটিস এ্যাক্ট (১৯২৫) নামে। রোম শহরেও ব্রাইবারির ইতিহাস পাওয়া যায় এবং ঘুষ ইত্যাদি নৈতিকতাবিরোধী আচরণ দমনের জন্য সিসেরো দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন। অ্যারিস্টটল একবার প্রস্তাব করেছিলেন, প্রার্থীরা নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণা কাজে নামবেন না। বইয়ে পড়েছি– ১৯৫৩ সালে লেখা, 'ফিলিপ স্টাবস'এর এ্যানাটমি অফ এ্যাবিউস: একটি সময় ছিল যখন অক্সফোর্ডে ভর্তি হতে প্রভোস্টকে একটি বলবান ষাঁড় এবং বিশ-একশ পাউন্ড নগদ গুনতে হত। ভারতবর্ষের নানান শাসন আমলেও এইভাবে অর্থ এবং উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়েছে। বাংলাদেশে এই দুর্যোগময় কাজটি করে মাত্র কয়েকশত পরিবার এবং এদের পাপ বহন করছে পুরো জাতি। মুকুন্দরামের আমলেও আমলাবৃন্দের উৎপাত বর্তমান ছিল– মুকুন্দরাম লিখছেন, রাজস্ব কর্মকর্তা অনাবাদী জমিকে কর্ষিত জমি দেখিয়ে অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য করছে; এবং চাষী ধুতি উৎকোচ দিয়েও সেই বাড়তি খাজনা দেয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন না। মলুয়া লোকগীতিতে বিচারকাজে নিয়োজিত কাজীর অপার ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে– এরা চোরকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং সাধুকে দিচ্ছে কারাবাস। অর্থনীতির পণ্ডিতবৃন্দ দু'ধরনের দুর্নীতির কথা বলেন: নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি এবং অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি। নির্ভরযোগ্য দুর্নীতিতে ঘুষ দিলে কাজ হয়। আর অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতিতে ঘুষ দিলেও লক্ষ্য অর্জন অনিশ্চিত। বিনিয়োগকারীরা নির্ভরযোগ্য দুর্নীতি পছন্দ করেন। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিকর হল অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতি। ১৯২৯-এ একজন সাহেব, মাইকেল ক্যারিট ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এই অনির্ভরযোগ্য দুর্নীতিকে বলেছিলেন 'শুয়োরের বাচ্চাদের দুর্নীতি'– বিষয়টি এই যে, একজন ভারতীয় ক্যারিটের কাছে যেয়ে বললেন, হুজুর, মানুষ আমাদের এখানে তিন পদের। একদল ভালো মানুষ, যারা ঘুষ খায় না। দ্বিতীয় দল বদলোক বটে, কিন্তু ঘুষের বিনিময়ে কাজটি করে দেয়। আর তৃতীয় লোকটি বদতো বটেই, এই শুয়োরের বাচ্চারা ঘুষ খায়, কিন্তু কাজ করে না। বাঙালি জনগণকে

এখন বলতে হবে সরকারকে,– হুজুর আপনাদের সাহায্য আমরা চাই না, বরঞ্চ আমাদেরকে ঐ সব শুয়োরের বাচ্চাদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

রাজার দায়িত্ব সম্পর্কে মনুর নীতিতেও বলা আছে– যে সব দুষ্ট লোক মামলার বিভিন্ন পক্ষ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিন এবং সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন। এখন ঐ যে কথা আছে না– ঘুষ খায় না কেন? পায় না, এই জন্য খায় না হয়তো। রাজকর্মচারীদের এই সম্পদহরণ প্রবণতা বেশ লঘু ভঙ্গীতে কৌটিল্য বর্ণনা করেছেন: জিহ্বায় বিষ বা মধু থাকলে তা না-চেটে থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব হলো ধনসম্পদ লেনদেন করে একটুকুও সরকারের সম্পদ হিসাবে চেখে না দেখা। আবার জলের মাছ কখন জল পান করে, তা জানা যেমন অসম্ভব, কখন সরকারী কর্মচারী তহবিল তছরুপ করে, তাও নির্ণয় করা অসম্ভব। মোটা দাগে ইতিহাসের পরম্পরায় এই ভূখণ্ডের মানুষ অনন্তকাল এই রকম বিবিধ দুর্নীতির স্বাক্ষী এবং এসব দুর্নীতির পেছনে রাজার শাসন ও দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে সক্রিয়ভাবে। আবার ইতিহাস এটিও বলে– উপঢৌকন নেয়া, উৎকোচ নেয়া, এই সব দুর্নীতি জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সরকার-প্রধানও নানান সময়ে করে থাকেন। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ-ই একমাত্র দুর্গন্ধ-জাতি– এই মন্তব্যটি বিবেচনা করতে হবে রাষ্ট্রের সার্বিক অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিকাশের প্রেক্ষিতে। পরিশেষে একটি কথা সবিনয়ে বলি: দুর্নীতির কাজটি নগরমুখো লক্ষ ভাসমান জনগোষ্ঠী করেছে, না দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত বাকি মানুষ দুর্ভিক্ষের মনোটনি এড়াতে রাষ্ট্র বেচা-কেনার নকশাটি তৈরি করলো সঙ্গোপনে? এই আপাত সরল-নিরীহ-ভয়ঙ্কর প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যেই দুর্নীতির সঠিক ব্যবচ্ছেদ হয়তো করা সম্ভব।

হালখাতা

বর্তমানে বাংলাদেশে যাদের দুর্নীতিবাজ হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে এবং যারা দুর্নীতিবাজদের বিচার করার উদ্যোগ নিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মত হলো, এরা উভয়েই দুর্নীতির দায়ে দায়ী। যদি সেটাই হয় তাহলে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ আরেকশ্রেণীর দুর্নীতিবাজকে বিচার করার চেষ্টা চালাচ্ছে; আপনি কী মনে করেন?

মামুন হুসাইন

আপনার কথিত বিচারকার্যে কারা 'বিচারক' কারা 'বিশেষজ্ঞ'– সে-সম্পর্কিত কোনো বংশ-লতা এবং কৌলিন্যের নথিপত্র আমি এখন পর্যন্ত জানি না। মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ, বিজ্ঞ বিচারকবর্গ নাকি সম্মানিত লে. জেনারেলবৃন্দ এই বিচারকার্যের প্রধান জুরি, সে-সম্পর্কে আমার 'জ্ঞানময়-মুর্খতা,' এখন পর্যন্ত সুপর্যাপ্ত খবর নিতে পারেনি। অর্থনীতির পণ্ডিতেরা মনে করেন শাসকবর্গ রাষ্ট্রে দুই ধরনের ত্রুটি ঘটান– একটি করার ত্রুটি (ফেইলিওর অফ কমিশানস্), আর অপরটি না-করার ত্রুটি (ফেইলিওর অফ অমিশানস্)! কাজেই দয়ার্দ্র-চিত্তে যাঁরা যাচাই-বাছাই হওয়ার জন্য আদালতে হাজির

হচ্ছেন, এঁদের ত্রুটির স্বরূপ সর্বাগ্রে নির্ণয় হওয়া দরকার। মাননীয় সিআইপি, কিংবা ভিআইপি মহোদয় আয়কর কম দিয়েছেন, টেলিফোন বিল জমা দেননি, দশটি মোটরগাড়ি পুষছেন, বা দুই এক শিশি নিষিদ্ধ-দ্রাক্ষা জমা রেখেছেন সেলারে– এই নিরীহ ত্রুটির বাইরেও যে আকাশছোঁয়া গোঁজামিল রয়েছে তার হদিস জানা দরকার সর্বাগ্রে: কিভাবে এঁদের অংশগ্রহণে পাটশিল্পকে হত্যা করা হল, কী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বেচা-কেনা করা গেল, কী প্রক্রিয়ায় গ্যাস-তেল পাচার করা হল, কী পদ্ধতিতে সেনানায়ক একদা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করলেন, তার সঠিক তত্ত্ব-তালাশ না হলে আইনী মারপ্যাঁচে আপাত বিপদগ্রস্ত এইসব ভিআইপি জাতির সূর্য-সন্তান হিসেবে অচিরেই আবার আলোকিত হতে থাকবেন ।

হালখাতা

অনেকে মনে করছেন দেশ চোরের হাত থেকে ডাকাতের হাতে পড়েছে; অর্থাৎ আওয়ামিলীগ, বি এন পি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি দলের সরকার ছিলো চোর আর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের চোখের সামনেই দেশের স্বার্থবিরোধী নানা ধরনের চুক্তি করে দেশের খনিজসম্পদ, বিমানবন্দর ইতাদি বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে পারেন, এ বিষয়ে আপনার মত কী?

মামুন হুসাইন

শৈশবে শুনতাম, চোরের মায়ের গলা বড়! এখন ডাকাতের মায়েরা উল্লসিত হন, নাকি এই কৃতিমান সন্তানের জননী হিসেবে আত্মগ্লানিতে লীন হন– সে সম্পর্কে, বিশ্বব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে, আমরা একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি, যে কয়টি দলের নাম উল্লেখ করেছেন, এদের মত ও পথ নিয়ে লম্বা গপ্পো-গুজব করা গেলেও– এরা যে ধরনের উন্নয়ন-অর্থনীতি এবং এদের দুর্নীতি কাজের সহায়ক হিসেবে যে রাজনৈতিক অর্থনীতির চর্চা করে গেছেন, তার মূল ধ্যান একই সূত্রে গাঁথা। এরা সকল সময়ে একই রক্ত বহন করেন, মার্কিন দূতাবাসের একই টেবিলে বিবিধ খানাপিনা করেন, কখনও দূরবর্তী-নিকটবর্তী কাজিনস এরা, একই গল্ফ ক্লাবের সদস্য, একই ব্যাংকের ডিরেক্টর, একই মঞ্চে নৃত্য-গীত করেন, একই সংসদে বিজলী-বাতি পোড়ান,... এমনকি পুত্র-কন্যাকে বিয়েতে বসিয়ে বাসি সম্পর্ক গভীর থেকে আরো গভীরতর করে গেছেন। কাজেই ব্যাপারটি রিলেরেসের মতো– স্বচ্ছ বা অন্ধকার ব্যালটবাক্সের আন্তর্জাতিক টেন্ডারপত্র যে ধারাবাহিকতায় তৈরি হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতায় দেশের খোলনলচে সবকিছু কেনাবেচার কাজটিও সুচারুরূপে সমাধা হতে চলেছে। কারণ রাজা বদল মানেই চুক্তি বদল নয়। সে আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই হই, আর বিবিধ দলের উপনেতাই হই– রাজার ভঙ্গিমা নেয়ার আগে আমাকে 'আঙ্কল সাম' এর সঙ্গে একবার অন্তত ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসতেই হচ্ছে: তারপর ফলকাটা ছুরিতে হাত বোলাতে-বোলাতে, ফলের শরীরে ছুরি প্রবিষ্ট করতে-করতে

সিদ্ধান্ত হয়ে যায়– কতকাল রাজত্ব চলবে, কতজন 'পলিটিকাল-উইডো' হবেন এবং কত দ্রুততায় সমস্ত ভূ-সম্পদ নিংড়ানো সম্ভব হবে। ভেনিজুয়েলা, নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকোসহ সকল ল্যাটিন এবং আফ্রো-এশিয়ায় সর্বনাশের কাজটা এভাবেই সংঘটিত হয়েছে নিকট অতীতে। আর আমার সরকার তো ক্যাস্ট্রোর মতো বা হুগো শাভেজের মতো কিঞ্চিত দূর্বিনীত নন যে, 'না' বলার মতো পবিত্র-সাহস কখনও অর্জন করতে পারবেন। কাজেই সাহস খোঁজার জন্য তাকাতে হয় কানসাট বা ফুলবাড়িয়ার দিকে– ফুলবাড়িয়ার মানুষ মৃত্যুবরণ করে, মাটির নিচে নিখোঁজ হয়, আর গভীরতম সৃজনশীলতায় এই সব লাশ গোপন খনির ভেতর নতুন কয়লা হওয়ার অপেক্ষায় লক্ষ বছর বেঁচে থাকে। এখন 'চোর' বা 'ডাকাত' নামে, আপনি যাদের আদর করছেন– এই সুমহান রূপান্তরের-ব্যাকরণ কস্মিনকালে তারা উদঘাটন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি না।

হালখাতা

দুর্নীতি নিশ্চয়ই শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। সেটা যদি হয় তাহলে অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের কথিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও সুশীল সমাজের লোকজন সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিবাজ, তাদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। আপনি কী মনে করেন?

মামুন হুসাইন

আপনি এই যে বার-বার 'বিচার' এর কথা তুলছেন, কেন? পুরো জাতির কি 'ট্রায়াল' চলছে, নাকি আমাদের দেখাশুনার জন্য হঠাৎ কোনো ট্রুথ কমিশন তৈরি হয়েছে? বুদ্ধিজীবী জাতির বিবেক, নাকি বুদ্ধি বিক্রি করে আলু-পটলের খরচ মেটান– তার সব খবর আমি বলতে পারবো না। আপনি ঐ যে 'বুদ্ধিজীবী'শ্রেণী'র কথা বলছেন– এই 'শ্রেণী' শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করলে অনেকখানি জবাব পেয়ে যাবেন। বুদ্ধির মাস্টারমশাইরাতো এই ভূ-খণ্ডেই অবস্থান করছেন। কাজেই দুর্নীতি-সুনীতিসহ সকল কর্মকারের আঁশ-শ্যাওলা তার গায়েও তীব্রভাবে বর্তমান। এখন বুদ্ধির দাপটে তিনি কিভাবে দুর্নীতির রাজনীতিকে পাকাপোক্ত করার উপায় সরবরাহ করেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ উপদেষ্টামণ্ডলীর কাছে, কিভাবে বিশ্বব্যাংকের দরবারে আমাদের গলিঘোঁজের নকশা এঁকে দেখান কিংবা উন্নয়নের অর্থনীতিকে গভীর ছল-চাতুরী করে কিভাবে আমাদের ধানক্ষেত-বাজার এবং নদী-নালায় প্রবিষ্ট করে ফেলা যায়, তার কোলাবরেটর সাজেন– এসবের সন্ধান জনগণকে অবশ্যই পেতে হবে। কর্তাব্যক্তিদের বক্তৃতা রচনা করা থেকে শুরু করে মার্শাল ল, ক্যু, অপহরণ এবং সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বৈধতার জন্য আইন প্রণয়ন, আইনসংশোধন এবং আইনের পৃষ্ঠপোষকতা এই সব অতীব-ভয়ঙ্কর বুদ্ধিবাদী মানুষই সযত্নে সরবারহ করেছেন। এমনকি তেলচুক্তি গ্যাসচুক্তির মতো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আত্মহননকারী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন আমাদের অতীব

বিখ্যাত বুদ্ধিময় ডক্টরবৃন্দ, যারা নানান সময়ে এমনকি মানবাধিকার এবং স্বচ্ছতা বিষয়ক সিরিজ বক্তৃতার অন্যতম শোভা হিসেবে সদা বিদ্যমান!

আপনি এক ফাঁকে 'সুশীল' সমাজের কথা তুলেছেন। মূর্খতা আড়াল করতে আমি সুশীল শব্দের অর্থ খুঁজেছি– এর অর্থ ভালো মানুষ, সুসভ্য, সদাচারী, সদালাপী ইত্যাদি। অভিধানে এসবের খানিকটা নিচে আবার লেখা আছে 'আপসমূলক'! এখন জনৈক ভদ্দরলোক সুসভ্য থাকার জন্য মিন-মিনে ভঙ্গিতে কতখানি 'আপস' করেন, তার ওপরই নির্ভর করে তার বাঁচামরা, তার প্রমোশন, তার দেশভ্রমণ এবং লোকপ্রিয়তা। 'সুশীল সমাজ' এই শব্দটিকে কিছুদিন ধরে যারা ঘষা-মাজা করছেন, লক্ষ্য করবেন তারা প্রধানত বিশিষ্ট বেসরকারী-সংস্থার অধিকর্তাবৃন্দ। বাঙালি কি তবে এদের বিশেষ অনুগ্রহে ইদানিং 'সুশীল' হওয়ার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছেন? আবার এই সুশীল সমাজের অফিস থেকে সাহিত্য হয়, নাটক হয়, পত্রিকা ছাপা হয়, উন্নয়ন হয়, সংস্কৃতি উৎসব হয়, ঋণ বিতরণ হয়, পুরস্কার দেয়া হয়– এবং সবচেয়ে বড় কথা আন্তঃমণ্ডলীয় যোগাযোগের মাধ্যমে এইড বিজনেস, তথা এইড ইমপেরিয়ালিজম জারি রাখার সকল সূক্ষ্ম কারচুপি হয়। তবে এইসব কালো-কোলো-খর্বাকৃত মানুষ আচরণে কদাপি সুশীল– এদের কর্মীবাহিনী, এদের ফিল্ডওর্য়াকারবৃন্দ স্বল্প বেতনে স্ত্রী-পুত্রহীনদশায় কিভাবে চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিভাবে আত্মহত্যা করেন, তার রহস্য জানতে দরকার একটি গণশুনানী অনুষ্ঠান আয়োজন করা। সর্বোপরি সুশীল সমাজের পেট-মোটা-বিবিধ ধাতুময় আংটিবেষ্টিত হাত ধরে আছে, মহান যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ব্যবস্থাপনা কমিটি। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকার বা রাষ্ট্রের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই অতীব শক্তিশালী রাষ্ট্রের কলকব্জা পরীক্ষা করার ঝুঁকি কি আপনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন?

শেষে একটি কথা মনে হল: আমরা যারা মনে করি আমাদের অনেক বুদ্ধি এবং জ্ঞান, এদের উদ্দেশ্যে বেকনের একটি ইঙ্গিত আছে– ক্ষমতার লোভ যেমন পদস্খলন ঘটায় তেমনি অপরিমিত জ্ঞানস্পৃহাও মানুষের পতন ঘটায়। কে জানে বুদ্ধিদীপ্ত সুশীল সমাজে এই জন্যই কি কেবলমাত্র ক্ষয় এবং সমূহ পতনের অপরূপ-অন্ধকার!

হালখাতা

সাহিত্য নিয়ে দুর্নীতি ও দুর্নীতি নিয়ে সাহিত্য– বিষয় দু'টি সম্পর্কে বলুন।

মামুন হুসাইন

এখন তো তাহলে– হোয়াট ইজ লিটারাচার, এই শিরোনামে আর একটি নকল পুস্তক লিখতে হয়। সাহিত্যের কাজ বনাম সাহিত্যিকের কাজ– এই ভঙ্গিতেও আপনি ভাবতে পারেন। আবার, সাহিত্যের কাজে যে মগ্নতা, যে ধ্যান, তার সঙ্গে সুনীতি-দুর্নীতির সম্পর্ক কী– এসব নিয়েও ব্যাপক ঝগড়া করা যায়। অনেককাল আগে সুমহান লেখকদের কেউ ভেবেছিলেন, লেখার মাধ্যমে তিনি তাঁর দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে

চলেছেন। এই কথা যদি এতদিন পর আবারও তোতলামির ভঙ্গীতে আওড়াতে চাই– তাহলে কি খুবই আদিখ্যেতার মতো শোনায়? এখন সাহিত্য নিশ্চয় উচ্চ নম্বরের সিঁড়ি নয়। এদিকে আপনি 'দুর্নীতি' শব্দের ওপর যেভাবে ঝোঁক দিয়েছেন, তাহলে কি বলা যায়, খুব গোড়াতেই সাহিত্যের কাছে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা নিয়ে একটি দুর্যোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে? বিষয়টি তো শুধু প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা করে বোঝানো যাবে না– হোয়াট ইজ টু বি ডান! সাহিত্য করতে-আসা মানুষটিকেই ভেবে তার গন্তব্য স্থির করতে হবে। বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা কী কী দুর্নীতি করছে বলে আপনার ধারণা?– পুরস্কার পাওয়ার জন্য তদ্বির, লেখার অংশবিশেষ চুরি করা, সাহিত্য-সম্পাদককে দ্রাক্ষা সরবরাহ, খানিকটা এক্সট্রা-মেরাইটাল রিলেশানের সুযোগ করে দেয়া, জনযুদ্ধের সময় হত্যাকারীদের পক্ষে রেডিও টক দেয়া কিংবা স্বাক্ষর দেয়া, বড়লোক লেখকের মদ-মাংস খেয়ে অনুকূল রিভিউ লেখা, বিবিধ সাহিত্যমেলার নেমন্তন্ন উদ্ধার, জনকল্যাণ বিরোধী প্রপাগান্ডায় অংশগ্রহণ, নিউইয়র্কের বাঙালি উৎসবে যোগদানের স্পন্সর যোগাড় এবং কোনোভাবেই এ্যানথোলজি মিস না করা এ সব-ই কি দুর্নীতি? তবে বাংলাদেশের বহু লেখক চাকরি হিসেবে যেহেতু অতীব ক্ষমতাবানদের কাগজে নাম লিখিয়েছেন– সেখানে স্বেচ্ছায় এবং স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কিভাবে কাগজওয়ালাকে বাঁচান, কোন পদ্ধতিতে কাগজওয়ালাদের আত্মীয়কুলকে খ্যাতিমান চিন্তকে রূপান্তরিত করেন, কিভাবে কর্পোরেট বিশ্বকে সহায়তা দেন, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট আপনি উদ্ধারের জন্য আদাজল খেয়ে নামতেই পারেন। আপনি নিশ্চয় মানবেন সাহিত্যের মধ্যে নাটক এবং গানবাজনার লোকজনও পড়ে; এই উর্বর ভূ-খণ্ডে আপনি একজন তদন্ত কর্মকর্তা খুব সহজেই নিযুক্ত করতে পারবেন। আমাদের সকল নাট্যবিশারদ ও শিল্পীবৃন্দ নেসলে-লাক্স-ন্যাসকাফি এবং মোবাইল ফোনের ইমামদের সঙ্গে কিভাবে নিত্য নামাজ-রোজা এবং তাসবিহ-তাহলিল করে চলেছেন– তার খবরাখবর, চাইলে আপনি অতি দ্রুত কাঁচামাল হিসেবে বিক্রি করতে পারবেন। বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে চ্যাম্পিয়ান গায়ক এবং নটরাজ বহুজাতিক ব্যবসাকে বাজারজাত করার জন্য কী অপরূপ মায়াবী চাউনিতে আপনাকে প্রলুব্ধ করছে! অপরদিকে উন্নয়ন-মডেলকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নাট্যজনেরা নিত্য-নতুন ডেভেলপমেন্ট-থিয়েটার উদ্বোধন করছেন, এনজিও ভায়াদের ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরি করে দিচ্ছেন, ওর্য়াকসপ করছেন এবং সর্বত্র এইসব কাজের কোটেশন ও টেন্ডার নিয়ে আমাদের মহান শিল্পীবৃন্দ অহর্নিশি এতটাই ঘর্মাক্ত অথবা অহিংসা আন্দোলনে নিমজ্জিত যে নিজের বিজ্ঞাপিত ডিওডোরেন্টেও পর্যাপ্ত দুর্গন্ধমুক্ত হতে পারছেন না!

আর 'দুর্নীতি নিয়ে সাহিত্য'– উপাদান হিসেবে কেউ যদি বিষয়টিকে স্থির করেন, আমি তো আপত্তি করতে পারি না। লেখক বিষয় নির্ধারণের এই স্বাধীনতা চিরকাল ভোগ করেন, লেখকের ভেতর একজন জৈববৃত্তের মানুষ থাকে, আর থাকে একজন সৃষ্টিকর্তা! চারপাশের ক্লিন্নতা, ক্ষুদ্রতা, আধিক্য, পঙ্কিলতা, উন্মাদনা এবং অখণ্ডনীয়তা দিয়ে তিনি তার জগত গড়েন– ফলে নিয়ম বেঁধে দেয়ার নির্দেশ, আমি নিশ্চয় অর্পণ

করতে পারি না। আমি লেখাকে অন্যভাবে দেখি– লেখাটি শেষ পর্যন্ত খুব গুছিয়ে করতে পারলাম, না একেবারেই ভাঙ্গাচোরা এবং অবিন্যস্ত থেকে গেল!

হালখাতা

জাঁ পল সার্ত্রে বলেছেন, পুরস্কার দুর্নীতি সৃষ্টি করে। আপনি কি তাই মনে করেন? আপনার মতে পুরস্কার কীভাবে দুর্নীতি সৃষ্টি করে?

মামুন হুসাইন

'রিওয়ার্ড এবং পানিসমেন্ট' কে কাজে লাগিয়ে বিশেষ কোনো 'আচরণ' পরিবর্তন করা– এটি অনেক সময় চিকিৎসার অংশ। কিন্তু সার্ত্রে তো আর চিকিৎসা-গবেষণার উপলক্ষ নয়, কাজেই তিনি ১৯৬৪ সালের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর প্রাণশক্তি এবং 'স্বাধীনতা'র জোরে। পুরস্কার দুর্নীতি সৃষ্টি করে– সার্ত্রে কি এই কথা বলেছিলেন? আমার জানা নেই। তবে ওঁর পুরস্কার প্রত্যাখান বক্তৃতায় আমি দুটি কারণ পেয়েছিলাম: পুরস্কার গ্রহণ অর্থ নিজেকে বিকিয়ে দেয়া এবং পুরস্কার মানুষের বিদ্রোহকে সংযত করে। আসলে, সার্ত্রে পুরস্কার প্রত্যাখান করলেন– এটি ওঁর জীবনে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। সার্ত্রে পুরস্কার গ্রহণ করেননি– কেবল সাধারণ জ্ঞানের তথ্য হিসেবে ঘটনাটিকে মনে রাখলে কিছুই সুস্পষ্ট হয় না; যেমনটি হয় না সক্রেটিসের ক্ষেত্রে– সক্রেটিস কিভাবে মারা গেলেন? আমরা ক্লাসের বেঞ্চ থেকে চিৎকার করে উঠলাম, ... বিষ খেয়ে। কিন্তু এই জীবন-আচরণের পেছনে যে দ্রোহ, বীক্ষা, চিন্তন– তার সবটুকুই তাতে অধরা থেকে গেলো। আমার দর্শনের বন্ধুরা সার্ত্রের রাজনীতি ও সমাজভাবনাকে আরো গুছিয়ে বলতে পারতেন– সার্ত্রের সত্তা ও শূন্যতা, সার্ত্রের বোধে স্বাধীনতার ধারণা, সার্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের বন্ধুত্ব ও দূরত্ব, সার্ত্রের মানবতাবাদ এবং সার্ত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ সন্ধানের মধ্যেই তাঁর চিহ্নিত আচরণসমূহের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় হয়তো। আপনার নিশ্চয় স্মরণে আছে– সার্ত্রে বলেছিলেন, এই নোবেল পুরস্কারই হয়তো গ্রহণ করা যেত, যদিবা, আলজিরিয়ার যুদ্ধের সময় 'ডিক্লিয়ারেশন অব দি-১২১' স্বাক্ষরের সময় প্রদান করা হত। কারণ এটি হত, 'স্বাধীনতা' কে সম্মান জানানো। সার্ত্রে প্রধানত মানুষের এই 'স্বাধীনতা' কে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। এখন আমাদের যে ভাবনার স্তর, তার সঙ্গে কর্মযোগের যোজন-যোজন দূরত্ব! ফলে দুর্বল-ভিক্ষুক-নপুংসক মানুষের মতো, পুরস্কারের অর্থ-সাহায্য প্রত্যাখ্যান করার ন্যূনতম সাহস হয় না। পুরস্কার কি কখনও পাঠকদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে? হতে পারে। আমাদের মতো ঊনপাজুরে মানুষ শেষ পর্যন্ত 'প্রতিষ্ঠানে' পরিণত হয় কিনা জানি না, তবে কাগজে ফটো ছাপানোর জোরে বা কয়েকটি মুদ্রার আস্ফালনে মানুষের ক্ষীণ স্মৃতিতে কিছুদিন হয়তো একটি 'সম্মানজনক পরিবেষ্টনী' -তে আটকে থাকেন।

হালখাতা

ভালো কাজের জন্য তো পৃথিবীব্যাপী পুরস্কার দেয়া হয়। আপনি বলবেন কি সার্ত্রে কী কারণে নোবেল প্রাইজ না নিয়েও পৃথিবীর মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হলেন? আর আমাদের ড. ইউনুস নোবেল প্রাইজ পেয়ে এতই খুশি হলেন কিন্তু পরে সমালোচিতও হলেন। এমনটি কেন হলো?

মামুন হুসাইন

সার্ত্রে সম্পর্কে খানিকটা কথাবার্তা বলার সুযোগ এর আগে নিয়েছি। 'ডক্টর-এ পুণ্যময়' ইউনুস সাহেব পুরস্কার পেয়ে কেন গদগদ হলেন এই জবাবটা ওঁরই দেওয়ার কথা। উনি কি 'হাস্যকর উপাদানে পরিণত' হয়েছেন? সে আলামত তো দেখছি না! বরঞ্চ আরও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি!– পৃথিবীর অগুনতি মিডিয়ায় তার হাসি-হাসি গ্রামীণ চেক এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উবুড় করে দেয়া সম্মাননাপত্র হাতে জগতের শ্রেষ্ঠতম খাদ্য-পানীয় ভোগ করছেন এবং অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। পুরস্কার গ্রহণ এবং পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের ব্যাখ্যা কী এত অল্প পরিসরে বোঝানো যায়? যে কোনো পুরস্কারের পিছনে কমিটি একটি 'ব্যাখ্যা' জুড়ে দেয়। এই 'ব্যাখ্যা' গ্রহণ-বর্জনের সময় আপনার নিজস্ব দ্রোহ, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার মিথষ্ক্রিয়া হয়। তারপর, হয় আমি পুরস্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ি অথবা পালিয়ে যাই! ইউনুস সাহেব যাদের হয়ে, যাদের নির্দেশে, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, যাদের মনোরঞ্জনের জন্য এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন– বহুকাল আগেই তিনি তাদের কাছে অতীব সম্মানযোগ্য গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছে গেছেন আমাদের 'মাইক্রোক্রেডিট' নামক বোরাকে চড়ে।

হালখাতা

ড. ইউনুসের মাইক্রোক্রেডিটের ওপর বদরুদ্দিন উমর একটি গ্রন্থ লিখেছেন। পক্ষান্তরে অনেকেই আবার মনে করেন, ড. ইউনুস ভালো কাজই করছেন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

মামুন হুসাইন

মাইক্রোক্রেডিটের বিরুদ্ধে উমর সাহেব ছাড়া আনু মুহম্মদ এবং আরও কিছু অর্থনীতিবিদ দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। দেখবেন, মাইক্রোক্রেডিটওয়ালারা ঋণবিতরণ করছে প্রধানত মহিলাদের মধ্যে যাকে বলা হয় ফেমিনাইজেশন অফ পোভার্টি! কারণ নারীরা 'ভালো গরিব' এবং এরা নিজের স্বার্থ ও পরিবারের স্বার্থকে অভিন্নরূপে দেখে। ফলে লগ্নিকৃত ঋণ তীব্র সুদের ধাঁধায় পড়লেও, ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং দাতাগোষ্ঠী আরও আনন্দিত এই জন্য যে, দে হ্যাভ সোয়ালোড দেয়ার প্রাইড, অর্থাৎ নারীরা তাদের অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়েছে! 'ঋণগ্রহীতা মানুষ' শেষ পর্যন্ত এইভাবে এক নব্য-মহাজনী চক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে– এর ভুরি-ভুরি কেসস্টাডি এই

দেশেই আছে। ঋণদানের কল্যাণে লক্ষ-কোটি অর্থ বাজারে নামে বটে, কিন্তু তা কখনও দাঁড়ায় না; অবিন্যস্ত সমাজকাঠামো এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতির মারপ্যাঁচে ঋণের টাকা চুইয়ে পড়তে-পড়তে শেষ পর্যন্ত ফিকে হয়ে যায়। যে জন্য আকাঙ্ক্ষিত 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থে পুঁজি সঠিক-টেকসই প্রযুক্তিসহ সঞ্চয়ন করা চাই; যা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প দিয়ে করা সম্ভব নয়। মানুষকে এক্ষণি হত্যা না করে– ঋণের পাঁকে আবদ্ধ রেখে, দারিদ্র্যে রেখে, তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত করার এক সুবিখ্যাত 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' এইসব ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। কারণ যে সব 'সূচক' দিয়ে রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা এবং উন্নয়ন মাপযোখ করা হয়– তার কোনোটি-ই প্রস্তাবিত মান-এ পৌঁছাতে পারেনি এই তীব্র মাইক্রোক্রেডিটের জোয়ার সত্ত্বেও। এক কথায়, দারিদ্র্য বিমোচন নয়, দারিদ্র্যকে জল ছিটিয়ে বাঁচিয়ে রাখা অথবা গরিবদের সাহায্য দিয়ে 'বাজার'-এ অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা– যেন সুকৌশলে আমাদের মহান প্রভুরা তাঁদের এইড বিজনেস তথা এইড ইম্পেরিয়ালিজমকে জারি রাখতে পারে অনন্তকাল; এবং সেই সূত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রণোদনা ধ্বংস হতে হতে যেন-বা এটি নিশ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়! ইউনুস সাহেব দাতাগোষ্ঠীর হয়ে আমাদের বৃহত্তর জনপদে সেই জেনেটিক- মিউটেশনের কাজটি-ই অতি সুচারুরূপে করতে পেরেছেন। যে জন্য তাবৎ ম্যালফর্ম-ম্যালনারিস্‌ভ বাঙালবৃন্দ এই শান্তি পুরস্কারকে তিরস্কার করার গোপন-দ্রোহ আর কোনোভাবেই প্রদর্শন করতে পারে না। অন্যদিকে, সেই যে রাষ্ট্রের সমান্তরাল দাঁড়ানো অথবা রাষ্ট্রের অধিক আর-একটি সাম্রাজ্য এনজিও প্রভুরা খুব সুচিন্তিতভাবে জমি দখলের সেই কাজটি করে চলেছেন: যেন-বা সবচেয়ে খাঁটি সার, খাঁটি বীজ, বিশুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, অপরূপ হাসপাতাল, লোকশিল্পের শ্রেষ্ঠ সপিংমল, টকদই, বাসমোতি, কাটারিভোগ, জেনেটিক ফুড ও হাইব্রিড প্রযুক্তি একমাত্র তারাই বিশ্বস্ততার সঙ্গে সরবরাহ করে চলেছেন। এর অর্থ, আবারও পরনির্ভরতা, বশ্যতা এবং নতুন উপনিবেশে চিরকালের জন্য নাম লেখানো।

হালখাতা

পুরস্কার নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন, আমাদের দেশে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার লেখকরা এক সময়ে এসে পুঁজিতন্ত্রের পোষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার গ্রহণ করে বেশ খুশি হন। এর অর্থ দাঁড়ায় জীবনভর কষ্টক্লেশ করে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে থেকেছেন, কথা বলেছেন, লিখেছেন সে জন্যই এই পুরস্কার; আপনার মতে এটা লেখকদের কী ধরনের দুর্নীতি?

মামুন হুসাইন

সাম্যবাদী চিন্তা মগজে ধারণ করা এবং তা 'কর্মযোগে' রূপান্তরিত করা এক কথা নয়। জগতের কর্মকাণ্ডকে বুঝবার জন্য 'সাম্যবাদ' অনেকের কাছে নিতান্ত একটি কেজো-টুলস্। সবাই যখন দুধ-ভাতে আছেন, তখন লেখক সারাজীবন পাতাকুড়িয়ে, কচু-ঘেঁচু

খেয়ে আন্ডার-ওয়েট হবেন– এই পরামর্শপত্র কি তিনি মানতে বাধ্য? কাজেই এই প্রশ্ন কেবলমাত্র হতদরিদ্র লেখকের ক্ষেত্রে তুলছেন কেন?

লেখক নিশ্চয় স্টয়েক ঘরানার কোনো দার্শনিক নয় যে, সারাজীবন তিনি দারিদ্র্য-পান করবেন আকণ্ঠ। দার্শনিক এন্টিফেনিসের ছেঁড়া কাপড় দেখে. সক্রেটিস মন্তব্য করেছিলেন, এন্টিফেনিসের পোষাকের প্রতিটি ছিদ্রে ওঁর দম্ভ দেখা যায়, বলতে কী, আজ এই দম্ভ না থাকায় খুব সহজেই আমি তাই বেচাকেনার হাটে নিখোঁজ হয়ে যাই। পাশাপাশি, অনন্তকাল 'চৈনিক' থেকে, ভূ-গর্ভস্থ আন্দোলন করে, শেষপর্যন্ত আমাদের দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গ কি ক্যান্টনমেন্টের বারান্দায় ঘন ঘন আন্ডারগার্মেন্টস্ বদল করছেন না? কিংবা দিশি খেতে-খেতে জিহ্বার ময়লা-ফাঙ্গাস পরিষ্কারের জন্য এরা কি একটিবার অন্তত জি-৮-এর মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে করমর্দন বা হস্ত-মৈথুনের ফাঁকে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করেন না? এখন এই সব ভ্রষ্টাচারের কারণ উদঘাটনের জন্য নতুন গবেষণাপত্র তৈরি করা যায়। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বশ করে ডিপার্টমেন্ট অফ গুড কন্ডাক্টস নামের একটি অত্যাধুনিক দালান বানানো যায়, সদাচরণকারী সর্বোচ্চ ব্যক্তির নামে একটি 'চেয়ার' বসানো যায় এবং সবশেষে সঙ্গোপনে আমি-আপনি এবং আমরা কতিপয় ভ্রষ্টলেখক– বাগানের সুমিষ্ট আম্রপালী, দু-বিশ কেজি রসমঞ্জরী এবং ক্ষীণ অর্থভাণ্ডার (স্পিডমানি) উপহার দিয়ে, নথিপত্র লেখার জন্য দুর্নীতি উৎপাটন পর্ষদে একটি নাতিশীতোষ্ণ চাকরি যোগাড় করতে পারি জেলখানার রাইটারদের মতো।

হালখাতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রে দুর্গা যে সোনার চেইনটি চুরি করেছিল এটা তো সত্য; দুর্গা মারা যাওয়ার পরে অপুর মধ্যদিয়ে পাঠক যখন জানতে পারে যে দুর্গা চোর, তখনও দুর্গার প্রতি পাঠকের পক্ষপাত কাজ করে, কিন্তু কেন? এখানে পাঠকের মনস্তত্ত্বটা আসলে কী দুর্গারা গরীব, দুর্গা বয়সে ছোট– এর বাইরে আর কোনো মানবীয় কারণ আছে কি?

মামুন হুসাইন

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে না গিয়ে আমি 'পথের পাঁচালি'র মূল লেখা থেকেই বলি। বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দপুরে, যদ্দুর মনে পড়ে দুটি জিনিস খোওয়া যায়। একটি হল পুঁতির মালা (সোনার চেইন নয়) আর অপরটি সোনার কৌটা। দুর্গার পুতুলের বাক্স তছনছ করে, সোনামুখী আমের গুটিসহ পুঁতির মালা উদ্ধার করে ভুবন মুখুজ্যের সেজ ঠাকরুন এবং তার দলবল। এই উদ্ধারপর্বের কথা সবাই জেনে যায়। কিন্তু সোনার কৌটার খবর জানতে পারে একমাত্র অপু– নিশ্চিন্দপুর ছেড়ে যাওয়ার দিন, কৌটোটিকে সে বাঁশবনে ছুঁড়ে দেয়, যেন পৃথিবীর কেউ, এমনকি মা পর্যন্ত না জানতে পারে ঘটনাটি। এখন বিষয়টি কেবলমাত্র চুরি, তদন্ত এবং উদ্ধারপর্বের মধ্যে সীমিত

রাখলে, মানব-প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণ অনেকখানি অধরা থেকে যাবে। পাস্তরনাকের সুবিখ্যাত লেখা– লাইফ, মাই সিস্টার, এই ক্ষেত্রে মনে করতে পারি। জীবন ও বোন পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়, অপু-দুর্গা তা তীব্রভাবে প্রমাণ করে গেছে! শৈশব-কৈশোরে, প্রকৃতিতে যা ছড়িয়ে থাকে, তার সবটুকু আমার; সকল আনন্দ, সকল রূপবৈচিত্র্য আমি আকণ্ঠ পান করতে চাই, অবগাহন করতে চাই; গুড গার্ল-মোরালিটি'র বাধ্যবাধকতা তাই দুর্গাকে খুব সামান্যই স্পর্শ করেছিল!

আসলে অপুর কাছে দুর্গা জীবনের সকল আনন্দের প্রতিমূর্তি; অস্তিত্বের সর্বত্র দুর্গা, সকল পবিত্রতা নিয়ে সদাজাগ্রত; অপু তাই বোনকে শুচি করে তোলে, অপাপবিদ্ধ করে, আর গভীর এক মায়া অনুভব করে: দুর্গার একগুচ্ছ রুক্ষচুল উড়তে দেখলে মায়া হয়। যেন ওর কেউ নেই। তখন মনে হয় ওর সব দুঃখ ঘুচিয়ে দি। সকল অভাব পূরণ করি...। এই মায়া, চোখে জল আনে এবং আমরা তখন অন্তরে বাহিরে পরিশ্রুত হই।

কিন্তু আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন, একখণ্ড পুঁতির মালা এবং একটি সোনার কৌটার স্বীকারোক্তি না দেয়ায় দুর্গাকে কত জরিমানা করবে, তা জানার জন্য অগত্যা আপনাকে অপেক্ষা করতেই হয়।

হালখাতা

দুর্নীতিবাজ লেখক ও দুর্নীতিপূর্ণ লেখা চিহ্নিত করার উপায় কী হতে পারে?

মামুন হুসাইন

'লেখক এবং তার লেখা দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে'– আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী, এই দুর্যোগ চিহ্নিত করার কোনো বৈশিষ্ট্য বা মোডিউল আমার চোখে পড়েনি অদ্যাবধি। আমার স্বল্পবিদ্যা বলে– যাকে আমরা 'লেখা' বলি, যে লেখার সঙ্গে আমাদের রক্তপাত যুক্ত হয় সেখানে লেখকের পদস্খলন কিভাবে সম্ভব, বুঝতে পারি না। লেখা, যতদূর জেনেছি, এক ধরনের কনফেশান এবং ক্যাথারসিস। সত্যিকার 'লেখা' আয়নার মতো আমার সামনে এসে দাঁড়ায়– আমি তখন আমার রুগ্নতা চিহ্নিত করতে পারি, আমি আমার সম্ভাবনাকে দেখতে পাই, আমি আমার পাপমুক্তি ঘটাই এবং বাঁচার প্রণোদনা খুঁজে পাই।

এখন লেখা তো আর চিরকালীন 'ইসপস্ ফ্যাবলস' নয় যে, সেখানে আমরা কেবল নীতিশাস্ত্র চর্চা করতে আসি। এক কথায় 'দুর্নীতি-সুনীতি' নয়– লেখায় আমার সকল ক্ষয়, দ্রোহ এবং ভ্রষ্টাচার নিয়েই প্রতিফলিত হতে চাই। কারণ লেখার যে মৌল স্পিরিট, সেখানে কোনোভাবেই কোনো উপর-চালাকি এবং মিথ্যাচারকে কাঁধে চাপিয়ে দেয়া যায় না।

হালখাতা

বাংলাদেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল সেক্টর প্রধানত আওয়ামী ও বিএনপি দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে; দুটি ধারার পুরোটাই যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত , সেখানে দুর্নীতি নির্মূল করার ক্ষেত্রে চলমান প্রক্রিয়ায় কি আদৌ সফল হওয়া যাবে? এর বাইরে অন্য কী প্রক্রিয়ায় সার্বিক যে দুর্নীতি সেটা দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

মামুন হুসাইন

তাহলে হাবাগোবা-গোবর্ধন-লেখককুলের বাইরেও দুর্নীতিচর্চা বেগবান হয়েছে, তাই তো বলতে চাইছেন? এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রের এই সব অফিস মূলত নেতৃবৃন্দের এক-একটি কমিটি কিংবা উপ-কমিটি। কেন্দ্র তার দুর্নীতির সুনীতিকে (আসলে বদনীতিকেই) বহাল রাখার জন্য, নানান উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে এদের পদানত রাখে। কিন্তু দুর্নীতি মানেই মাস্টারমশাই, বিচারক এবং চিকিৎসক– কথাটি আংশিক সত্য। বাংলাদেশের যে কোনো জেলাপ্রশাসক, যে কোনো পুলিশ সুপার, যে কোন সচিব, যে কোনো নির্বাহী প্রকৌশলী, যে কোনো কাষ্টমস অফিসার, একজন অধ্যাপকের তুলানায় অতিরিক্ত বেতন-ভাতা উত্তোলন করার যোগ্যতা রাখেন না। কিন্তু বিফফ্যাটেনিং প্রজেক্টের মতো, এরা প্রত্যেকেই অতীব স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করেন, এমনকি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরও। আমাদের সমরঅধিপতিদের অডিট নিষিদ্ধ– এরা কিভাবে বিত্ত তৈরি করেন, এক-একটি পলিটিকাল কিলিং উপলক্ষে কিভাবে পুরস্কৃত হন, কিভাবে কর্পোরেশনের অধীশ্বর হন, কিভাবে ব্যাংক কিনে ফেলেন..., এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন না কেউ। শুনেছিলাম– টেলিফোন শিল্পসংস্থার ভাইয়েরা দুপুরে এক টাকার মধ্যেই লাঞ্চ করেন; জিয়া বিমানবন্দরে কাস্টমস ঝক্কি মেটাতে পঁচাত্তরটি সই-স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করেছেন সরকার; কোরাম পূর্ণ না হওয়ার জন্য পার্লামেন্টারিয়ানরা অপেক্ষায়-অপেক্ষায় টাকার শ্রাদ্ধ করে গেছেন দিনের পর দিন; বিশিষ্ট সিপিআইবৃন্দ হুণ্ডি ব্যবসায় ক্লান্তিহীন কাজ করে চলেছেন; তিতাস গ্যাসের মিটার রিডার এখন কোটিপতি আর সবচেয়ে সম্মানজনক জীবন যাপন করছেন 'পলিটিকাল ইন্ডাস্ট্রির মাননীয় ভিআইপিবৃন্দ– জমি, গাড়ি, দালান ইত্যাদির পাশাপাশি, তারা প্রত্যেকেই এক-একটি মিনি চিড়িয়াখানার প্রধান কিউরেটর ইদানিং।

এদের আটক করে জেল-হাজতে পাঠাচ্ছেন সরকার– নিশ্চয়ই এটা খারাপ সংবাদ নয়; কিন্তু দলবলের সরকার এসে যখন বিজয়-ধ্বজা উড়িয়ে দাঁড়াবেন, আমরা কি তখন পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করে, লালগালিচা ছড়িয়ে জেলের দরজা খুলে দিব না? আপনি প্রশ্ন করেছেন, বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে– জানি না সব কথা গণক ঠাকুরের মতো বলা যাবে কিনা। সংস্কার-কর্ম নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাবে। কিন্তু বিবিধসব আয়োজন সেরে যখন কেবলমাত্র ভোটের জন্যই ঘরে ফিরছি, তখন নাসিরুদ্দিনের সেই গল্পের মতো,... রোগী বাঁচবে তো?– মোল্লা নাসিরুদ্দিন একবারের কাজ একবার

করেন না; তিনটি ডিম আনার জন্য তিনি যাবেন তিনবার। একবার ওর মনিব ভারি অসুস্থ। নাসিরুদ্দিন বদনাম ঘোচানোর জন্য হেকিমকে আনতে গিয়ে, ৩ বার উল্টো দেরি করে বসলেন– হেকিম যদি পুলটিস চায়, সেই লোকটিকে আগাম এনে হাজির। গরম জলের জন্য কয়লাওয়ালাকে আনা হয়েছে। যদি নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে, তার জন্য এসেছে মৌলবী সাহেব, তিনি কোরান পড়বেন। আর যদি তিনি মারাই যান, তবে তার জন্য যোগাড় হয়েছে লাশ বহনকারী দলবল। শেষমেশ হেকিম এল বটে, কিন্তু এতসব আয়োজন সম্পন্ন করার আগে মনিব যদি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেন? কাজেই কোন্ সংস্কারটি সর্বাগ্রে করা জরুরী, আমাদের রক্ষাকর্তাদের তা নিশ্চিত করা দরকার এক্ষুণি।

আসলে দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হওয়ার পাশাপাশি খোঁজা দরকার দুর্নীতির কারণ এবং দুর্নীতি বিকাশের অলিগলি! সরকারের বহু পুরনো একটি আইন আছে– অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট। এই আইনের টিকা-ভাষ্য এবং বিপদ-আপদ নিয়ে ঢাকায় লোকজনকে মিটিং করার বুদ্ধি দিতে পারেন। পিএসসিতে চাকুরির জন্য যে চিকিৎসক-বিচারক এবং মাস্টারমশাইরা আগাম গুপ্ত-তালিকা প্রণয়ন করেন, তাদের কর্মকাণ্ড পরখ করা যায়। দরিদ্র পুলিশ-কনস্টেবলের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং দাম্পত্যজীবন নিশ্চিত করা যায় কিনা একবার ভাবা দরকার। সরকারের রাজস্ব আয়ের নিয়মকানুন, উন্নয়ন বাজেট, নানান খাজনা-উপার্জনের ক্ষমতাপদ্ধতি, নতুন ব্যাংক গঠনের নেপথ্য, এনজিও কর্মপদ্ধতি, বন্দর পরিচালনায় অনিয়ম, ওভার ইনভয়েস, সাবসিডি, খেলাপী ঋণসহ সরকারের তথ্য এবং বিচার ব্যবস্থাপনার দিকে চোখ ফেরানো দরকার। প্রত্যেক সরকার বিচারব্যবস্থা আলাদা করার কথা বলেন, কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই। আই এম. এফ-বিশ্বব্যাংকের ভূতের কথা তুলছিনা- গত তিন দশকে এদের হাত ধরে যে এক লক্ষ-কোটি টাকা এখানে এল, তার অংশবিশেষ আমরা যারা ভোগ করেছি, তাদের তালিকা বানানো দরকার। বিদ্যুৎ খাতের বিপুল অর্থ শেষ পর্যন্ত কিভাবে পাখি হয়ে উড়াল দিল, তার হিসেবটিও দরকার। এনজিও বাহিনীর উপদেষ্টা সেজে প্রাক্তন সচিব এবং অধ্যাপকবৃন্দ, শহরের সবচেয়ে উজ্জ্বল গাড়ি চেপে ননফর্মাল এডুকেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট পরিদর্শনের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন তার ব্যয়ভার অডিটের দায়িত্ব কি ভূমিহীনদের দেয়া গেছে এক্ষণি?

ইদ্দিস একটি প্রবচন আছে– সমুদ্রকে চামচ দিয়ে শূন্য করা যায় না! আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এমনিতর এক গভীর দুর্নীতির সমুদ্রে ডুবে আছি অথবা বলিষ্ঠ সাহসের জোরে ভেলা ভাসিয়েছি কেবলমাত্র। তবে কি, স্বপ্ন তো দেখতেই হয়! এই সব স্বপ্নভুক মানুষ আর কতিপয় প্রখর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিয়ে ছোট-খাটো বুদ্ধি আঁটতেই পারি; অথবা কিছু না করে গম্ভীর এক আলোচনা সভা করা যায়– জনস্বার্থ সংশিষ্ট কেনাকাটাগুলো প্রথমে জলের মতো পরিস্কার করুন। উন্নয়নের নামে বিদেশী প্রভুর কাছে জল, বাতাস এবং মাটি ধ্বংস করার প্রকল্পে সই করবেন না। পাটশিল্প-চিনিশিল্পকে আর একবার বাঁচানোর চেষ্টা নেয়া যায় কি? দয়া করে তেল-গ্যাস-কয়লা

বিক্রির পাঁয়তারা বন্ধ করুন। ক্ষমতায় পৌঁছে গাড়ি-বাড়ির সংখ্যা খানিকটা কমিয়ে রাখুন। সর্বোপরি প্রত্যেক সিআইপি ও ভিআইপি, যে পরিমাণ ওবেস– সম্পদ যোগাড়ের জন্যও যদি বাঁচতে চাই, তাহলে কম খাদ্য গ্রহণ করুন, শাকপাতা বেশি খান এবং প্রচুর হাঁটুন!

এই প্রেসক্রিপশন নিশ্চয় আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনের চেয়ে তেজী নয়। কাজেই অমান্য হতেই পারে। আমার স্বল্প বিবেচনায়– বাজেট পাশ হওয়ার আগে, ট্রেজারী বেঞ্চ বাঁচানো-দায়সারা মন্তব্য না করে, প্রয়োজনে যাঁরা অর্থনীতির মার-প্যাঁচ অনুধাবন করেন, তাঁদের পরামর্শ নিয়ে বাজেটে উপযুক্ত ব্যবচ্ছেদ ঘটাবেন। অবসরপ্রাপ্ত আমলা এবং মিলিটারী কর্তারা জামা-কাপড় খুলেই বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক-রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন কিনা, তা নিয়ে ভাবা যায়। আর ভাবা যায় 'অম্বুডজম্যান' নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে– নানান দেশে এরা নিরপেক্ষভাবে পুরো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন, পরামর্শ দেন এবং শান্তির বন্দোবস্ত করেন; খানিকটা রক্ষাকবচ বৈকি! কনফুসিয়াস তার শিষ্যদের বলতেন, অত্যাচারী সরকার বাঘের চেয়েও হিংস্র।

এতক্ষণ যা বললাম, হয়ত সবকিছুই ভাসাভাসা-অস্পষ্ট– সেই গ্রীক প্রবাদের মতো: নাথিং ইজ সার্টেন, নট ইভেন দ্যাট;... কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়, এমনকি যে সব যুক্তি-তক্কো করলাম, তাও নয়। সত্য হয়ত এখনও লুকোনো-ই থেকে গেল। রাজা কবে দার্শনিক হবেন, দার্শনিক কবে রাজা হবেন, তা তো জানি না। শাসকের প্রশিক্ষণ দানের ম্যানুয়াল কি আমরা সত্যিই তৈরি করতে পারি? তবে এতটুকু বলা যায়– বিপুল জনগোষ্ঠীর সামনে নয়, নেতৃত্ব দিতে চাইলে আপনাকে দাঁড়াতে হবে এইসব মানুষের পেছনে। আমাদের দুর্ভাগ্য– মানুষের বেদনার সঙ্গে যথার্থ সম্প্রীতি, আমাদের রাজা-বাহাদুরেরা অদ্যাবধি ঘটাতে পারেন নি। আর রাজা নিজে সুশাসন চায় কিনা, শেষ পর্যন্ত এর ওপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ অথবা নিরন্তর দুর্যোগ। রাজার কৃচ্ছতা নিয়ে আমি কি আদৌ আমার সরকার প্রধানকে জ্ঞান দেয়ার ঔদ্ধত্য রাখি? বরঞ্চ সম্রাট হর্ষবর্ধনের গল্প শুনিয়ে মৃত্যুদণ্ড রক্ষা করার প্রয়াস নিই আপাতত। সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি চার বছর পর একবার প্রয়াগের মেলায় যেতেন। মেলায় তিনি দান করতেন তাঁর সর্বস্ব। সব দান করার পর তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডও দিয়ে দিতেন গরীব-দুঃখীকে। এইবার গঙ্গাস্নান করে শুচি হয়ে, অন্যের বস্ত্র ঋণ নিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

কিন্তু আমি এবং আমার রাজামশাই-এর ঘরে ফেরা,– সে এক অদ্ভুত চমৎকার কাহিনী ঘটে বটে! সেই গপ্পো কোনোদিন হয়ত শোনানো যাবে!

হালখাতা

বাংলাদেশে সাহিত্য পত্রিকা জগতে 'ঈদ সংখ্যা'সহ অন্যান্য প্রকাশ মাধ্যমগুলোতে ক্রমাগত যে নিরুত্তাপ উপন্যাস নিরলসভাবে ছাপা হচ্ছে, সেসব লেখার তুলনায় আপনার লেখা আলাদা, অনেক বেশি সমাজ-বাস্তবমুখী ও পলিটিকালি এগ্রিসিভ।

এমনকি সরাসরি অনেকের নামে চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের আক্রমণ করতে ছাড়েন না। এটা কি প্রয়োজন থেকে করেন? অনেকের ধারণা এতে 'সাহিত্য-মান' ক্ষুণ্ন হয়, আপনার মত কী?

মামুন হুসাইন

লেখা-পত্র কিভাবে উষ্ণ হয়, শীতল হয়, নাতিশীতোষ্ণ হয়– আমার কাছে এমন তাপমাপক যন্ত্রের সন্ধান নেই। এই দেশে তীব্র 'পুলক' ছড়িয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করা যায় আমি ভালোভাবে আজ পর্যন্ত রপ্ত করতে পারিনি। আবার চেনা মানুষের কথা লিখলেই লেখা খুব খাঁটি হয়, এ কথাটি নিশ্চয় আমি কখনও উচ্চারণ করিনি! যে ভয়ঙ্কর জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে মানুষ এই রাষ্ট্রে বাঁচে, তার খতিয়ান দিতে গিয়ে কেউ হয়ত চেনা ভূত হিসেবে সামনে দাঁড়িয়েছে– বলতে পারেন, নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া, হত্যা হয়ে যাওয়া, জনসংলগ্ন 'কতিপয় বিপজ্জনক স্মৃতি আমি কখনও পুনর্নির্মান করতে চেয়েছি। আর লেখা মাপযোখের নিয়ম-পদ্ধতিতো আমার পদানত ভৃত্য নয়– 'পারসেপশান' বলে যে কথাটি আছে, শুধু জগৎসংসারের বেলায় না, লেখা বুঝবার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এখন নানান মানুষ নানান চশমা দিয়ে জগৎ দেখেন; হয়ত আমাদের লেখা-পত্রও তিনি কখনও পড়েন, তার মনমোহন-চশমা দিয়ে: লেখা তখন হয়ত দাঁড়ায়, হয়ত দাঁড়ায় না; লেখা ওয়েস্ট বিনে ঢুকে পড়ে, লেখা নিঃস্ব হয় অথবা চিরকালের বর্জ্য-মল-মূত্রে রূপান্তরিত হয়। লেখালেখির কাজে এই তিরস্কার কখনও হয়ত পুরস্কারও বটে! কে জানে, আমি হয়ত বিষয়টি বলতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত: কারণ সত্য কদাচিৎ অবিমিশ্র এবং সরল হয়!

[সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শরমিন নিশাত ও শওকত হোসেন।]

দুর্নীতির প্রশ্নে

ব রু ণ সে ন গু প্ত

নামকরা দুটি সংবাদপত্রে মজার দুটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল এক সময়। একটির শিরোনাম ছিল: 'দি টেন মোস্ট সেকরেড কাউজ অব আমেরিকা' । বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'আমেরিকার পবিত্রতম দশটি গরু'। আর একটি ছিল: 'দি টেন লিস্ট সেকরেড কাউজ অব আমেরিকা'। অর্থাৎ 'আমেরিকার সবচেয়ে কম-পবিত্র দশটি গরু'। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকশিত হয় এল এ টাইমস-এ। দ্বিতীয়টি তার কিছুদিন পরেই নিউইয়র্কের টাইমস-এ।

প্রবন্ধ দুটি একটি অপরটির পরিপূরক। প্রথমটি লিখেছিলেন এক মহিলা। তার বক্তব্য ছিল: অবাধ সমালোচনার দেশ আমেরিকায়ও এমন দশজন মানুষের নাম করা যায়, যাঁদের বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা শুনতে রাজী নন। ওই বিরুদ্ধাচরণগুলো সত্যি হলেও না। কাজেই এদের বলা যেতে পারে মোস্ট সেকরেড কাউ, অর্থাৎ পবিত্রতম গরু। এই পবিত্রতম গরুদের গায়ে কেউ হাত দিতে গেলে বিপদ অনিবার্য – এমন কি মারধরেরও ভয় থেকে যায়।

উল্লেখ্য, এই বক্তব্যের খেই ধরেই আবির্ভুত হয়েছিল নিউইয়র্ক টাইমস-এর পরের প্রবন্ধ। এখানে লেখকের বক্তব্য হলো: সত্যি কথা, আমেরিকায় প্রবিত্রতম দশটি গরু আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমেরিকাতেই আবার সবচেয়ে কম পবিত্র ভিন্ন দশটি গরু আছে। সত্যি কথা হলো পবিত্রতম গরুর সমালোচনা করলে বিপদে পড়তে হয়; যার ঠিক উল্টো চিত্র হলো অকাট্য প্রমাণ থাকলেও সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু দশটি সম্পর্কে খুব কম লোক প্রকাশ্যে প্রশংসা করতে সাহস পান! যদি-বা কেউ সাহস করে বলতেও যান তো বলতে হয় আগে দায় এড়ানো যায় এমন দশটা কথা জুড়ে দিয়ে। যেমন ধরুন, আমেরিকার দশটির একটি সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু প্রেসিডেন্ট জনসনের দৃঢ়তা সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান; শুরু করতে হবে এইভাবে– যদিও লোকটা টেকসান কাউবয় গোছের, যদিও তাঁর বউ হরেক রকম ব্যবসা ফেঁদে অনেক পয়সা গুছিয়েছে; যদিও ভিয়েৎনামে সব ভণ্ডুলের জন্য দায়ী এই মানুষটিই, তবু বলতে হবে ভদ্রলোকের দৃঢ়তা আছে। তারপরও এতবার 'যদিও' বলেও, শেষ দুটি কথার জন্য

আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তবে আপনার শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খোঁচা দিয়ে বলবেন: বেশ মজার মজার কথা শুনছি তো তোমার মুখে, জনসন আবর ভদ্রলোক! তাঁর আবার দৃঢ়তা!

দুই

অবশ্য, এই পবিত্রতম বা সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু খুঁজে বের করে তাদের সম্পর্কে একটা যুক্তিহীন একরোখা মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মার্কিনীদের কোনও একচেটিয়া অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক দেশে কম-বেশি এমন কিছু পবিত্রতম বা সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু থাকবেই– নিশ্চয়ই এই মনোভাব গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু দেখা গেছে তারপরও এটা থাকবেই এবং আছেও।

যেমন আছে আমাদের দেশে, আছে এরাজ্যে, (আছে বাংলাদেশেও)। এখানেও কিছু পবিত্রতম গরু আছেন প্রকাশ্যে যাঁদের সমালোচনা করা মানে বিপদ ডেকে আনা। আবার এমন কিছু সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু আছেন, যাঁদের সম্পর্কে সত্যি জেনেও অনেক ভণিতা করেও আপনি প্রকাশ্যে বিনা বাধায় কোনও ভালো কথা বলতে পারবেন না। আগেই বলেছি, জনগণের এই মনোভাব গণতন্ত্রের পক্ষে, দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আর এই একরোখামি বা একগুঁয়ে মনোভাব যত কঠোর হয় যত নির্দয় বা অসহিষ্ণু হয় ক্ষতির পরিমাণ তত বাড়ে। স্বাধীন চিন্তা বা বিচার ক্ষমতার মূলে ততই ঘা পড়ে, তবে সবসময়ই পবিত্রতম গরুদের যে সুবিধা হয়, তেমন নয়; বরং অনেক সময়ই গরুদের এই পবিত্রতার মনোভাব তাঁদের বিপদ ডেকে আনে। কারণ আজ যিনি পবিত্রতম কিছুদিন পরে হয়ত তিনিই হয়ে দাঁড়ান সবচেয়ে কম-পবিত্র। জনমনে এই পরিবর্তনটা আসে তবে খুব ধীরে এবং সংগোপনে। এইসব পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ যেদিন একসাথে ঘটে, সেদিন পবিত্রতম গরুও আর চট করে হাল ঘোরাবার সময় বা সুযোগ পান না। বহুকাল পবিত্রতম গরু হওয়ার আত্মম্ভরিতায় বিভোর তিনিই যে ততদিনে হয়ে ওঠেন সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেশ কছিুদিন যাবৎ কংগ্রেস ছিল এমনি একটি পবিত্রতম গরু। দেশবাসীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসের কোনও সমালোচনা শুনতে রাজী হতেন না। (বাংলাদেশে যেমন আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের দলের সমালোচনাকে বরদাস্ত করেন না)। যিনিই তা করতে গিয়েছেন, তিনিই জোর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীরই বিপদ বেড়েছে। এই সুযোগে কংগ্রেসের মধ্যে (বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মধ্যে) এমন সব লোক বাসা বেঁধেছেন, যে কোনও প্রগতিশীল সমাজে যাঁরা অচল ও অপাংক্তেয়; বা কংগ্রেসের (বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নামে) নামে এমন সব কাজ হয়েছে যা দেশ ও দশের পক্ষে চরম ক্ষতিকর, অথবা পবিত্রতম গরু হওয়ার সুযোগে কংগ্রেস (আ.লীগ) বহু ব্যাপার শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই দিন কাটিয়ে দিয়েছে কিন্তু খুব ধীরে এবং সংগোপনে এই পরিস্থিতিটা একসময় একেবারে পালটে যায়; খুব কম কংগ্রেস (আ. লীগের) নেতাই টের পেয়েছেন ধীরে ধীরে এরকম নিঃশব্দে তাঁদের

পায়ের নীচের জমি সরে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন তাঁরা দেখলেন, কংগ্রেসই (আ.লীগই) পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে (এবং বাংলাদেশে) সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু! অবস্থাটা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস (আ.লীগ) সম্পর্কে একটি খারাপ কথা বলুন, সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন এগিয়ে আসবেন কংগ্রেসকে (আ.লীগকে) আরও বিশরকম গালিগালাজ দিতে। আবার আপনি অনেক 'যদি'-র পর কংগ্রেস (আ.লীগ) সম্পর্কে একটি প্রশংসামূলক কথা বলতে যান, বলে দেখুন 'অনেক না করলেও দেশের অগ্রগতির জন্য ওরা অন্তত কিছু করেছেন' সবাই দালাল বলে আপনার মুখে কালি দেবে।

দুর্নীতির প্রশ্নে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও এমনি একটা সবচেয়ে কম-পবিত্র গরুর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যে-কোনও কংগ্রেস নেতা বা মন্ত্রীর নামে চুরির অভিযোগ আনুন, প্রমাণ থাক আর নাই থাক, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সমর্থক পেয়ে যাবেন। তাঁদের দুর্নীতির ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণও শুনতে পারেন। আর বলতে যান: আমার অবশ্য মনে হয় না সবাই খারাপ। এই ধরুন, অমুক চন্দ্র, অমুক... যদি দুর্নীতিবাজ বা স্বজনপোষকই হবেন তবে নিজের ছেলের জন্য তো একটা কিছু করতেন। কৈ তা তো করেন নি! তাঁর যোগ্য ছেলে চাকরি করে চারশ মাইল দূরে এক জঙ্গলে। আপনি এতটা বলার সুযোগ পাবেন কিনা সন্দেহ... তার আগেই প্রচণ্ডভাবে বাধা আসবে।

কিন্তু সব কংগ্রেসই (আ.লীগ নেতাই) কি দুর্নীতিগ্রস্ত? জনসাধারণ বলতে যাঁদের আমরা সাধারণত বুঝি তাঁদের একটা বিরাট অংশের অন্তত ধারণা তাই। যে কোনোও কংগ্রেস (আ.লীগ) নেতা সম্পর্কে যেকোনোও অপবাদ দিন তাঁরা সোৎসাহে মেনে নেবেন। তাঁরা আরও মনে করেন, এদের রাজত্বের অলিগলিতে দুর্নীতি গিজগিজ করত, কিন্তু নেতারা সেগুলো উৎখাত না করে সেগুলো পালন করেছেন। জনগণের দৃঢ়বিশ্বাস, সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করলে এই সব দুর্নীতি এখন ধরাও যায়। তাঁরা চান, ধরে ধরে সেইসব দুর্নীতিবাজদের কঠোর সাজা দেওয়া হোক। জনসাধারণের আশাকে বাস্ত বরূপ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের। তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এখন তাঁদের সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে সব দুর্নীতির ইতিহাস খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাজা দেওয়ার। যখন তাঁরা শুধু বিরোধী ছিলেন, তখন অভিযোগ তোলাই ছিল তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। এখন কিন্তু ভুমিকা একেবারে উল্টো। এখন তাদের দায়িত্ব দুর্নীতি রোধ করা। দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দেওয়া। তাই নতুন সরকারকে এখন আর শুধু সবচেয়ে কম-পবিত্র গরুর মনোভাব নিলে চলবে না। তাঁকে বা যাঁদের সবচেয়ে- কম-পবিত্র গরু বলা হয়েছে বা হচ্ছে, তিনি বা তাঁরা কেন সবচেয়ে-কম-পবিত্র, তাও প্রমাণের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদেরই। এখন এমন একটা সময় এসেছে, যখন তাদের হয়ে বলতে হবে যতটা শোনা গিয়েছে বা যায় এবং আমরা যতটা বলেছি বা বলি, কংগ্রেসীরা ততটা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না; না হয় সবকিছু আদালতে প্রমাণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কর্তব্য বা দায়িত্ব যদি তাঁরা যথাযথভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণের মনে আবার একটা বিরাট হতাশা আসবে এবং সে হতাশার পরিণতি গোটা রাজ্যের পক্ষেই খুব খারাপ হতে বাধ্য।

তিন

বছর তিন আগে একবার মেদিনীপুর যাচ্ছিলাম। মেদিনীপুর জেলাকংগ্রেস কর্মী-সম্মেলন 'কভার' করতে। সম্মেলনে যোগ দিতে কোলকাতা থেকে যাচ্ছিলেন তিনজন কংগ্রেস নেতা: শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপ্যাধ্যায়। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম ট্রেন তখনও ইন করেনি এবং তিন নেতাই প্লাটফর্মে বসে আছেন। নেতাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি শ্রীদেশাই, শ্রীমুখোপ্যাধ্যায়ের পাঞ্জাবিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমিও একইসঙ্গে তাকালাম। তাকিয়ে দেখার মতই ব্যাপার– শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গোটা পাঞ্জাবিটির যে রঙ, পকেটগুলো সে রঙের নয়, পকেটগুলো বসানোও একটু বেখাপ্পাভাবে। শ্রীদেশাই একটু নড়ে চড়ে বসতেই শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বললাম: মোরারজী ভাই এতক্ষণ নিশ্চয়ই আপনার দর্জির তারিফ করছিলেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় হেসে উত্তর দিলেন: তার মানে আমারই তারিফ করছিলেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমিই আমার দর্জি। সবই নিজের হাতে সেলাই করি। তাই মাঝে মাঝে একটু বাঁকাচোরা হয়ে যায়; কাপড়ের রঙ সব সময় মেলে না।

এই সরল, নিরহঙ্কার, নির্লোভ মানুষটি যেদিন পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্রিয়াকলাপেও সেই ক্ষমতার ছাপ পড়ল। তার জন্য চলে এল শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, পাইলট ভ্যান; উর্দিপরা চাপরাশি ও সাদা পোষাকের সিকিউরিটি ম্যানদের ছড়াছড়ি। অবশ্য এপথে শ্রীমুখোপাধ্যায় সরকারের সর্বশেষ হুকুম: দেশে যখন এত অভাব এত দৈন্য, তখন সরকারী পয়সায় ডিনার লাঞ্চ এমনকি টি-রও ছড়াছড়ি চলবে না– বন্ধ করতেই হবে।

এরকম একটা হুকুম অবশ্য চীনা হামলার পরথেকে কংগ্রেস সরকারও দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক সময় নিজেরাই তা মেনে চলেন নি। বলতে গেলে বিলাসব্যসন প্রায় পুরোদমেই চলেছিল। (পরিমার্জিত)

[লেখক: সাংবাদিক, কলকাতা।]

দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার

জ য় না ল আ বে দী ন

নীতির বিপরীত দুর্নীতি। নীতিহীন বাংলাদেশ দুর্নীতির সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। অথচ ১৯৭১-এ আমরা লড়েছিলাম দেশটিকে নীতির সমুদ্র করার জন্য। দেশ স্বাধীন হবার পরে কয়েকমাস দারোগা-পুলিশেরা পর্যন্ত ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। পরে দেখা গেল বাংলাদেশ নতুন এক রাষ্ট্র হলেও এর নীতি আসলে পাকিস্তানীই রয়ে গেছে। তাই সকলে আবার দুর্নীতিতে ডুব দিল। ১৯৭২-১৯৭৫, ১৯৭৫-১৯৯০, ১৯৯০-২০০৬ সময়ে আমরা দেশটিকে দুর্নীতিতে এমনভাবে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করাতে পিছপা হলাম না যে, এখন আর বিদেশীরা আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না। ১১-০১-০৭ এর পরে দেশে দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। গত দু'আমলের বেশ কিছু রাঘব-বোয়ালকে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজনকে দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। বিগত একশ বছরে এ উপমহাদেশে এমনটি আর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা চাই যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হয়ে উঠুক।

মানুষ চাকরি করলে সুযোগ পেলে ঘুষ খেতো– যাকে বলে উপরি আয়। মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে জামাতার উপরি কত তা জানতে চাওয়া হতো। এটা ছিল ওপেন সিক্রেট। এখন এসব একেবারে বন্ধ হয়েছে বলা যাবে না তবে আমার ধারণা অনেকটা কমেছে।

লেখা-পড়া শেষ করে কর্মজীবনে আমি যাতে পুলিশ বিভাগে যাই– এ জন্যে আমাদের থানার ওসি রশীদ মোল্লাহ্ প্রায়ই আমাকে তাগিদ দিতেন। কিন্তু ঘুষ না খেলে পুলিশ বিভাগে টিকে থাকা দায়– এ কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি বলতেন 'তুই কারো ক্ষতি করবি না– নীতির মধ্যে নেমে কাজ করে দিবি, খুশি হয়ে মানুষ কিছু দিলে নিবি, ওটা ঘুষ হবে কেন?' তাঁর কথা হলো মানুষকে বিপদে ফেলে টাকা আদায় করা হলো ঘুষ। আমি মোল্লাহ্ ভাই'র কথায় একমত হতে পারিনি। তাই শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর, থানা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ও সাব রেজিস্ট্রার পদের চাকরিতে না গিয়ে ব্যাংকে যোগদান করি। গত ১৯.০৮.০৭ তারিখে কর্মজীবনের তিন দশক পূর্ণ হলো। সিনিয়র অফিসার পদে কর্মজীবন শুরু করে এখন আমি ব্যাংকিং

সেক্টরের প্রায় সর্বোচ্চ পদে থাকলেও আমার অপরাধ কেন আমার বাড়ি-গাড়ি-ব্যালেন্স নেই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সহ পরিচিত লোকজনের সাথে দেখা হলে সবাই জানতে চায় যে ফ্লাটে থাকি সেটা নিজের কিনা? এছাড়া আরও বাড়ি করেছি কয়টা? তারা যখন জানতে পারে ঢাকায় ভাড়া-ফ্ল্যাটে থাকি– কোনো প্লট পর্যন্ত কেনা সম্ভব হয়নি– গ্রামের বাড়িতে আমার কোনো ঘর নেই– তখন সকলে বলে, এত বড় চাকরি করে তা হলে কী করলাম? আমি জবাবে তাদের বলি, সৎভাবে চাকরি করে বাড়ি করা খুবই কঠিন কাজ। শুধু ঋণের টাকায়ও বাড়ি করা অসম্ভব। ঋণের সাথে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রির টাকা অথবা স্ত্রীর পিতার সম্পত্তি বিক্রির অর্থ যোগ না-হলে সৎ লোকের পক্ষে ঢাকায় বাড়ি করা কল্পনাবিলাস মাত্র। আপনি এতিমখানায় পড়ালেখা করেও কর্মজীবনে ঢাকায় বাড়ি করতে পারবেন– যদি নীতিকে বর্জন করে দুর্নীতিকে গ্রহণ করেন। আমি দীর্ঘ ২৯ বছর যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি – সেখানে দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্নীতিবাজ অফিসাররাই বাড়ি-গাড়ি ব্যাংক-ব্যালেন্সের মালিক হয়েছে। আর সৎ অফিসারদের মধ্যে যাদের পৈত্রিক বাড়ি আছে–স্ত্রী চাকরি করে– তারা ব্যাংক-ঋণ নিয়ে, ধার-দেনা করে বড়জোর একটি দু'ইউনিটের ফ্ল্যাট বানাতে পেরেছেন। আর আমার মতো নীতিরক্ষাকারী অবৈষয়িকদের বাড়ি-গাড়ি করা মহাকঠিন কাজ। কিন্তু যে গণমানুষের স্বার্থ আমার এই সততার কারণে রক্ষিত হওয়ার কথা ছিল তাদেরই বা এই ৩০ বছরে কী হয়েছে। আমার যেমন হয়নি তেমনি ওদেরও হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই যাদের হয়েছে এবং যাদের কারণে রাষ্ট্রে এসব হয়েছে তাদের বিচারের কাজ শুরু হয়েছে– একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কিছুটা হলেও বিষয়টি আমার ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এই কপালপোড়ার দেশেও বুঝি তাহলে কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ দুর্নীতি করে স্বভাব দোষে, অভাবে নয়। আমি দুর্নীতি বিষয়ে আলাপকালে সহকর্মীদের প্রায়ই বলে থাকি, শুধু অভাবের কারণে যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হত– তাহলে তো আমি সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ হতাম। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি যে আমরা বড় হয়েছি অভাবের মধ্যদিয়ে– কর্মজীবনে এসেও সে অভাব দূর হয়নি– টানাটানির মধ্যদিয়েই চলছি। কিন্তু ভুলেও সেজন্য দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হইনি। মানুষ যদি মনুষত্বকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠতে চায়– আত্মমর্যাদা উন্নতশির নিয়ে বাঁচতে চায়– তাহলে কি সে দুর্নীতিকে গ্রহণ করতে পারে? তাই দুর্নীতির মূল কারণ অভাব নয় স্বভাব। এই স্বভাব গঠিত হয় পরিবার ও পরিপার্শ্ব থেকে। বিশেষ করে পরিবারের প্রভাব মানুষের জীবনে পড়বেই। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও মানুষ সৎভাবে চলতে পারে– যদি সে শিক্ষা পিতা-মাতার থেকে পায়। পক্ষান্তরে ধনী পরিবারে জন্ম নিয়েও মানুষ কর্মজীবনে অসৎ হতে পারে– যদি পিতা-মাতা থেকে সৎ হবার শিক্ষা না পায়। পরিবারের পরে আসে পরিপার্শ্ব তথা এলাকার পরিবেশ। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি– মানুষ এলাকাভিত্তিক দুর্নীতিমূলক কাজ করে থাকে। বিশেষ বিশেষ এলাকার মানুষ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, আবার আরেক এলাকার মানুষ গরীব থেকে গেছে– এখন ধনী বা গরীব হওয়ার পথ যদি হয়

দুর্নীতি, তাহলে বুঝতে বাকি থাকে না যে বিশেষ এলাকার মানুষ কীভাবে ধনী হয়েছে। কাজেই এলাকার সংস্কৃতিও মানসিকতার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে।

কর্মজীবনে অনেকে প্রথমদিকে সৎ থেকেও দেখা গেছে সংসারজীবনে প্রবেশের পরে সে হঠাৎ করেই অসৎ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীর পরিবারের প্রভাব কাজ করে। স্ত্রী যদি স্বামীর সৎ আয়ে হিসাব করে সংসার না চালিয়ে সর্বদাই স্বামীকে অসৎ আয়ে অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দেয়– তাহলে খুব কম পুরুষই স্ত্রীর কুমন্ত্রণা পরিহার করে চলতে পারে। তাই কর্মজীবনে সৎ থাকার পেছনে স্ত্রীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সীমাহীন লোভ দুর্নীতির একটা বড় কারণ। আসলে সেই লোভে কোন লাভ নেই। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'– এ সত্য কথা আমরা সবাই জানি। তারপরও লোভ আমরা ছাড়তে পারি না। লোভে পড়ে ঘুষ খাই, ঘুষ খেয়ে বাড়ি করি, স্ত্রীকে গয়নার পর গয়না গড়ে দেই, ব্যাংকে টাকা জমাই, কথায় কথায় বিদেশে যাই, আরো কত কিছু করি– কিন্তু একবারও কি আমরা চিন্তা করি– এসব কার জন্য? মৃত্যুর পরে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা যেমন আছে, একইভাবে পৃথিবীতেও পুরস্কার আছে। সেটা হলো দুর্নীতিবাজকে মানুষ সামনে থেকে তোয়াজ করলেও প্রকৃতভাবে কিন্তু দুর্নীতিবাজকে কেই ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। কখনো আবার আমাদের দেশের চলমান অবস্থার মতো মান-ইজ্জত সব শেষ করে কারাগারেও যাওয়া লাগে। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যে ধরনের বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, সমান অধিকারের সেই বাংলাদেশ, সাম্যের বাংলাদেশ একদিন-না-একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। সেই লক্ষ্যেই জীবনে যতটুকু কষ্ট ও ত্যাগ করেছি, বাকি জীবনেও সেটা করে যাব; চোর, ডাকাত দুর্নীতিবাজের বিনাশ হবেই। কেননা সময়ের দাবি মেটাতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, প্রয়োজনে আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ হবে সময়ের দাবি মেটাতেই।

[লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, সমাজকর্মী, ব্যাংকার।]

দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন ও দ্বিতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ডাক

শে খ বা তে ন

আজ অনেকেই এটা অনুধাবন করবেন যে, বাংলাদেশ এর জন্মের পর সবচে স্পর্শকাতর সময় অতিক্রম করছে। ৭১-এর পর আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক পূর্বলক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। ৩৬ বছরে একদিকে দারিদ্র্য ও অন্যদিকে সীমাহীন দুর্নীতির দীর্ঘ প্রতারণার ফলে সমাজের সংকট (কনট্রাডিকশনস) বিস্ফোরণের পর্যায়ে অবস্থান করছে। যদিও তা অবদমিত আছে। এ জাতীয় পরিস্থিতি পেশাদার বিশ্লেষকের পক্ষেও দুরূহ। কারণ তা দেশের অগ্রগতি ও সর্বনাশের সমান সম্ভাবনা ধারণ করে। অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে দেশ এগিয়ে যেতে পারে আবার দুর্ভাগ্যজনক মোড় নিতে পারে উল্টোদিকে। যা নির্ভর করে দেশমাতার যোগ্য সন্তানেরা এই পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দেবেন তার ওপর, অগ্রসর মানুষেরা সাধারণের জন্যে আবার সাহসের সঙ্গে কতটা ঝুঁকি নেবেন, তাদের স্বার্থ সমন্বিত করে কতটা শক্তির সমাবেশ ঘটাতে পারবেন একাত্তরের মতো তার ওপর। তাই এই সময়ে নিজেদের করণীয় নির্ধারণের প্রসঙ্গ যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

আমরা যখন কোন জাতীয় দুর্যোগে বা কোন বিশেষ উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে সমবেত হই, প্রথমেই নির্মমভাবে অনুভব করি- যারা একাত্তরে সঙ্গী ছিলেন তাদের অনেকেই নেই হয়ে গেছেন। ওরা আলো আনবার জন্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। আর আমরা যারা যুদ্ধ জয়ের পর স্বাধীন দেশে দুর্নীতিগ্রস্তদের পায়ের তলে চাপা পড়ে বেঁচে আছি, সেদিন যুদ্ধকালে, অনেকেই কিশোর কিংবা প্রথম যৌবনের বয়স আমাদের। যে বয়স পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অবাক হবার বয়স, নারী ও সৌন্দর্যকে প্রথম স্পর্শ করার বয়স। সে বয়সে আমাদেরকে স্পর্শ করতে হয়েছিল ধাতব মারণাস্ত্র। এটাই তৃতীয় বিশ্বে জন্ম নেয়া তারুণ্যের দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা। আমরা সেই বাস্তবতার ঝলসানো আগুনে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। সাহস ও আত্মবলিদানের মানদণ্ডে যে ক'টি মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে দাগ কেটে গেছে বাংলাদেশের একাত্তর তার একটি। এবং এশিয়ার এই অঞ্চলে সকল নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামের দৃষ্টান্ত হিসাবে আজো তা স্মরণীয় বলে গণ্য করা হয়।

তারপর সবাই জানেন, আর আমরা নিজেদের জীবনের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জানলাম, কিভাবে আশাভঙ্গের রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া শুরু হল। যুদ্ধে যারা অপরাধ করলেন রাজনীতির অবিমৃশ্যতার কারণে তাদের প্রথমে ক্ষমা, পরে পরিপুষ্ট করা হলো। আর আমরা যারা অগ্রণী অবদান রাখলাম, কোনোরকম পরিকল্পনা ছাড়াই তাদেরকে নিরস্ত্র করে ক্ষমতার বাইরে রাখা হল। আমাদেরকে সূর্যসন্তান মহানসন্তান বলে, অভাবের দেশে রাজনীতির প্রলোভনে নষ্ট করে,তেজস্বী যারা তাদের হত্যা করে, ডাকাত কিংবা ভিক্ষুক বানিয়ে, হুইল চেয়ারে বসিয়ে নানান নির্মম প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় করা হল। ফলে ৩৬ বছরের প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্ত প্রহরীর অভাবে রাষ্ট্র বেহাত হল জনতার। বিজয়ী জনগণকে মারজিনালাইজড্ করল নিজ দেশীয় অপশাসন। আর সারা পৃথিবী দেখলো বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ জুড়ে দুর্নীতিবাজদের উল্লাসনৃত্য। একদিকে অকল্পনীয় দারিদ্র্য, অবিচার ও আহাজারি এবং তার বিপরীতে গণসম্পদের নির্লজ্জ লুণ্ঠন– ভূমি নদী পাহাড় পরিবেশ থেকে নগণ্য ত্রাণসামগ্রী পর্যন্ত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যতটা সম্প্রসারণ সম্ভব, এবং তা বিদ্যমান রাখার জন্যে গণতন্ত্রের যত্তরকম বেইজ্জতি সম্ভব তার প্রায় সবটুকুই সম্পন্ন হল এই সম্ভাবনাময় ছোট্ট দেশটায়। আমরা রাজনীতিকে স্বপ্নপূরণের আদর্শ উপায় হিসাবে দেখলাম, এবং তাতে বাধা দেবার কারণে একাত্তরে এমনকি নিজ হাতে ঘনিষ্ঠজনদেরকেও হত্যা করলাম। আর সেই রাজনীতিকে এরা নামিয়ে আনল স্রেফ বেচাকেনার পর্যায়ে। কে অস্বীকার করবে যে, এদেশে মেম্বার অব পার্লামেন্ট বা এমপি হওয়া একটি লাভজনক ব্যবসা নয়? ব্যবসায় লোকসান আছে, প্রকল্প ব্যর্থ হতে পারে, আল্লাহ মোনাজাত কবুল না-ও করতে পারেন; কিন্তু একবার এমপি হওয়া গেলে, আমরা দেখলাম, তিন পুরুষ ধরে অর্থ-বিত্তের আর কোনো অভাব হয় না। এবং এই অসৎ অর্জনের সন্ধান পেয়ে– আপনারা জানেন, পত্রিকায় দেখেছেন, কিভাবে বিদ্যুতের মিটার-রিডার থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আমলা পর্যন্ত অর্জিত কালো টাকায়, ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, খুনের মামলার ফৌজদারী আসামী– সবাই যার যার পেশা ছেড়ে মানিকমিয়া এভিনিউর ওই দালানটায় প্রবেশ করার জন্যে সর্বোচ্চ ইনভেস্টমেন্ট করতে কী রকম মরিয়া হয়ে উঠল? সেটা কি গণতন্ত্রের জন্যে? তিন-চার জন অধঃপতিত মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার বাধ্যকতার নাম কি নির্বাচন ? আন্তর্জাতিক সংস্থাও হিসেব দেয় ১০ থেকে ২০ কোটি কালো টাকা ব্যয়িত হয় মূলত খুনখারাবি ও ভোট কেনার জন্যে, আর সরকারি কাগজে নির্বাচন ব্যয়-বিবরণ দেয়া হয় ৫ লাখ টাকা! অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি হবার মহান পেশার শুরুটাই হয় নিজের সম্পর্কে সত্য গোপন করার ফলস্ স্টেটমেন্ট দিয়ে। যার জন্যে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুযায়ী শুরুতেই তাদের অধিকাংশের জেল হবার কথা ছিল। কিন্তু হাইকোর্টসহ দেশের সবকটি বিচারাদালত, স্বরাষ্ট্রসহ সকল মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসনের সকল রাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্ক এই ডাকাত এবং তাদের সহযোগীদের নির্লজ্জ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এবং সাধারণের দাঁড়াবার মতো কোনো জায়গা খোলা থাকে না। এই রকম পরিস্থিতিতে অনগ্রসর দেশে প্রকৃতির তরফ থেকে যে ধরনের গজব নাজেল হতে পারে এক-এগারো

তার একটা। সমাজতাত্ত্বিক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কেউ মনে করে না যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে স্থগিত রাখা কোন অগ্রসর কাজ। কিন্তু এই পাপ কার? দুর্নীতি একটা মাত্রায় সব দেশেই থাকে কিন্তু দলীয় লুটতরাজের কোন পর্যায় মানুষের সহ্যের সীমানার বাইরে যায় এবং অতিষ্ঠ মানুষ কখন ক্ষমতার যে কোনো পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়? অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রক্ষমতার সিভিল-মিলিটারী আন্তঃসম্পর্কের বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস বলে–

Military intervention into civilian affairs is usually not precipitated by the military groups. In most cases, civilian turn to the military for support when civilian political structures and institutions fail, when factionalism develops and when constitutional means for conduct of political actions are lacking. (Amos Perlmutter/The Praetorian State and the Praetorian Army, p.390)

সামরিক বা স্রেফ শক্তিনির্ভর দেশশাসন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তা কাম্যও নয়। কিন্তু রাজনীতি যে প্রক্রিয়ায় চলছিল তাও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংক্ষেপে এটাই সংকট। শংকিত দেশমাতা তার নির্ভরযোগ্য সন্তানদের কাছে জানতে চাইছেন– বারবার ঘুরেফিরে আসা এই চক্র থেকে বের হবার উপায় কী? করণীয় কী?

একাত্তরে মুক্তির সংগ্রাম সূত্রপাত হয়েছিল মূলত শোষণের বিরুদ্ধে ও অসাম্প্রদায়িক আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্যে। আজ সর্বমহলে স্বীকার করা হয় যে, মুক্তির সেই সংগ্রাম লক্ষ্য অর্জন করেনি, করতে পারেনি। ফলে জাতির সামনে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা বা দল থেকে প্রায়শ আহবান করা হয় অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তকরণ কিংবা দ্বিতীয় স্তরের মুক্তিযুদ্ধের। সচেতনে, অবচেতনে,মহান উদ্দেশ্যে কিংবা হতে পারে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আহবান আসে। কারণ বিদ্যমান জাতীয় সংকটের দাবি এটা। অতিষ্ঠ মানুষ তার নির্যাতনকারীর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়, আর একবার। কিন্তু প্রেক্ষিত বদলেছে- এটা একাত্তর নয়। কার জন্যে মুক্তি? কার বিরুদ্ধে? কার ডাকে, কে লড়বে? লড়ে লাভ কী? সময় এখন যথেষ্ট ধারালো, মানুষ ঝুঁকি নেবার আগে জানতে চাইবেই। ভুল মানুষেরা গোঁজামিল দেয়া এজেন্ডায় আহবান করলেই অগণিত মানুষ জেগে উঠবে– বাংলাদেশে সম্ভবত সেই পর্যায় শেষ হয়েছে।

১৯৪৭-এ এদেশে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম হয়েছে বিজাতীয় বৃটিশ বেনিয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৯৭১-এ ইন্টারনাল কলোনিয়েল এক্সপ্লয়টেশনের জন্যে দায়ী পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে। বর্তমান পর্যায়ে, ২০০৮ কিংবা হতে পারে ২০১০ সালে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এবার নিজেদের মধ্যে, এবং নিজেদের বিরুদ্ধে। এটা যথেষ্ট কনফিউজিং এবং একই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। এই নতুন বাস্তবতা নিয়ে ইতিহাস আবার আমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাশ কাটিয়ে বেশিদূর যাবার উপায় নেই। এর একপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে তাদের বুকে পিঠে পা

রেখে উপরে উঠে যাওয়া দুর্নীতিবাজ যারা রাজনীতিকে উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে অর্থসম্পদ করেছেন, কিন্তু আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। যে কারণেই হোক বর্তমান সরকারের দ্বারা তাদের ডিফেন্স ভেঙে যাওয়ায় তারা নগ্ন হয়ে পড়েছেন। ফলে চিহ্নিত করার কাজ পূর্ণাঙ্গ না হলেও সহজ হয়েছে। তবে এমন হতেই পারে এমন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েছেন যারা বিচারের প্রক্রিয়ায় অব্যাহতি পেতে পারেন। আবার এমন অনেকে রয়ে গেছেন যারা এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারে না। কিন্তু যা অবাক করার মতো পৃথিবীর বহুল আলোচিত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরও ক্ষমতাচ্যুত অপরাধীরা যা আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন– তাদের সময়ে বাংলাদেশে দুর্নীতি হয় নাই; হলেও সেটা তারা করেন নাই; করেছে হয়তো অন্য কেউ? তাহলে মাথাপিছু এক ডলারের নীচে গড় আয়ের হতদরিদ্র দেশে মাত্র ৫/৬ বছরে নিজের এবং স্ত্রী সন্তান ও সাঙ্গ-পাঙ্গদের নামে বেনামে দেশে বিদেশে আয়সঙ্গতিবিহীন অবিশ্বাস্য কোটি অংকের ব্যাকং একাউন্ট, এফডিআর সনাক্ত হল কার? জব্দ করা বিভিন্ন থানার অর্ধশত এবং এখনো বেওয়ারিশ ফেলে রাখা কোটি টাকার গাড়ি তবে কার? এদেশে ৩ কোটি বেকার, হতাশায় নিমজ্জিতরা ৫ হাজার কোটি টাকার নেশাদ্রব্য সেবন করে ফি বছর। তাদের জন্যে শিল্পনির্মাণের কথা বলে কারা ব্যাংকঋণের খেলাপী টাকায় কিনে ব্যাংক, লন্ডনে ন্যূইয়র্কে দেশে ফ্ল্যাট, বাগান বাড়ি– সামনে হরিণ পোষেন। এদেশে মায়ের অপুষ্ট জঠরে বছরে ১০ লাখ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়, কারা তাদের নাবালক সন্তানের একাউন্টে সরকারি অর্থ জমা করে? কার টাকায় দেশমাতার কুলাঙ্গার সন্ত ানদের জন্যে তোরণ নির্মাণ করা হয়; আর অভাবী যুবক রাজনৈতিক খুনাখুনি কিংবা ক্রসফায়ারে প্রাণ দেয়। স্বরাষ্ট্রে শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি যখন ঘুষের টাকার বিনিময়ে খুনীকে অব্যাহতি দেন, তখন যে কেউ অনর্থক খুন হতে পারে এ দেশে। অথর্ব আদালতে বিচারের নামে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ বছরের পর বছর; আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসীর মারসি পিটিশন মন্ত্রীর মাধ্যমে দ্রুত রাষ্ট্রপতির হাতে পৌঁছায়। যে রাজনৈতিক কাঠামো এই রকমের দুশ্চরিত্র শাসকের জন্ম দেয় আমাদের জন্যে তার আর দরকার আছে কি না? অতঃপর আমরা এ-ও জানলাম, দশ বছর ধরে এই রাষ্ট্রের মহামান্য নির্বাহী প্রধানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি জনগণের ট্যাকস-এর টাকা নিয়মিত ফাঁকি দিয়ে এসেছেন; আজ দায়ে পড়ে অপ্রদর্শিত কালো টাকা পরিমাণসহ নিজেই হঠাৎ ঘোষণা করেন– সেই রাষ্ট্র নৈতিক অধঃপতনের কোন পর্যায় নির্দেশ করে? এই মাপের লোকদের দ্বারা শাসিত হবার জন্যে এই রাষ্ট্রের জন্মপ্রক্রিয়ায় হাজার বীরসন্তান আত্মাহুতি দিয়েছিল কি না? আমরা কি বধ্যভূমিগুলোতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি? সম্মানীয় সাংবিধানিক পদে থেকে কোন লাভজনক বাড়তি আয়-উৎসের সঙ্গে জড়িত

থাকবেন না বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে শপথ করার পর যারা ধরা পড়লেন, তারা জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে পারতেন। কিন্তু ঘটলো উল্টোটা। এই বৈপ্লবিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে প্রিন্ট মিডিয়ায়, শক্তিশালী ক্যামেরায়, আদালতের প্রকাশ্য রেকর্ডে, গ্লোবাল ওয়েবে, ইন্টারনেটে সর্বোপরি নিজেদের চোখে আমরা তাদের অবৈধ অর্থবিত্তের হাজার কিসিমের আলামত প্রতিদিন দেখলাম। তারপরেও বলা হলো- এসব মিথ্যা, ষড়যন্ত্র; শুধু তাই নয় বলা হল- রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র। পতিতেরও স্পর্ধা থাকতে পারে, কিন্তু তার সীমা কতদূর?

এই পর্যন্ত সরকারি হিসাব মতে দুর্নীতিবাজদের থেকে উদ্ধার করা অবৈধ টাকার পরিমাণ ৮২০ কোটি; এখনো হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে তার কয়েক গুণ। তাদের বিচার নিষ্পন্ন করতে রাষ্ট্রের খরচ হবে আরো কয়েক কোটি টাকা। অথচ বিচার প্রক্রিয়া শেষ হবার আগেই এরা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন। এবং সুবিধাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জানালা কেটে বের হয়ে আসার আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের ভি চিহ্ন দেখাচ্ছেন এবং আমরা আশংকা বোধ করছি। যাদের পাপে, দেশের স্বাভাবিক অবস্থা তছনছ হলো এবং আমরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলাম, তাদের পূর্ণাঙ্গ বিচারপ্রক্রিয়া ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অঙ্গীকার থেকে সরে আসার কোনো অবকাশ নেই বর্তমান ক্ষমতার। প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন করে এদের অন্তত কারো কারো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়ে যাওয়া দরকার। যেন এই দেশে, এই ১৪ কোটির মধ্যে স্রেফ ভাতে-কষ্ট-পাওয়া ১১ কোটি অভাবী মানুষের দেশে, গণসম্পদ লুণ্ঠনের অমানবিক চিন্তা করতে ভবিষ্যতে কারো বুক কেঁপে উঠে।

এই ঐতিহাসিক কাজ আইনের দ্বারা হয় না। এটা কোনো হাত-পা বাঁধা সাময়িক সরকারের একার কাজ নয়। যে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের মোবিলাইজ করে প্রতিরোধ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। জনগণের জীবনের যথার্থ সংগ্রামের কোনো প্রক্সি হয় না, তাদের নিজেদেরই তা করতে হয়। যেমন করেছে একাত্তরের বাংলাদেশ। আমরা তো দেখেছি, সেদিন যুদ্ধের মাঠে যারা ছিলেন পঁচাশি ভাগ মাঠের কৃষক- কৃষকের সন্তান, গড়পরতা মানুষ। তারা লড়াই করেছে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার নির্মম প্রয়োজনে। গণসম্পদ লুণ্ঠন প্রতিরোধের সেই প্রয়োজনে একই শর্ত নিয়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে আবার আমাদের সামনে হাজির হয়েছে বাংলাদেশ। আজ প্রতিরোধ করবে যারা সর্বত্র জুড়ে আছে সেই মুক্তিযোদ্ধা যারা নষ্টের জীবাণু ধারণ করে না, শক্তিধারণ করে। এবং সেই জনতা- যাদের সাহায্য ছাড়া একদিন যুদ্ধ চলতো না । সঙ্গে আছে আমাদের সন্তান নতুন প্রজন্ম মূলত যাদের জন্যে দেশকে বাসযোগ্য করতে আবার এই ঝুঁকি নেয়া।

সেই রাজনৈতিক কর্মী যারা প্রাণ দেয়, নেতা বানায়, তাদের পরিবার অপমৃত্যুর সংবাদ ছাড়া কিছুই পায় না। সেই সংবাদকর্মী- পাপ উন্মোচন করতে গিয়ে নিহত সহকর্মীর জন্যে যে কষ্ট লালন করে গভীরে। সেই মেধাবী মানুষ- যারা ক্রান্তিকালে সামনের দিকে দেখতে পায়, গড়মানুষকে বিভ্রান্ত করে না। এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষ পেছাবার জায়গা নেই বলে যারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন।

এইসব মানুষের সমন্বিত শক্তিকে আহবান করছে দুর্বৃত্তকবলিত বাংলাদেশ। আর একবার বোঝাপড়ার জন্যে ইতিহাসের আসন্ন আয়োজন। সংকট সম্ভাবনার পূর্বশর্ত। আমরা জেনেছি, পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবার সবরকম যোগ্যতা পূরণ করে এই দেশ। প্রয়োজন আজ তিন দশকে প্রমাণিত অসতের ক্ষমতাকে অসম্ভব করে তোলা। এবং তা অসম্ভব নয়। যখন ব্যক্তি-কষ্টের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ইতিহাসের নির্মাণের আলোকিত আহবান শুনতে পাওয়া যায়–

'আমি তো প্রান্তে আছি, দিনদিন পিছিয়েছি
হেরে যাওয়া ছাড়া কিছু নেই হারাবার,
আবার প্রস্তুত আছি, ঘরে ঘরে গ্রামান্তরে
দুর্বৃত্তের মুখোমুখি দাঁড়াবার।'

[লেখক: কবি, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজ গবেষক।]

ক্ষমতা + ধর্ম = আমাদের অর্থনীতি = দুর্নীতির গরল পাঠ

আ য় শা ঝ র্ণা

বাঙালি বা বাংলাদেশীরা একটি শংকর জাতি। এই শংকর জাতির শারীরিক গড়ন থেকে শুরু করে মানসিক গঠনও শংকর। এই দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি সবকিছূ মিলিয়ে শ্যামল কোমল ছবি বহুকাল ধরে জেগে আছে এখানকার সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। খুব বেশি কিছু নিয়ে মাতামাতি করতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই এদের। দুবেলা পেট ভরে ভাত আর একটু ঘুমানোর জায়গা পেলে স্বর্ণ-সুখের তৃপ্তি দেখা যায় অধিকাংশের চোখেমুখে। এরা নিরীহ শান্ত হলেও সময়মতো আবার ঠিকই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে বানডাকা ভয়ংকরী পদ্মার মতো।

এখানেই ছিলো বার ভূঁইয়া ঈশাখাঁর ভূমি। কামানের সামনে দাঁড়িয়েছিলো এ বঙ্গেরই সন্তান বাঁশের কেল্লার তিতুমীর। মৃত্যুকেও কেউ কখনো ভয় করে না যখন তার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। এখানকার মানুষ যে নিজের জীবন নির্দ্বিধচিত্তে বিভিন্ন সময়ে উৎসর্গ করেছেন, এ থেকে সহজে বোঝা যায়, কালে কালে কতশত দানব বর্গী ও লুটেরা এদেশে এসেছে। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী লড়াকু প্রজন্ম যেমন মেনে নেয়নি, একইভাবে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সকল ধরনের দুর্বৃত্তায়ণ ও দুর্নীতিকে প্রতিহত করব।

প্রিমিটিভকাল থেকেই নানা জাতের বর্গী ও লুটেরা নানা কৌশলে দুর্বৃত্তায়ণ ও দুর্নীতি তথা শোষণের জাল বিস্তার করে আসছে। সে দুর্বৃত্তায়ণ ও দুর্নীতি করতে গিয়ে শোষকশ্রেণী সাধারণ মানুষকে বশে এনেছে দমন-নিপীড়নের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করে। তারা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে সবচেয়ে যে বিষয়টির মধ্যদিয়ে কার্যকর করে তুলেছে সেটা হলো ধর্ম। তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব যে সমীকরণের ওপর দঁড়িয়ে আছে সেটা হলো :

ক্ষমতা + ধর্ম + দুর্নীতি = অর্থনৈতিক শোষণ
অথবা
ধর্ম + দুর্নীতি = অর্থনৈতিক শোষণ
অথবা
দুর্নীতি = অর্থনৈতিক শোষণ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলোর আবির্ভাব মানবকল্যাণের লক্ষ্যে হয়ে থাকলেও, এগুলো যুগে যুগে অনেকাংশে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের অকল্যাণে। অর্থাৎ মানুষকে শোষণ করতে হলে তাকে সবার আগে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পর্যুদস্ত করতে হবে আর মনস্তাত্ত্বিকভাবে পর্যুদস্ত করার ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে বারবার, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শোষকশ্রেণীর অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া। কাজেই ধর্মকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সুবিধা নেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হয় সেটাই দুর্নীতি। ফলে সবশেষে বলা যায়, ক্ষমতা + ধর্ম= আমাদের অর্থনীতি = দুর্নীতি।
সারা পৃথিবীর দুর্বৃত্তায়ণ বা দুর্নীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই; বরং রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ও শেখ মুজিবের আত্মীয় আমরা দুর্নীতিতে যে চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জন করেছি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা যে জাতি তার একমাত্র বিশ্বার্জন 'রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ' চোরের হাতে তুলে দেয়, সে জাতির আরো অনেক গভীরে গিয়ে খুঁজতে হবে এইসব দুর্নীতির বীজ। হয়তো আমাদের সবকিছুই আছে, যা নেই সেটা হয়ত মাত্র একটি বিষয়ের মধ্যে আটকে আছে; সেটা সততা, আমরা আমাদের নীতিকে হারিয়েছি– এ কথা আজ বিশ্বাস করতে আর বাঁধবার কথা নয়। অথচ রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিষয়টি এ জাতির হাতেগোনা কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত। দেশে যখন সেই এক-দুই জনের বিচারকাজ শুরু হয়েছে, এতে স্বস্তিবোধ করতে গিয়েও আবার ভয় হয়। এই ভয় জুজুর ভয় হলে ভাল। কিন্তু চোর বিতাড়িত করার উদ্যোগ নাকি ডাকাতের আগমন– এই দ্বন্দ্ব ঈশাখাঁর এই বাংলায়, শেখ মুজিবের এই বাংলায় যেন কোন কৃষ্ণগহবরে আমাদের ফেলে দেয়!

[লেখক: কবি, কলেজ শিক্ষক।]

দণ্ডিতের দেহ

মিশেল ফুকো/ অনুবাদ শওকত হোসেন

[১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক একটা প্রভাবশালী পরিবারে পল মিশেল ফুকোর জন্ম। তিনি ছিলেন কাঠামোবাদ ও উত্তরকাঠামোবাদের সঙ্গে জড়িত ফরাসি দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিক। কাঠামোবাদী মার্কসবাদী লুই আলথুসারের পরামর্শে ১৯৫০ সালে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টিতে ফুকো যোগ দেন। কিন্তু মাত্র ৩ বছরের মাথায় ১৯৫৩ সালে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের স্বৈরতান্ত্রিক নীতির কারণে রাজনীতির ওপরথেকে তার মোহভঙ্গ হয়। এরপর আবার প্রায় ১৬/১৭ বছর পর ৭০-এর দশকের শুরুথেকে ফুকোর রাজনৈতিক সক্রিয়তা বেড়ে যায়। তিনি কয়েদিদের অধিকার আদায়ের জন্য একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং প্রান্তিক মানুষদের পক্ষে নিয়মিত প্রতিবাদমুখর ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ৫৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চর্ধষ জধনরহড়ি সম্পাদিত 'দি ফুকো রিডারস (এ্যান ইনট্রোডাকশন টু ফুকোস থট)' গ্রন্থথেকে The Body of the Condemned নিবন্ধটি অনুবাদ করা হয়েছে। এই রচনাটি মিশেল ফুকোর মূল Discipline and Punish গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আছে।]

ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ গ্রন্থটি আধুনিক চেতনা এবং বিচার ক্ষমতার নতুন একটি শৃঙ্খলা সম্পর্কিত ইতিহাস হিসাবে পরিকল্পিত; এটি বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক আইনী জটিলতার পূর্বাপর বর্ণনা– যা থেকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা– এর শক্তি, ন্যায্যতা এবং বিধিবিধান সঞ্চয় করে থাকে। এটি নিজস্ব প্রভাব বিস্তার ঘটায় আর মাত্রাতিরিক্ত একক প্রভুত্বকে আড়াল করে।

কিন্তু বিচারিক আধুনিক ক্ষমতার আত্মার এমন একটা ইতিহাস ঠিক কোন পর্যায় থেকে শুরু করা যেতে পারে? বিধিবিধান বা শাস্তির প্রক্রিয়ার বিবর্তনের ক্ষেত্রে কেউ নিজেকে অন্তরীণ রাখলে, সে ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক সংবেদশনশীলতা, মানবীকরণের বৃদ্ধি বা মানবীয় বিজ্ঞানের সুবিশাল প্রাথমিক সত্য হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার বেলায় পরিবর্তন মেনে নেওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। কেবল সামাজিক কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে ডার্কহেইম যেমন করেছেন, 'ব্যক্তিকরণের শাস্তি-প্রক্রিয়ায় ব্যাপক শৈথিল্যকে প্রধান নীতি হিসাবে ধরে নেওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়, যা কিনা ক্ষমতার নতুন

কৌশলের অন্যতম প্রভাব; যার ভেতর নতুন শাস্তি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।' বর্তমান পর্যালোচনায় চারটি সাধারণ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে: শাস্তিপ্রক্রিয়াসমূহের পর্যালোচনায় কেবল তাদের 'নিপীড়ক' প্রভাব– তাদের 'শাস্তি'র বৈশিষ্ট্যের ওপরই গুরুত্ব দেবেন না, বরং সেগুলোকে সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাবের সামগ্রিক অর্থে বিন্যস্ত করুন, যদি প্রাথমিকভাবে তা প্রান্তিকও ঠেকে। পরিণামে শাস্তিকে একটি জটিল সামাজিক কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করুন। শাস্তিপ্রক্রিয়াকে শুধু আইনের পরিণাম বা সামাজিক কাঠামোর পরিণতি হিসাবে বিশ্লেষণ না করে বরং ক্ষমতা প্রয়োগের অন্যান্য উপায়ের অধিকতর সাধারণ ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের কৌশল হিসাবে বিশ্লেষণ করুন। শাস্তিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে দেখুন।

বিধির ইতিহাস এবং মানবীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কারও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটির ওপর অন্যটির বা দুটির ওপরই প্রভাব বিস্তারকে অস্বস্তিকর বা প্রয়োজনীয় ফলপ্রসূ বিচ্ছিন্ন ধারা বিবেচনা না করে কোনও সাধারণ ম্যাট্রিক্স আছে কিনা কিংবা দুটোই কোনও একটি বিশেষ 'শব্দবিজ্ঞানীয়-আইনী' কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিনা তা দেখুন; সংক্ষেপে ক্ষমতার প্রযুক্তিকে দণ্ডবিধির মানবীকরণ এবং মানবীয় জ্ঞানের মৌল নীতিতে পরিণত করুন।

শাস্তিমূলক বিচারে ক্ষমতার আত্মার প্রবেশ এবং সেই সঙ্গে 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানের সামগ্রিক আইনী অনুশীলনের প্রয়োগ– খোদ দণ্ডিতের দেহ ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রভাব কিনা, সেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন।

সংক্ষেপে দণ্ডিতের দেহ রাজনৈতিক কৌশলের ভিত্তিতে শাস্তি প্রক্রিয়ার রূপান্তর পর্যালোচনা করুন। যেখানে ক্ষমতার সম্পর্ক এবং বস্তুগত সম্পর্কের একটা সাধারণ ইতিহাস পঠিত হতে পারে। এভাবে ক্ষমতার কৌশল হিসাবে দণ্ডবিধির শৈথিল্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'মানুষ' 'ক্ষমতার আত্মা' স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক ব্যক্তি বিশেষ কীভাবে আইনী হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হিসাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে– এবং কোনও নিপীড়নের বিশেষ পদ্ধতি কীভাবে 'বৈজ্ঞানিক' মর্যাদাসহ ডিসকোর্সের ক্ষেত্রে জ্ঞানের লক্ষ্য হিসাবে মানুষের জন্ম দেয়, সেটা বোঝা যাবে।

রাশচে এবং কার্চহেইমারে'র বিশাল কাজ পানিশমেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল স্ট্রাকচারস উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রয়োজনীয় যুক্তির যোগান দেয়। সবার আগে আমাদের এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে যে শাস্তিদান সবার উপরে (যদিও একমাত্র নয়) অপরাধ হ্রাসের উপায়। এবং সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক পদ্ধতি বা বিশ্বাস অনুযায়ী এই ভূমিকা কঠোর বা শিথিল হতে পারে। এবং অপরাধ (দুর্নীতি) প্রতিকারের লক্ষ্যে ব্যক্তির অনুসরণ কিংবা যৌথ দায়িত্ব প্রয়োগের লক্ষ্যে তা পরিচালিত হয়ে পারে। আমাদের অবশ্যই 'শাস্তির সামগ্রিক পদ্ধতি'কে বিশ্লেষণ করতে হবে। এমন এক সামাজিক ঘটনা হিসাবে পর্যালোচনা করতে হবে যাকে কেবল সমাজের বিচারকাঠামো বা এর মৌলিক নৈতিক অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

আমাদের অবশ্যই প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সেগুলোকে স্থাপন করতে হবে যেখানে অপরাধের শাস্তিই একমাত্র উপাদান নয়। শাস্তিমূলক প্রক্রিয়াসমূহ স্রেফ নিপীড়ন, প্রতিরোধ, বিচ্ছিন্নকরণ এবং নিশ্চিহ্নকরণের 'নেতিবাচক' প্রক্রিয়ামাত্র নয়, বরং সেগুলো তাদের দায়িত্বের অংশ হিসাবে সমর্থিত ইতিবাচক এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। (এবং এই ক্ষেত্রে যদিও অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আইনী সাজা প্রদান করা হয়, একথা বলা যেতে পারে যে, অপরাধের সংজ্ঞা এবং তার বিচার প্রক্রিয়া, শাস্তি প্রক্রিয়া এবং তার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাশেচে এবং কার্চহেইমার শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। এভাবে দাসভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় শাস্তি-প্রক্রিয়া অতিরিক্ত শ্রমশক্তির যোগানদার হিসাবে কাজ করে– যুদ্ধ বা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত দাসরা অতিরিক্ত 'নাগরিক' দাসের একটা সংগঠনের সৃষ্টি করে। সামন্তবাদে যখন 'অর্থ এবং উৎপাদন' বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, আমরা তখন দৈহিক শাস্তির আকস্মিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'দণ্ডিতের দেহই' ছিল নাগালের ভেতর একমাত্র সম্পত্তি। পেনিটেনশিয়ারি (হপিটাল জেনারেল, স্পিনহিউস, কিংবা রাসফিউস), বাধ্যতামূলক শ্রম এবং কারা-কারখানার আবির্ভাব ঘটে বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে। কিন্তু শিল্পব্যবস্থায় শ্রমের মুক্ত বাজারের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বাস্তবে সেটা না হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে শাস্তি প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক শ্রমের ভূমিকা যথারীতি হ্রাস পায়। তার জায়গা দখল করে 'সংশোধনমূলক' আটকাদেশ। সন্দেহ নেই এমন সরাসরি যোগসূত্রের বেলায় একাধিক পর্যবেক্ষণ উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

তবে আমরা নিশ্চিতভাবে একটা সাধারণ প্রস্তাবনা মেনে নিতে পারি। আমাদের সমাজে শাস্তির প্রক্রিয়াসমূহকে দণ্ডিতের দেহের একটি নির্দিষ্ট 'আর্থ-রাজনৈতিক' ক্ষেত্রে স্থাপন করতে হবে। যদি তা সহিংস বা রক্তাক্ত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত না-ও করে। এমনকি যখন সেগুলো আটক বা সংশোধনের মতো 'শিথিল' ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তখনও ঐ স্বরূপ এবং তার শক্তি, উপযোগিতা প্রধান বিষয় হয়ে থাকে। নৈতিক ধারণা বা আইনী কাঠামোর পটভূমিতে শাস্তির ইতিহাস রচনা নিশ্চিতভাবেই সঠিক। কিন্তু কারও পক্ষে কি এমন একটা দণ্ডিতের দেহের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব? যেখানে শাস্তির এ ধরনের ব্যবস্থা লক্ষ্য হিসাবে কেবল অপরাধীদের আত্মাকেই দায়ী করে থাকে?

দীর্ঘদিন আগেই ইতিহাসবিদগণ দণ্ডিতের দেহের ইতিহাস রচনা শুরু করেছেন। ঐতিহাসিক জনমিতি কিংবা প্যাথলজির ক্ষেত্রে অনেক আগেই দেহকে পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা। দেহকে তারা প্রয়োজন বা ক্ষুধার আধার হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শারীরিক প্রক্রিয়া এবং পরিপাকের আসল জায়গা, রোগজীবানু এবং ভাইরাসের আক্রমণের লক্ষ্য বলে শনাক্ত করেছেন। অস্তিত্বের একেবারে নিখাদ জৈবিক ভিত্তি বলে প্রতীয়মাণ হতে পারে এমন একটা বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহের অন্ত র্ভুক্তির মাত্রা তুলে ধরেছেন তাঁরা। দেখিয়েছেন সামাজিক ইতিহাসে জীবাণুর সঞ্চালন কিংবা আয়ু বৃদ্ধির মতো 'ঘটনাবলী'কে কোথায় স্থান দেওয়া উচিত? তবে রাজনৈতিক

ক্ষেত্রেও স্বরূপ সরাসরি জড়িত; এর ওপর ক্ষমতার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এর ওপর তারা বিনিয়োগ করে একে চিহ্নিত করে, নিপীড়ন করে, কাজ আদায়ে আনুষ্ঠানিকতা পালনে লক্ষণ প্রকাশে বাধ্য করে।

দেহের এই রাজনৈতিক বিনিয়োগ জটিল বিপরীত সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থনৈতিক ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রেক্ষিতে প্রধানত উৎপাদনের একটা শক্তি হিসাবেই দণ্ডিতের দেহকে বিনিয়োগ করা হয়। তবে অন্যদিকে শ্রমশক্তি হিসাবে এর অব্যাহত থাকাটা তখনই সম্ভব যখন তা বশীকরণের একটা ব্যবস্থায় বন্দী হয়ে পড়ে (যেখানে চাহিদাও নিখুঁতভাবে প্রণীত, হিসাব করে ব্যবহার করা হয়)। দেহ তখনই উপযোগী শক্তিতে পরিণত হয় যখন তা একাধারে উৎপাদনশীল এবং অনুগত দেহ হয়ে দাঁড়ায়। এই আনুগত্য কেবল সহিংসতা বা আদর্শের মাধ্যমেই অর্জিত হয় না, এটা সরাসরি প্রত্যক্ষ দৈহিক শক্তি হতে পারে যা বস্তুগত উপাদানের ভিত্তিতে শক্তির বিপক্ষে চালিত করা হয়, তবে সহিংসতাকে জড়িত না করে। এটা পরিকল্পিত, সংগঠিত, কৌশলগতভাবে প্রণীত হতে পারে। হতে পারে সূক্ষ্ম অস্ত্র বা ত্রাসের ব্যবহার ছাড়াই বাস্তব নির্দেশে। তার মানে, স্বরূপ সম্পর্কে এক ধরনের 'জ্ঞান' থাকতে পারে যেটা ঠিক এর কর্মকান্ড সম্পর্কিত বিজ্ঞান নয়। এর শক্তিসমূহের ওপর এক আধিপত্য, যা তাদের বশ করার সামর্থের চেয়ে বেশি কিছু। এই জ্ঞান এবং আধিপত্যকে দেহের রাজনৈতিক-প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। অবশ্যই এই প্রযুক্তি বিক্ষিপ্ত, খুব কমই একে ধারাবাহিক পদ্ধতিগত ডিসকোর্সে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রায়শই তা ছাড়াছাড়াভাবে বর্ণিত। একটা বেপরোয়া পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে এটা। ফলাফলের সামঞ্জস্যতা সত্ত্বেও এটা বহুরূপী বিন্যাসের অতিরিক্ত কিছু নয়। তাছাড়া, একে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রে স্থাপন করা যাবে না। কারণ এসবে তাদের আশ্রয় রয়েছে। সেগুলো এর বিশেষ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার, নির্বাচন কিংবা আরোপ করে থাকে। তবে পরিচালনা এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে তা একেবারে ভিন্ন স্তরে অবস্থান করে। কৌশল এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ যা পরিচালনা করে, তাকে এক অর্থে ক্ষমতার মাইক্রোফিজিক্স বলা যেতে পারে। যার বৈধতার ক্ষেত্র এক অর্থে এইসব মহান কার্যাবলী এবং বস্তুগত ও ক্ষমতাসহ দেহের মাঝামাঝি কোথাও অবস্থিত।

এখন এই মাইক্রোফিজিক্স-এর পর্যালোচনা এটা ধরে নেয় যে দণ্ডিতের দেহের ওপর নিযুক্ত ক্ষমতা সম্পদ নয় বরং কৌশল। এর আধিপত্যের প্রভাবকে 'বণ্টন'এর ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, বরং প্রবণতা, আচরণ, কৌশল এবং কর্মকাণ্ডের ফল ধরে নেওয়া হয়। এখানে যে কেউ কারও অধিকারের চেয়ে কর্মক্ষেত্রে অবিরাম টানাপোড়েনে বাধা একটা নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করবেন। এর আদর্শকে কেউ চিরস্থায়ী যুদ্ধের মডেল হিসাবে নেবেন, এমন কোনও লেনদেন কিংবা কোনও অঞ্চল অধিকার নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তি নয়। দ্রুততার সঙ্গে ক্ষমতা প্রযোগ করা হয়, যা ধারণ করা হয় না। এটা আধিপত্যবিস্তারি শ্রেণীর অর্জন কিংবা সংরক্ষিত 'অধিকার' নয়, বরং এর কৌশলগত অবস্থানের সামগ্রিক প্রভাব–এমন একটা প্রভাব, যা আধিপত্যের অধীন

যারা তাদের অবস্থান দিয়ে অনেক সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া এই ক্ষমতা স্রেফ 'যাদের নেই' তাদের ওপর স্রেফ কোনও দায়িত্ব বা নিষেধাজ্ঞা হিসাবে অনুশীলন করা হয় না। এটা তাদের বিনিয়োগ করে, তাদের দ্বারা এবং তাদের মাধ্যমে চালিত হয়, তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, ঠিক যেমন তারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, তাদের ওপর এর প্রভাব ঠেকাতে গিয়ে নিজেদের ওপরই প্রয়োগ করে থাকে। এর মানে, এই সম্পর্কসমূহ সরাসরি সমাজের সুগভীর স্তরে পৌঁছে যায়। রাষ্ট্র এবং এর নাগরিকদের সম্পর্কের ভেতর কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজন রেখায় এর অবস্থান নয়, এগুলো ব্যক্তি দেহ, ভঙ্গি ও আচরণ এবং আইন বা সরকারের সাধারণ ধরনে স্রেফ পুনরুৎপাদন করে না। ধারাবাহিকতা থাকলেও (প্রকৃতপক্ষে এগুলো এই ধরনেরই জটিল প্রক্রিয়ার একটা ধারাক্রম অনুযায়ী প্রকাশিত হয়ে থাকে) এর মধ্যে সাদৃশ্য নেই বরং এক ধরনের যান্ত্রিকতা এবং সামগ্রিকতা রয়েছে। সবশেষে, এগুলো দ্ব্যর্থবোধক নয়; এগুলো অগুণতি বিরোধী পক্ষকে সংজ্ঞায়িত করে, অস্থিতিশীলতার প্রতি দৃষ্টি দেয়, যেগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে সংঘাত বা সংগ্রামের নিজস্ব ঝুঁকি। অন্তত ক্ষমতার সম্পর্কের সাময়িক বিপরীতমুখীনতা। সুতরাং এই 'ক্ষুদ্রশক্তির' উচ্ছেদ সমস্তকিছুর বিধি অনুসরণ করে না; উপাদানের নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিষ্ঠানের নতুন কার্যক্রম বা বিনাশের ভেতর দিয়ে এটা চিরকালের মতো অর্জন করা যায় না। কিংবা অন্যদিক থেকে এর স্থানীয়কৃত কোনও পর্বকেই গোটা নেটওয়ার্কের ওপর এর প্রভাব ছাড়া অন্য কোনওভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

আমাদের সম্ভবত সেই ঐতিহ্যকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হবে, যেটা কিনা একথা ভাবার সুযোগ করে দেয় যে, কেবল ক্ষমতার সম্পর্কের অনুপস্থিতিতেই জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকতে পারে আর কেবল এর বিধিনিষেধ, চাহিদা আর স্বার্থের বাইরেই জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে। আমাদের সম্ভবত ক্ষমতা উন্মাদে পরিণত করে এবং একই সঙ্গে ক্ষমতা ত্যাগ জ্ঞান অর্জনের শর্ত, এমন ধারণা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। আমাদের বরং স্বীকার করতে হবে যে ক্ষমতাই জ্ঞান সৃষ্টি করে (স্রেফ ক্ষমতার প্রয়োজনে আসে বলেই উৎসাহ যোগানোর কিংবা উপযোগী বলে প্রয়োগের মাধ্যমে নয়); ক্ষমতা এবং জ্ঞান পরস্পরকে সরাসরি প্রকাশ করে। জ্ঞানের সম্পর্কিত সংগঠন ছাড়া ক্ষমতার সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার একই সময়ে ক্ষমতার সম্পর্ককে পূর্বানুমান ও ধারণ করে না এমন কোনো জ্ঞান নেই। সুতরাং এইসব ক্ষমতা জ্ঞান সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে হবে জ্ঞানের বিষয় হিসাবে নয়, যা ক্ষমতা-ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্ত বা মুক্ত নয়; বরং বিপরীতক্রমে: বিষয় যে জানে; উদ্দেশ্য যাকে জানতে হবে; জ্ঞানের কর্মপদ্ধতিসমূহকে অবশ্যই ক্ষমতা-জ্ঞানের এইসব মৌলিক প্রভাব এবং সেগুলোর ঐতিহাসিক রূপান্তরের অসংখ্য প্রভাব হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সংক্ষেপে জ্ঞানের বিষয়ের কর্মকাণ্ড ক্ষমতার বিরোধী বা সহযোগী জ্ঞানের ভাণ্ডার গঠন করে না বরং ক্ষমতা-জ্ঞান, প্রক্রিয়া এবং সংগ্রাম একে অতিক্রম করে যায়; যা দিয়ে এটা তৈরি যা জ্ঞানের ধরন এবং সম্ভাব্য আওতা নির্ধারণ করে।

সুতরাং দেহের রাজনৈতিক বিনিয়োগ এবং মাইক্রোফিজিক্স বিশ্লেষণে ক্ষমতা যেখানে সংশ্লিষ্ট– সহিংসতা, আদর্শ বিরোধিতা সম্পদের উপমা চুক্তির আদর্শকে পরিত্যাগ করতে বলে– যেখানে জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সেখানে কেউ জ্ঞানের 'আগ্রহী' এবং 'অনাগ্রহী' মডেলের মধ্যকার পার্থক্য এবং বিষয়ের প্রাথমিকতাকে পরিত্যাগ করে। পেটি এবং তাঁর সমসাময়িকদের কথা ধার করে, তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ দিয়ে কেউ রাজনৈতিক 'অ্যানাটমি'র কথা ভাবতে পারেন। এটা 'দেহে'র (এর উপাদান, সম্পদ এবং শক্তিসমূহসহ) প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের পর্যালোচনা হবে না, কিংবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে দেহ ও তার পরিপার্শ্বের পর্যালোচনাও হবে না। বাস্তব উপাদান এবং কৌশলের একটা বিন্যাস হিসাবে 'দেহের রাজনীতি' নিয়ে কেউ ভাবিত হতে পারেন যা অস্ত্রের কাজ করে, যোগাযোগ-পথ যোগায় এবং মানবদেহকে জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার মাধ্যমে মানবীয় দেহকে বিনিয়োগ করে এবং বশ্যতা স্বীকার করায়।

এটা দৈহিক রাজনীতির ইতিহাসে শাস্তির প্রক্রিয়াসমূহকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটা অধ্যায়ের চেয়ে বরং আইনী তত্ত্বসমূহের পরিণাম হিসাবে বিবেচনার ক্ষেত্রে শাস্তি র কৌশলসমূহকে বিন্যস্ত করার একটা ব্যাপার। সেটা তারা দেহকে প্রকাশ্য নিপীড়ন বা হত্যা করার জন্যে ছিনিয়ে নিক বা সেগুলো আত্মার উদ্দেশেই পরিচালিত হোক।

ক্যান্টোরোউইয 'দ্য কিংস বডি'র এক অবিস্মরণীয় বিশ্লেষণ দিয়েছেন। মধ্যযুগের বিচারবিভাগীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দ্বৈত দেহ, যেহেতু তা কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভকারী ক্ষণস্থায়ী উপাদানই অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং তা সময়ের অতিক্রান্তি সত্ত্বেও অপরিবর্তিত রয়ে যায় এবং তা রাজ্যের বাস্তব অথচ অদৃশ্য সহায়ক হিসাবে চলমান থাকে। এই দ্বৈততাকে ঘিরে, যা ক্রিস্টোলজিকাল মডেলের কাছাকাছি, আইকনোগ্রাফি, একনায়কত্বের তত্ত্ব, রাজার ব্যক্তিসত্তা এবং ক্ষমতার দাবিকে ভিন্ন এবং একই সঙ্গে সম্পর্কিতকারী আইনী প্রক্রিয়া এবং অভিষেক, অন্তেষ্টিক্রিয়া ও বশ্যতা স্বীকারের আনুষ্ঠানিকতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত সমগ্র প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। এর বিপরীত বিন্দুতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহকে স্থাপন করার কথা ভাবা যেতে পারে; তারও আইনী মর্যাদা রয়েছে, সে নিজস্ব আনুষ্ঠানিকতা গড়ে তোলে এবং তাত্ত্বিক ডিসকোর্স আহবান করে। সার্বভৌমের ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ করা "অতিরিক্ত শক্তিকে বিনাশ করার জন্যে নয়, বরং যে 'ক্ষমতাহীনতার" কারণে তারা বশীভূত হয় বা তাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাকে রূপ দেওয়ার জন্যে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অন্ধকারতম অঞ্চলে দ প্রাপ্তরা রাজার সমরূপ বিপরীত অবয়ব তুলে ধরে। ক্যান্টোরোউইযের প্রতি সম্মান দেখিয়ে, আমাদের উচিত 'শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইতর দেহ' বিশ্লেষণ করা।

রাজার অধীনের অতিরিক্ত ক্ষমতা যদি তাঁর দেহের দ্বৈত রূপ সৃষ্টি করে তাহলে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা আরেক ধরনের দ্বৈততার জন্ম দেবে না? ম্যাবলি যাকে বলেছেন 'অবাস্তব' এক 'আত্মা'। সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের এই 'মাইক্রোফিজিক্সের' ইতিহাস কোনও একটি উপাদানের কিংবা আধুনিক 'স্বরূপ'এর

বংশতালিকায় পরিণত হবে। এই আত্মাকে কোনও আদর্শবাদের পুনচালিত অবশেষ হিসাবে না দেখে দেহের উপর ক্ষমতার বিশেষ কৌশলের বর্তমান পরম্পরা হিসাবে দেখতে হবে। আত্মাকে বিভ্রম বা আদর্শগত প্রভাব বলা ভুল হবে। বরং এর অস্তিত্ব আছে, বাস্তবতা আছে; দণ্ড প্রাপ্তদের উপর প্রযুক্ত ক্ষমতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহকে ঘিরে, এর উপরে এবং অভ্যন্তরে এর জন্ম হয়ে থাকে–এবং আরও সাধারণভাবে বলা যায়, যারা তত্তাবধান করে , প্রশিক্ষণ দেয় এবং সংশোধন করে তাদের উপর; উন্মাদের ওপর; বাড়ি এবং স্কুলে ছাত্রদের উপর, উপনিবেশীদের ওপর; যারা কোনও যন্ত্র তত্ত্বাবধান করে এবং তাতেই বাকি জীবনের জন্যে বাধা পড়ে যায় তাদের ওপর। এটাই এই আত্মার ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যেটা খৃস্টধর্মের বর্ণিত আত্মার বিপরীতে পাপের জঠরে জন্ম নেয়নি, শাস্তির উপযুক্ত নয়, বরং শাস্তি, তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবন্ধকতার প্রক্রিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। এই বাস্তব লৌকিক আত্মা কোনও বস্তু নয়, এটা এমন একটা উপাদান যেখানে বিশেষ ধরনের ক্ষমতা এবং বিশেষ ধরণের জ্ঞান, সম্ভাব্য জ্ঞানভাণ্ডারের উৎপত্তি দানকারী সরঞ্জাম এবং এই ক্ষমতার প্রভাবকে বিস্ত ার ও জোরালো করার জ্ঞানের উল্লেখের প্রভাব তুলে ধরে। এই প্রেক্ষিতে বহু ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে, বিশ্লেষণের আওতা নির্ধারণ করা হয়েছে; মানসিক বশ্যতা, আনুগত্য, ব্যক্তিত্ব, সচেতনতা, ইত্যাদি; এর উপর বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং ডিসকোর্স এবং মানুষের নৈতিক দাবী গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকাই ভালো: এটা কোনও বাস্তব ব্যক্তি নয়, জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, কিংবা কারিগরি হস্তক্ষেপের লক্ষ্য কোনও সত্যিকারের মানুষকে ধর্মতাত্ত্বিকদের বিভ্রম আত্মার বিকল্প হিসাবে খাড়া করা হয়নি। আমরা যাকে মুক্ত হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, আমাদের জন্যে বর্ণিত সেই মানুষটি তার নিজের চেয়েও গভীরভাবে আনুগত্যের প্রভাব ধারণ করে রেখেছে। 'আত্মা' তার মাঝে বসতি গড়ে তাকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে, যেটা নিজেই আধিপত্যের একটা উপাদান, যে ক্ষমতা দেহের উপর পরিচালিত হয়। আত্মা হচ্ছে রাজনৈতিক অ্যানাটমির প্রভাব এবং যন্ত্র; আত্মা দেহের কারাগার।

সাধারণভাবে শাস্তি এবং বিশেষ করে ব্যক্তি যে দেহের রাজনৈতিক প্রযুক্তির অধীন সেটা যতটা না ইতিহাস থেকে তার চেয়ে বেশী শিখেছি বর্তমান থেকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সারা পৃথিবী জুড়ে কারাবিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। নিশ্চিতভাবেই এসবের উদ্দেশ্য, ঘোষিত শ্লোগান এবং পদ্ধতিতে বৈপরীত্য রয়েছে। গোটা প্রায় শতাব্দী প্রাচীন রাষ্ট্রীয় কার্পণ্যের বিরুদ্ধে; ঠাণ্ডা, শ্বাসরুদ্ধকর এবং ঠাসাঠাসি অবস্থার বিরুদ্ধে; বিবর্ণ দেয়াল, ক্ষুধা, আর শারীরিক অসদারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে এগুলো।

কিন্তু সেগুলোই আবার আদর্শ কারাগার, ট্রাঙ্কুয়েলাইজার, বিচ্ছিন্নতা, চিকিৎসা বা শিক্ষাসেবার বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছে। সেগুলো কি স্রেফ বস্তুগত লক্ষ্যেই চালিত হয়েছে? নাকি স্ববিরোধী বিদ্রোহ ছিল: প্রাচীনের বিরুদ্ধে, কিন্তু আবার আরামের বিরুদ্ধেও, কাররক্ষীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু মনোচিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও? প্রকৃতপক্ষে এইসব আন্দোলনে–এবং নবম শতাব্দীর শুরু থেকে কারাগার যে অগুনতি ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছে–দেহ এবং বস্তুগত বিষয় সম্পর্কিত ছিল। এইসব ডিসকোর্স, স্মৃতি এবং কটুকাটব্যকে ঐ সূক্ষ্ম বস্তুসমূহই ধারণ করে রেখেছে। চাইলেই যে কেউ এগুলোকে অন্ধ দাবী বলে মনে করতে পারেন কিংবা সেগুলোর অন্তরালে অচেনা কৌশলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারেন। সত্যি বলতে সেগুলো ছিল দৈহিক স্তরে খোদ কারাগারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। কারা পরিবেশ বেশি কঠিন বা নির্জীব, বড্ড আদিম বা বেশি দক্ষ কিনা এইসব মূল ইস্যু ছিল না, বরং ইস্যু ছিল ক্ষমতার শক্তি বা উপায় হিসেবে এর বাস্তবতা; এটা দেহের ওপর ক্ষমতার গোটা প্রযুক্তি, "আত্মা"র প্রযুক্তি যাকে–শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং মনোসমীক্ষকদের জ্ঞান–এটা তার একটা যন্ত্র বলেই আড়াল করতে বা ক্ষতিপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। আমি এই কারা ইতিহাস লিখতে চাই দেহের রাজনৈতিক বিনিয়োগসহ যা নিবিড় স্থাপত্যে জড়ো করে থাকে। কেন? কেবল এই জন্যে যে আমি অতীতে আগ্রহী? না, যদি কেউ ইতিহাস রচনাকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে অতীতের কথা লেখাকে বুঝিয়ে থাকেন, সেজন্য নয়। বরং বর্তমানের ইতিহাস রচনা মনে করেন, সেজন্য।

[বি.দ্র. 'হালখাতা'র সম্পাদক ও 'দণ্ডিতের দেহ'র অনুবাদকের নাম এবং নামের বানান হুবহু এক কিন্তু দু'জন আলাদা ব্যক্তি।]

প্র তি ক্রি য়া

দুর্নীতি নিয়ে

র ও শ ন ঝু নু

যে দেশে সততার কোনো মূল্য নেই, সৎ ব্যক্তির মর্যাদা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, যে দেশের মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করে, যে দেশে আদর্শনির্ভর মানুষগুলো প্রতিনিয়ত পরিণত হয় উপহাস আর উপেক্ষার পাত্রে, সেই দেশে সুনীতি চর্চার চাকা চলতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই চলতে শুরু করে বিপরীত চর্চার চাকা।

সব প্রাণীই শিক্ষা গ্রহণ করে তার চার পাশের পরিবেশ থেকে। একটি শিশুকে যে আচরণই শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা হোক না কেনো, সে কেবল শিখবে সেটুকুই যেটুকু তার চারপাশে দেখবে। সচ্ছল ও সম্মানিত জীবনপ্রাপ্তি যার অধিকার সেই সৎ লোকটির জীবন যদি দলিত হয় অভাবের যাঁতাকালে, যদি সারাক্ষণ পুড়তে থাকে অসম্মানের তুষানলে– তাহলে কোনো শিশু কেন, কেউই তাকে অনুসরণ করবে না ।

আবার যে জাতি যতো বেশি ধর্মভীরু এবং ভাগ্যে বিশ্বাসী সে জাতি ততো বেশি শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার। তরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার না হয়ে, প্রতিবাদ আন্দোলন না করে, নিজেকে ভাগ্যের হাতে সপে দিয়ে, বসে থাকে সৃষ্টিকর্তার বিচারের আসায়।

দুর্নীতি কিংবা সুনীতি কোনোটাই অল্প সময়ের ফল বা ফসল নয়। তবে পচনশীল জিনিসের কার্যকারিতা সম্পন্ন হয় দ্রুত। যে কোনো ফল বা ফসলের পচন তবু চোখে পড়ে, কখনো এই পচন রোধও করা যায়। কিন্তু মানুষের নৈতিক অবক্ষয় বা পচন শুরু হলে, চূড়ান্ত সর্বনাশের আগে তা চোখে পড়ে না, টেরও পাওয়া যায় না। কিন্তু শৈশব থেকেই জেনেছি 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেনো তৃণসম দহে'। কিন্তু কথা হলো, ঘৃণাটা কে করবে কাকে? অন্যায় যে করে, তার কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু অন্যায় যে সহে, সেই ব্যক্তির সংখ্যা চিহ্নিত হবে কীভাবে। অন্যায়

সহ্য করতে হচ্ছে না কাকে? অন্যায় হচ্ছে না কোথায়? এখন সময় এমন যে, প্রতিবাদ করাটাই যেনো অন্যায়। নীতি থাকাটাই যেন অন্যায় । সে কারণে আজ নীতির কথা লিখতে গিয়ে লিখতে হচ্ছে দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব।

দেরীতে হলেও দেশে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি শুরু হয়েছে, এটি ইতিবাচক। তবে অনেকটাই নির্ভর করছে, চলমান এই বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব যারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাদের ওপর। আর অসৎ লোকের শাস্তি যদি অবধারিত হয়, সৎ লোকের পুরস্কার তবে অবশ্যম্ভাবী।

[লেখক: কবি, সাংবাদিক ।]

প্র তি ক্রি য়া

গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা

ফ রি দু জ্জা মা ন

বাংলাদেশে ইদানিং দুর্নীতি নিয়ে যত কথা হচ্ছে, এমনটি কোনোদিন ঘটেনি। এর কারণ সমাজে ও রাষ্ট্রের দেহকে দুর্নীতির বিশাল দৈত্য, অক্টোপাস শুঁড়ে বেঁধে রেখেছে। এ দৈত্যের ক্ষমতার বিশালতা ও কার্যকারিতার তীব্রতা এমন সর্বগ্রাসী যে তার কবলে পড়ে সেখান থেকে বের হতে পারা যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন: Democracy is the Government of the People, by the People and for the People কিন্তু হাল আমলে এ দেশে দুর্নীতি নামক দৈত্যের মহান(!) ক্যারিশমায় আমাদের বোধে ভেজাল গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা দুর্নীতির বিকার হিসেবে উদিত হয়েছে। এ নতুন সংজ্ঞা হলো– Democracy is the Government off the People, bye the People and fur the People. তা না হলে গণতন্ত্র চর্চাকালে দুর্নীতিতে আমাদের প্রথম অবস্থান অটুট রাখাটা কি আর সম্ভব হতো!

বিকারগ্রস্ত সমাজে জনগণকে ড়ভভ করে দিয়ে ক্ষমতাধর থাকার কৌশল দুর্বৃত্তায়ণের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তবে কি আমাদের স্বাধীনতার ফসল ইঁদুরের গর্তেই চলে গেলো? যে ঘরামি ঘর ছায় সে ভালো করেই জানে কী বাঁধনে ছন-চটি মাথার ওপর ছাদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ঘরের চালার বাঁধন যদি ঘরামি নিজ হাতেই কাটে তবে ছাদ ধ্বসে পড়বেই। এমনই এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের নৈতিকতাকে ঘিরে। সৎ লোককে বোকার অভিধায় বিশেষায়িত করা হচ্ছে। আর কতকাল গুনীজন হিসেবে সংবর্ধনা পাবে এদেশে ধরিবাজেরা? মূলত এসব কারণেই দুর্নীতির কলেবর এতটা ফেঁপে-ফুলে উঠেছে।

[লেখক: কবি, প্রকৌশলী]

প্র তি ক্রি য়া

দুর্নীতি: ডালপালা বনাম শেকড়বাকড়

অ প র্ণা হা ও লা দা র

ডালপালা কেটে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সহজ হলেও, বিশাল বৃক্ষের শেকড় উৎপাটন মুহূর্তকালের তুচ্ছ ঘটনা নয়। তেমনি যে সমাজের প্রতিটি রক্তকণিকায় জীবানুর মতো দুর্নীতির বিচরণ, তাকে বিশুদ্ধ করাও আইনী জটিলতার কাজ নয়। দু'একজন বা দু'একশ অপরাধীকে ১০-১২ বছর কারাদণ্ড দিয়ে সামষ্টিক দুর্নীতি রোধের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দুর্নীতির বীজ আরও অনেক গভীরে প্রোথিত, সাংস্কৃতিক ভাবনার সাথে ওতপ্রোতভাবে এটি জড়িত; জড়িত চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, আকাঙ্ক্ষার সীমানা, সাফল্যের ব্যক্তিগত সংজ্ঞার সাথে।

কোনও ভ্রূণ 'দুর্নীতিবাজ' হয়ে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয় না, কোনও শিশু 'দুর্নীতিবাজ' হয়ে পৃথিবীতে জন্মায় না। শিশুর অনাবিল পবিত্রতাকে ধীরলয়ে গ্রাস করে সামাজিক বিধিব্যবস্থা, আরোপিত হয় স্বার্থপরতার শৃঙ্খলা। কর্মস্থলে এই ব্যক্তিবিশেষের সুখ-

সুবিধার চিন্তাই জন্ম দেয় প্রাতিষ্ঠানিক দৃশ্যমান দুর্নীতি। শিক্ষাজীবনে যে তরুণ আদর্শবাদের তুখোড় বুলি আওড়ায়, রবীন্দ্রনাথ-শেলী-কীট্স নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যদি কর্মজীবনে সে-ই হঠাৎ ঘুষখোর হয়ে ওঠে, সে কি কেবল তার একার চারিত্রিক ত্রুটি? সুস্থ, সুন্দর জীবনের সৎ স্বপ্নকে যদি পারিপার্শ্বিক বিচ্যুতিগুলো পরিস্ফুটিত হতে না দেয়, সে দায় কার? দেশসেবার ব্রত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে প্রথমে সে হোঁচট খায় চাকরির বাজারে একটি যেনতেন চাকরি জোটাতে, আবিষ্কার করে তার এত বছরের পরিশ্রমের সার্টিফিকেটগুলোর মূল্য কিছুই না– যদি না থাকে তদ্‌বির করার ক্ষমতা। তারপর...এই লুটপাটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনওভাবে কেড়ে নেওয়া কেরানিগিরির চাকরিটায় মাসের ১৫দিন কাটাতেই যখন সে হিমশিম খায়, চাল-ডাল-তেল লবণের ক্রমান্বয়ে দাম বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে যখন তার বেতন এক পয়সাও বাড়ে না; কেবল বাড়তে থাকে দায়িত্বের বোঝা, প্রত্যাশার চাপ, পরিজনের অপ্রাপ্তির হতাশা, শিশুসন্তানের ছোট ছোট চাহিদা না মেটাতে পারার অক্ষমতা তাকে যখন কুরে কুরে খায়, একদিন লোভের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সে-ও সামিল হয় অন্যান্যদের মতোই– প্রথমে টেবিলের নিচদিয়ে টাকা নিয়ে টেবিলের ওপরের ফাইল সরানো, এটা-ওটা চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায় ইত্যাদি যজ্ঞে। ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র কর্মগুলোই নেয় বিকট রূপ। তখন অভাব নয়, বড় হয়ে ওঠে ক্রমাগত টাকা উপার্জনের নেশা। এই নেশা তাকে রিক্সা বা স্কুটার থেকে টেনে নিয়ে যায় বি.এম. ডবিউ-এর দিকে, পেছনে পড়ে থাকে নীতি ও আদর্শ। দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশটুকুও আর থাকে না । বেড়ে চলে আরও অর্থ উপার্জনের তাগিদ। এত টাকা তার কী কাজে লাগবে সেটা সে জানার চেষ্টাও করে না। বরং ব্যস্ত হয়ে পড়ে বনানী, বারিধারার ফ্ল্যাট নিয়ে, স্ট্যাটাস বজায় রাখার প্রতিযোগিতা নিয়ে।

বহু পুরনো এক সংস্কার আমাদের; যার টাকা আছে লোকের মুখে সেই 'বড়লোক' এই অদ্ভুত সংজ্ঞার প্রণেতা কে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, সংজ্ঞাটির কার্যকারিতা নিয়ে কারও কিন্তু সন্দেহের অবকাশ নেই। বড়লোক হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা নয়, সম্মান নয়– যেন কেবল অর্থসম্পত্তিই প্রয়োজন– এ ধারণাই গেঁথে আছে সবার মনে। এ অবস্থায় কারও যদি 'বড়লোক' হতে ইচ্ছে করে, দোষটা তার কি খুব বেশি? চলনে বলনে বেশি বেশি অর্থের ছাপ না থাকলে, বন্ধু-আত্মীয় কেউই যে ফিরে তাকাবে না! অর্থাৎ প্রথমে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' এবং পরে 'স্বভাব যায় না মরলে'– দু'টি প্রবাদই সুন্দরমতো প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রক্রিয়া থেকেই সকল অপরাধপ্রবণতা জন্ম নেয়। শুভবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থ এবং অর্থ-ই হয়ে দাঁড়ায় যে কোন কিছু পরিমাপের মানদণ্ড।

সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে স্কুলে পাঠানোর আগে মা কড়া করে বলে দেন, টিফিন ভাগ করবি না কারো সাথে। শৈশব থেকে এভাবে শিখে নেওয়া স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিচিন্তার করালগ্রাস থেকে বের হয়ে আসা অবশ্যই কঠিন কাজ। কেবল কথিত সাফল্যের একটার পর একটা সিঁড়িতে উঠতে পারাই যেন একমাত্র জীবনের কাজ। এই সিঁড়িকেই বলা হচ্ছে কুয়াশার আস্তরণ, যা প্রায় সকলের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি বলব শুধু ব্যক্তি নয় শুধু দল নয়; ক্যান্সারের মত এই দুর্নীতির সংস্কৃতি গড়ে নিয়েছি আমরা সকলে অর্থাৎ এই সমাজ ও এই রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে। কাজেই এই ব্যাধি দূর করার জন্যও হাত দিতে হবে রাষ্ট্রে, সমাজে, সংস্কৃতিতে। শুধু ব্যক্তি-পর্যায়ে নয়...।

[লেখক: শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]